সারস্বত সাধনায় মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের অবদান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পি-এইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক

স্বাগত বিশ্বাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক্রম : A00SA1100521

বর্ষ : জানুয়ারী, ২০২১

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৫

Sārasvata Sādhanāy(a) Mahāmahopādhyāy(a) Kālīpada Tarkācāryer Avadān(a)

A thesis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in partial fulfillment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

In

SANSKRIT

By

Swagata Biswas

Registration No.: A00SA1100521

Session: January, 2021

Supervisor

Prof. Dr. Tapan Sankar Bhattacharyya
Professor
Department of Sanskrit
Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2025

Certified that the Thesis entitled

সারস্বত সাধনায় মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের অবদান (Sārasvata Sādhanāy(a) Mahāmahopādhyāy(a) Kālīpada Tarkācāryer Avadān(a)) submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Dr. Tapan Sankar Bhattacharyya And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

....	....
Countersigned by the Supervisor	Signature of the Candidate
Dated:	Dated:

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

‘সারস্বত সাধনায় মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের অবদান’ বিষয়কে আশ্রয় করে বহু আয়াসসাধ্য গবেষণা কর্মের সমাপ্তিলগ্নে গবেষণা-সন্দর্ভ রচনায় যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে এই কর্মের সার্থক পরিণতি সম্ভব ছিল না, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ-জ্ঞাপন একান্ত প্রয়োজন।

গবেষণা সহায়কের মধ্যে প্রথমেই আমার সম্মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক, ন্যায় ও ব্যাকরণ বিষয়ে অভিজ্ঞ কৃতভূরিশ্রম অধ্যাপক তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। আচার্যদেবের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন হত না। তাঁর নিরন্তর শাস্ত্র আলোচনা এবং সস্নেহ সাহায্য আমাকে পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সারস্বত সাধনা বিষয়ে গবেষণা করার অনুপ্রেরণা দান করেছে। কবিগুরুর ভাষায় ‘জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান’ এই বোধ বিকশিত হয়েছে আচার্যদেবের সাথে আলোচনা করার সময়।

এই অবসরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বেদ-নিষ্ণাত অধ্যাপক অশোক কুমার মাহাত মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করছি। তিনিও গবেষণা কার্যের বিষয়ে অনেক সুপরামর্শ দিয়েছেন।

এই গবেষণাকর্মের গবেষণা উপদেষ্টা সমিতির সদস্যদ্বয় হিসেবে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য মহাশয় এবং সংস্কৃত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়, অধ্যাপকদ্বয়ের শ্রীচরণকমলে

আমি প্রণাম নিবেদন করি। গবেষণা-সন্দর্ভ রচনায় তাঁদের নিকট থেকে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি।

এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি সেল ও রিসার্চ সেকশনের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আমার উক্ত গবেষণাকার্যের তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সমস্ত লাইব্রেরী গিয়েছি যেমন গোলপার্ক রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ (অধুনা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়), জাতীয় গ্রন্থাগার ও হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ ইত্যাদি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ, কারণ আমার অনুরোধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রদানের মধ্য দিয়ে আমাকে গবেষণাকার্যের পরিসমাপ্তিতে সাহায্য করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রুতিদি ও নিমাইদার নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া বরানগরস্থিত সারস্বত সমাজের কর্ণধার সজলবাবুকে আমার প্রণাম নিবেদন করি, তিনিও কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অনেক গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে উপকৃত করেছেন।

যাঁদের আশীষ ব্যতীত আজ আমি এই জায়গায় উত্তীর্ণ হতে অপারগ হতাম, তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় আমার চাক্ষুষ দেবতা পিতৃদেব শ্রীশিবেন বিশ্বাস মহাশয় ও মাতৃদেবী স্নেহকরুণাধারভূতা পরমারাধ্যা জননী আলোকা বিশ্বাস মহাশয়া। তাঁদের

শ্রীচরণকমলে অধম সন্তানরূপে আমার ভূলুণ্ঠিত প্রণাম নিবেদন করি। কারণ শাস্ত্রে বিদ্যমান-

ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।।

আমার পরিবারের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ সদাকর্তব্যপরায়ণ শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস ও মধ্যম অগ্রজ শ্রীসুব্রত বিশ্বাস এবং ভ্রাতৃজায়াদ্বয় শ্রীমতি মিঠু বিশ্বাস ও শ্রীমতি ঝুমা বিশ্বাস, এদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার ভালবাসা ভ্রাতুষ্পুত্র দেবাশীষ ও ভ্রাতুষ্পুত্রী অদিতিকে।

এই গবেষণার কাজে যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাশে পেয়েছি তাঁরা হলেন রাজসী ভট্টাচার্য্য, নীলাদ্রি ঘড়া, কবিতা মালিক, সুদীপ সরকার প্রমুখ। এদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, সকলের সারস্বত যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।

পরিশেষে যে পবিত্র ভূমিতে আমার জন্ম সেই করুণাবশত অবতীর্ণ নদীয়া গৌরব ভগবান গৌরহরির শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, তাঁর অপার করুণায় সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এই মহান কর্ম সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। চৈতন্যের কৃপায় সকলের চৈতন্য হোক, এই কামনা করি।

যাদবপুর, কলকাতা, ২০২৫ বিনয়াবনত

স্বাগত বিশ্বাস

মুখবন্ধ

গবেষণা সন্দর্ভটি বাংলা ভাষা বা বাংলা লিপিতে প্রস্তুত করেছি। তাই বর্তমানে প্রচলিত চলিত বাংলা ভাষার বানানবিধি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভটি মুদ্রণের জন্য মূল অংশে কালপুরুষ font এ ১৪ মাত্রাকৃতি এবং উল্লেখপঞ্জির অংশে ১২ মাত্রাকৃতির ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ আছে সেখানে Times New Roman font এ ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের দুই পঙ্ক্তির মাঝখানে ১.৫ শূন্যস্থান রাখা হয়েছে, তবে সংস্কৃত শ্লোকের ক্ষেত্রে ১.১৫ শূন্যস্থান রাখা হয়েছে। সংস্কৃত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা লিপিই ব্যবহার করেছি। তবে সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে 'ত্' এর ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটিতে উল্লেখপঞ্জি প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে, নীচে ও ডানপাশে ২.৫৪ সেমি শূন্যস্থান রাখা হয়েছে। বামপাশে বাঁধাই এর সুবিধার জন্য ৩.৩০ সেমি জায়গা রাখা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের প্রারম্ভে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রতিকৃতি এবং পরিসমাপ্তিতে আচার্য মহাশয়ের উপাধির শংসাপত্র ও গ্রন্থসমূহের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তাঁর সারস্বত কৃতির প্রায় সমগ্র গ্রন্থ তালিকা আকারে দেওয়া হয়েছে। সন্দর্ভের সমাপ্তির পূর্বে গ্রন্থপঞ্জি পদ্ধতি অনুযায়ী MLA Eight Edition ফরম্যাট এ সংযোজিত করা হয়েছে। তবে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বা বোঝার সুবিধার্থে ইংরেজীতে গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করেছি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য   জন্ম : ১৮৮৮ মৃত্যু : ১৯৭২

পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের হাতে

মানপত্র গ্রহন

সূচিপত্র

বিষয় :	**পৃষ্ঠাঙ্ক**
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	i-iii
মুখবন্ধ	iv
তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রতিকৃতি	v-vii
সূচিপত্র	viii-x
১. প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা: কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত	**১-৩৭**
১.০ জন্ম ও বংশপরিচয়	
১.১ কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বংশলতিকা	
১.২ বাল্যকাল ও প্রারম্ভিক শিক্ষা	
১.৩ উচ্চতর শিক্ষা ও উপাধিপ্রাপ্তি	
১.৪ কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যাপকগণ	
১.৫ তর্কাচার্য মহাশয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যার্থিগণ	
১.৬ অধ্যাপনা ও কর্মজীবন	
১.৭ সম্মান-প্রাপ্তি	
১.৮ দাম্পত্যজীবন	
১.৯ নাট্যচর্চা ও অভিনয়দক্ষতায় তর্কাচার্য	
১.১০ মহাপ্রয়াণ	
১.১১ তর্কাচার্য মহাশয় স্মরণে পণ্ডিতগণের মন্তব্য	
উল্লেখপঞ্জি	
২. দ্বিতীয় অধ্যায় : ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনালোকে আচার্য প্রতিভা	**৩৮-১০৬**
২.০ *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপঃ* গ্রন্থের স্বকৃত *সুপ্রভা* ব্যাখ্যাসহ সম্পাদনা	

২.১ *সূক্তিঃ* টীকা অবলম্বনে *সূক্তিদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা

২.২ *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের স্বকৃত *রত্নলক্ষ্মী* টীকা সহ সম্পাদনা

২.৩ *মুক্তিবাদঃ* গ্রন্থের স্বকৃত *মুক্তিদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা

২.৪ *মুক্তিবাদবিচারঃ* গ্রন্থোপরি স্বকৃত *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা সহ সম্পাদনা

২.৫ *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশঃ* গ্রন্থ সম্পাদনা

২.৬ *ন্যায়দর্শনবিন্দুঃ*

২.৭ *শব্দার্থসারমঞ্জরী* গ্রন্থ ও স্বকৃত *সারদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা

২.৮ *অক্ষপাদদর্শনম্*

২.৯ *জাতিবাধকবিচারঃ*

২.১০ *ন্যায়পরিভাষা*

২.১১ *সাংখ্যসারঃ* গ্রন্থোপরি *সারপ্রভা* টীকাসহিত সম্পাদনা।

২.১২ স্বকীয় *ভাষ্যপ্রভা* পাদটীকাসহ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থ সম্পাদনা।

উল্লেখপঞ্জি

তৃতীয় অধ্যায় : কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যের অবদান ১০৭-১৭৯

৩.০ মৌলিক কাব্যগ্রন্থ রচনাকৃতি

৩.০.০ মহাকাব্য (*সত্যানুভাবম্, যোগিভক্তচরিতম্, আশুতোষাবদানম্*)

৩.০.১ খণ্ডকাব্য (*মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্, আলোকতিমিরবৈরম্*)

৩.০.২ দৃশ্যকাব্য (*প্রশান্তরত্নাকরম্, মাণবকগৌরবম্, নল-দময়ন্তীয়ম্*)

৩.১ অনুবাদগ্রন্থসমূহ

৩.২ স্বকীয় টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

৩.৩ বিবিধ পত্রিকায় প্রাপ্ত রচনাকৃতি

উল্লেখপঞ্জি

চতুর্থ অধ্যায় : সাহিত্য ও দর্শন: একে অন্যের পরিপূরক ১৮০-২১৬

৪.০ সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি

৪.১ সাহিত্যের লক্ষণ

৪.২ সাহিত্যের কাল বা সময়

৪.৩ দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি

৪.৪ দার্শনিক ও সাহিত্যিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

৪.৫ সাহিত্যে দর্শন ও দর্শনে সাহিত্য

৪.৬ কাব্য বা সাহিত্যের মাধ্যমে দর্শন

৪.৭ দর্শনের মাধ্যমে সাহিত্য

উল্লেখপঞ্জি

পঞ্চম অধ্যায় : তর্কাচার্য মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি ও তার অনন্যতা ২১৭-২৫২

৫.০ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তর্কাচার্য মহাশয়ের অনন্যতা

৫.১ সাংখ্যদর্শনে আচার্য মহাশয়ের অবদান

৫.২ কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যকৃতির স্বকীয়তা

৫.৩ পুরাণশাস্ত্রে আচার্য প্রতিভা

৫.৪ প্রকীর্ণ বিষয় অবলম্বনে কাশ্যপকবির অবদান

৫.৫ অনুবাদ সাহিত্যে অনবদ্য কৃতিত্ব

৫.৬ টীকাসহিত গ্রন্থ সম্পাদনায় কাশ্যপকবির নৈপুণ্যতা

উল্লেখপঞ্জি

উপসংহার ২৫৩-২৬২

তর্কাচার্য মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থতালিকা ২৬৩-২৬৮

গ্রন্থপঞ্জি ২৬৯-২৭৬

তর্কাচার্য মহাশয়ের উপাধির শংসাপত্র ও গ্রন্থসমূহের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি ২৭৭-৩০০

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা : কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত

জন্ম ও বংশপরিচয়:- ঊনবিংশ শতকে যে কয়েকজন প্রতিভাবান, মেধাবী ও জ্ঞানতপস্বী সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বিদ্যাচর্চার জন্য সকলের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল তাঁদের মধ্যে পণ্ডিতবরেণ্য কালীপদ চক্রবর্তী (উপাধি তর্কাচার্য) অন্যতম। তিনি পণ্ডিতসমাজে 'কাশ্যপকবি' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এই পণ্ডিতপ্রবর বাঙালি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার অধুনা বাংলাদেশের কোটালিপাড়া পরগণার ঊনশিয়া গ্রামের কাশ্যপপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এই কোটালিপাড়ার খ্যাতি তৎকালীন সময়ে সংস্কৃত চর্চায় বিশেষ অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর এ বিষয়ে বলেছেন-

'ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া পরগণা বঙ্গদেশের এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্র। এখানকার প্রাচীন জলদুর্গের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীনমুদ্রা, পুঁথিপত্র, এবং তাম্রপত্রাদি আবিষ্কারের ফলে এই স্থানের প্রাচীন ঐতিহ্যের নানা দিক উন্মোচিত হইয়াছে। বিগত এক সহস্র বছর এই পুণ্যভূমি বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থানের মর্যাদা লাভ করিয়া আসিয়াছে ......শুনক এবং কাশ্যপ ছাড়াও ভরদ্বাজ, শৌনক, শাণ্ডিল্য, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌতম, মৌঞ্জর্ষি ও সঙ্কর্ষণ গোত্রের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা কোটালীপাড়ার সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের কাজ করিয়া আসিয়াছেন'।[১]

মহামান্য হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ও প্রখ্যাত বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী এই কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং একসময় স্থানটি সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থানে পরিণত

হয়। কণাদ-তর্কবাগীশ প্রণীত *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের ভূমিকাংশে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন–

'তত্রাপি সুমহান্ অনিতরসাধারণো বঙ্গেষু প্রকর্ষঃ। তন্ত্রান্তরাপেক্ষয়া চ নৈয়ায়িকেষু বৈশেষিকেষু চ তন্ত্রেষু বৈশিষ্ট্যমাসীদ্ বঙ্গীয়ানাম্। বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে নবদ্বীপভূমৌ ভট্টপল্ল্যাং খানাকুল-কৃষ্ণনগরে বিক্রমপুরে কোটালিপারে চ তদা তাদৃশাঃ পণ্ডিতাঃ সমবর্ত্তন্ত, যেষাং স্মৃতিরপ্যদ্য পুনাতি চিত্তং বিদ্যাপ্রণয়িনাম্, গৌরবঞ্চ সুমহদেব সম্পাদয়তি বঙ্গবসুন্ধরায়াঃ'।[২]

পিতা হরিদাস তর্কতীর্থ ও মাতা সীতাসুন্দরীর অগ্রজ সন্তান ছিলেন তিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতাঞ্জলিঃ* কাব্যগ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের সময় গ্রন্থের প্রারম্ভে 'অনুবাদকের নিবেদন' অংশে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় আত্মপরিচয় বলতে গিয়ে বলেছেন-

পূর্ববঙ্গ-প্রদেশীয়-কোটালিপারবাসিনঃ।
তর্কতীর্থোপনাম-শ্রীহরিদাসমনীষিণঃ।।
সুতেন তর্কাচার্যেণ কাশ্যপান্বয়জন্মনা।
বাল্যাবধি প্রযত্নেন দেববাণী নিষেবিণা।।[৩]

কিন্তু দেশভাগের পর নিজের স্বদেশ ছেড়ে কালীপদের সপরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং হুগলীতে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে হুগলীর জেলার অন্তর্গত ভদ্রকালীর (উত্তরপাড়া) শান্তিনগর গ্রামে কালীপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের বংশধরেরা বাস করছেন। তাঁদের নিবাসের নাম 'কাশ্যপাশ্রম'। আত্মপরিচয়ে বলা হয়েছে-

বঙ্গপ্রদেশস্য বিভাগহেতোঃ,
স্বদেশবাসে সুচিরায় লুপ্তে।

হুগলীপ্রদেশস্থিত-ভদ্রকাল্যাং,

সবান্ধবো বাসমকল্পয়ত্ সঃ।[৪]

তর্কাচার্য মহাশয় কর্তৃক বিরচিত *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* খণ্ডকাব্যের ‘কবিবংশাদিশংসনম্’ নামক প্রারম্ভিক অংশে আত্মপরিচয়মূলক ৬৮ টি শ্লোক পাওয়া যায়। এই জীবনচরিতটি প্রামাণিক বলা যায়, কারণ আচার্য মহাশয়ের জীবিতকালে এই খণ্ডকাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে আচার্য মহাশয়ের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত পরিস্ফুট হয়েছে। এছাড়াও তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বহুবিধ গ্রন্থে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। আচার্যদেবের গৌরবময় বংশপরিচয় সম্বন্ধে জানা যায় পূর্ববঙ্গের অর্ন্তগত কোটালিপাড়ায় কাশ্যপ কান্যকুব্জ মিশ্রবংশে রাজা প্রতাপাদিত্যের দ্বারা প্রদত্ত ভূমিতে পুরন্দরাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সেই পুরন্দরাচার্যের সুকীর্ত্তিসম্পন্ন, সদাচার, বংশমর্যাদাপূর্ণ, পণ্ডিতপ্রকাণ্ড শ্রীনাথ, যাদবানন্দ, মধুসূদন (প্রখ্যাত বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী) ও বাগীশ নামে চারজন পুত্র ছিল। ‘কবিবংশাদিশংসনম্’ অংশে বলা হয়েছে –

পূর্ববঙ্গেষু কোটালিপারে পুরপুরন্দরে

কাশ্যপে কান্যকুব্জীয়ে মিশ্রবংশে শ্রিতোদয়ঃ।

আসীত্ পুরন্দরাচার্য্যোপাখ্যো বিপ্রঃ প্রমোদনঃ।

চন্দ্রপ্রতাপভূপেন ভূপ্রদানেন বাসিতঃ।

আচার্যচূড়ামণিরিদ্ধতেজাঃ,

শ্রীনাথানামা প্রথমোঽস্য পুত্রঃ।

কুলাভিমানী বিদুষামধীশঃ,

সদা সদাচারপরঃ সুকীর্ত্তিঃ।

দ্বিতীয়ো যাদবানন্দো ন্যায়াচার্য্যোপনামকঃ।

সরস্বত্যুপনামা চ তৃতীয়ো মধুসূদনঃ।

বাগীশশ্চাপরঃ পুত্রো জলমগ্নো জহাবসূন্।[৫]

সুতরাং শ্লোকসমূহ থেকে জানা যায় প্রথম পুত্র শ্রীনাথ ছিলেন আচার্যচূড়ামণি, দ্বিতীয় পুত্র যাদবানন্দ 'ন্যায়াচার্য' উপাধিতে সম্মানিত। তৃতীয় পুত্র মধুসূদন ছিলেন প্রখ্যাত বৈদান্তিক, যিনি পরবর্তিকালে বৈরাগ্যবশত গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন এবং *বেদান্তদর্শনে*র অদ্বিতীয় গ্রন্থ *অদ্বৈতসিদ্ধিঃ* প্রণয়ন পূর্বক প্রখ্যাত হন। অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর এ বিষয়ে বলেছেন-

'বিশ্রুতকীর্ত্তি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতী এখানকার ঊনশিয়া গ্রামবাসী পাশ্চাত্ত্য বৈদিক কাশ্যপ আচার্য পুরন্দরের পুত্র। আকবরের রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি বিশেষ নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া ছিলেন, একথা *আইন-ই-আকবরি*তে উল্লিখিত হইয়াছে'।[৬]

বাল্য এব স বৈরাগ্যাজ্ জহৌ দণ্ডী গৃহাশ্রমম্।

তস্মাদদ্বৈতসিদ্ধ্যাদ্যা নানাগ্রন্থা জনিং যযুঃ।[৭]

শ্রীনাথের পুত্র লক্ষ্মীদাস, লক্ষ্মীদাসের পুত্র রামনারায়ণ, রামনারায়ণের পুত্র ছিলেন দেবীরাম, দেবীরামের পুত্র কন্দর্প এবং কন্দর্পের পুত্র ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক রমাকান্ত। 'কবিবংশাদিশংসনম্' আত্মপরিচয়ে বলা হয়েছে-

ন্যায়ালঙ্কারোপনামা লক্ষ্মীদাসো মহামতিঃ।

শ্রীনাথস্য সুতস্তস্য রামনারায়ণঃ সুতঃ।

দেবীরামঃ সুতস্তস্য কন্দর্পস্তত্ সুতোঽভবত্।

তস্য পুত্রো রমাকান্তো ভিষজাং যো গুরুর্মহান্।[৮]

এরপর দেবী চণ্ডীর আর্শীবাদে রমাকান্তের বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যাপরায়ণ পাঁচ পুত্র জন্মায়। এই পাঁচজন পুত্র হলেন হরকুমার, দ্বারিকানাথ, মহিমচন্দ্র, সীতানাথ ও গোপাল। প্রথম পুত্র হরকুমার (কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের পিতামহ) ছিলেন সদাচারসম্পন্ন, দ্বিতীয় পুত্র দ্বারিকানাথ ছিলেন মন্ত্রতন্ত্রে অভিজ্ঞ, তৃতীয় পুত্র মহিমচন্দ্র শিরোমণি ছিলেন প্রখ্যাত পুরাণবক্তা ও বংশগৌরবকারী। তর্কাচার্য মহাশয় বিরচিত *অনুবাদ-নবোদয়ঃ* গ্রন্থটিতে সেই কথা স্বীকার করেছেন গ্রন্থের 'উৎসর্গপত্রম্' অংশে-

বংশস্য গৌরবকরে পথি নিত্যচারী
ধীরোত্তমঃ পিতৃপিতৃব্যপদে স্থিতো মে।
পৌরাণিকো মহিমচন্দ্রশিরোমণির্যং
জ্যেষ্ঠাদগাত্ কৃতকপুত্রতয়া সুবুদ্ধিম্।[৯]

চতুর্থ পুত্র সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রে প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং পঞ্চম পুত্র গোপাল বিদ্যার অহংকারের অভিশাপের ফলে পরলোকগমন করেন –

চণ্ডীপ্রসাদস্তত্পুত্রঃ সোঽপ্যভূদ্ ভিষজাং গুরুঃ।
তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রা বিদ্যাচারপরায়ণাঃ।
আদ্যো হরকুমারাখ্যঃ সদাচারপরঃ পরঃ।
দ্বিতীয়ো দ্বারিকানাথো মন্ত্রতন্ত্রাদিকোবিদঃ।
পরো মহিমচন্দ্রাখ্যঃ শিরোমণিরিতি শ্রুতঃ।
পুরাণবক্তা বংশস্য গৌরবাধায়কো মহান্।
স্মার্ত্তো বিদ্যাভূষণাখ্যসীতানাথঃ পরঃ সুতঃ।
বিদ্যাদর্পেণ শপ্তশ্চ গোপালঃ পঞ্চমো মৃতঃ।[১০]

পণ্ডিত হরকুমারের দুজন পুত্র হলেন হরিদাস ও অপরজন হলেন কৃষ্ণদাস। প্রথম পুত্র হরিদাস ছিলেন তর্কশাস্ত্রের বিশেষ প্রতিভার অধিকারী, তিনি তর্কতীর্থ উপাধি লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল পণ্ডিত সমাজে বিস্ময়ের কারণ। অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর বলেছেন-

'হরকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস তর্কতীর্থ তৎকালীন ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিশিষ্ট মেধাবী ছাত্রদের অন্যতম হইলেও আর্থিক কারণে চিরকাঙ্ক্ষিত চতুষ্পাঠী স্থাপনের পরিবর্তে পাথুরিয়া ঘাটার রাজপণ্ডিতের পদ স্বীকার করতে বাধ্য হন'।[১১]

তিনি কবিচিত্তের আনন্দদায়ক সুললিত ভাষায় সংস্কৃত কবিতা রচনা করতেন। এ ছাড়াও তিনি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, যশসম্পূর্ণ এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারী। এই পণ্ডিত হরিদাস তর্কতীর্থের রামের সীতার ন্যায় পতিব্রতা 'সীতাসুন্দরীদেবী' নামে এক কন্যার সাথে বিবাহ হয়।

এই সীতাসুন্দরীদেবী ছিলেন সমস্ত প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত ও স্বাধীনচেতা। তবে হরিদাস ও সীতাসুন্দরীদেবীর দাম্পত্যজীবনে সঠিক সময়ে সন্তানাদি না আসায় হরিদাসের পিতা হরকুমার বংশরক্ষার ব্যাপারে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এরপর পণ্ডিত হরিদাস দেবদ্বিজের শ্রদ্ধাবশত *শ্রীশ্রীচণ্ডীর* শতাবৃত্তি প্রত্যহ পাঠ করতেন। দেবীর চণ্ডীর প্রসন্নতাহেতু হরিদাসের চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই চারজন পুত্র হলেন প্রথমপুত্র কালীপদ, দ্বিতীয় পুত্র হরিহর, তৃতীয় পুত্র রামরতন এবং চতুর্থ পুত্র কার্ত্তিক। আত্মপরিচয়ে বলা হয়েছে-

সাধোর্হরকুমারস্য বভূব তনয়দ্বয়ম্।

তত্রাদ্যো হরিদাসাখ্যঃ কৃষ্ণদাসাভিধোঽপরঃ।

প্রথমো হরিদাসোঽভূদ্ তর্কতীর্থোপনামকঃ।

তর্কেষু প্রতিভা যস্য বিদুষাং বিস্ময়াবহা।

সুরম্যা কবিতা তস্য কবিচিত্তপ্রসাদনী।

শীলঞ্চ বিমলং তাতশীলতুল্যং যশস্করম্।

তস্য রামস্য সীতেব সীতাসীত্ সহধর্মিণী।

যুগধর্মঃ প্রভাবেণ মুক্তো যত্র পদে পদে।

তস্যা দৃষ্ট্বা ব্যতিক্রান্তমিবাপত্যোচিতং বয়ঃ।

হরিদাসপিতা সাধুর্বংশলোপভয়াকুলঃ।

স্বভাবসিদ্ধয়া দৈবশ্রদ্ধয়াবিদ্ধমানসঃ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীশতাবৃত্তিপাঠং বিপ্রৈরকারয়ত্।

ততস্তস্যাং সমুত্পন্নাশ্চত্বারস্তনয়াঃ ক্রমাত্।

বৈধেন বিধিনা কিং বা ফলং সাঙ্গ ন নাপ্যতে?

আদ্যঃ কালীপদস্তেষাং ততো হরিহরাভিধঃ।

তৃতীয়ো রামরতনশ্চতুর্থঃ কার্ত্তিকস্তথা।[১২]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অনূদিত *শ্রীশ্রীচণ্ডী* গ্রন্থের ‘পিতৃতর্পণ’ অংশে তর্কাচার্য পুত্র অধ্যাপক সোমেশ চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন-

‘*শ্রীশ্রীচণ্ডী*র প্রতি শ্রদ্ধা ও পরম বিশ্বাস ছিল তাঁর জন্মান্তরের সংস্কারের মত। পিতার কাছ থেকে শোনা যায় – আমার পিতামহ নৈয়ায়িক হরিদাস তর্কতীর্থ ও পিতামহী সীতাসুন্দরী দেবী বহুদিন নিঃসন্তান থাকার পর ‘শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ’ অনুষ্ঠান করান এবং আমার পিতাকে প্রথম সন্তানরূপে লাভ করেন। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করতে আমার

পিতার এই নামকরণ। তা ছাড়া আমাদের পূর্বপুরুষ অধিকাংশই বিষ্ণুর নামধারী। কারণ শালগ্রামশিলা আমাদের গৃহদেবতা'।[১৩]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় স্বয়ং *বেণীসংহার* নাটকের *কঙ্কতিকা* টীকারম্ভে মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে বলেছেন-

.... শ্রীকালীপদমানম্য শ্রীকালীপদকাঙ্ক্ষয়া।

শ্রীকালীপদনাম্নেয়ং বিবৃতিঃ ক্রিয়তে ময়া।।[১৪]

হরকুমারের অপর পুত্র কৃষ্ণদাসের তিন পুত্র জন্মায়। এই তিনজন পুত্র হলেন উপেন্দ্র, নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র। এই পুত্রেরা সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন বলে জানা যায়। তর্কাচার্য মহাশয়ের পিতৃব্য কৃষ্ণদাস নিজেও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন সেকথা তর্কাচার্য মহাশয় নিজেও স্বীকার করেছেন। তর্কাচার্য বিরচিত *অনুবাদ-নবোদয়ঃ* গ্রন্থটির 'উৎসর্গপত্রম্' অংশে বলেছেন-

যো ভব্যভাগবতভাবিতসত্স্বভাবো

দেবদ্বিজেষু পরমাং রতিমাসসাদ।

ধীমানুপেন্দ্রপরমঃ পরভব্যকামী

শ্রীকৃষ্ণদাস ইতি সান্বয়নাম ভেজে।[১৫]

পিতৃব্যের প্রথম পুত্র উপেন্দ্র ছিলেন সদাচারসম্পন্ন ও নিত্যশাস্ত্র অধ্যয়নকারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন একাধারে কাব্য ও সাংখ্যতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত, এছাড়াও দার্শনিক ও সংস্কৃত কবি। দ্বিতীয় পুত্র নরেন্দ্রও ছিলেন উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত, তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন এবং যত্নের সাথে ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করতেন। তবে তিনি অকালপ্রয়াত হন। তৃতীয় পুত্র সুরেন্দ্র ছিলেন কাব্যপুরাণতীর্থ পণ্ডিত। তিনি অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ

ও প্রকৃত শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং কর্মজীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। আত্মপরিচয়ে বলা হয়েছে-

সুতাঃ কবিপিতৃব্যস্য সর্বে সংস্কৃতসেবিনঃ।

উপেন্দ্রশ্চ নরেন্দ্রশ্চ সুরেন্দ্রশ্চেতি বিশ্রুতাঃ।

তত্রোপেন্দ্রঃ কাব্যসাংখ্যতীর্থো দার্শনিকঃ কবিঃ।

সদাচারপরো নিত্যং শাস্ত্রাধ্যাপনতত্পরঃ।

শাস্ত্র্যুপাধির্নরেন্দ্রাখ্যঃ কশ্চিদ্ বিদ্যালয়ং শ্রিতঃ।

শিষ্যান্ সংশিক্ষয়ন্নেব গতোঽকালে সুরালয়ম্।

কাব্যপুরাণতীর্থশ্চ সুরেন্দ্রঃ শিক্ষণব্রতী।

কৃতী পাশ্চাত্ত্যবিদ্যায়ামপি বিদ্যালয়ে স্থিতঃ।[১৬]

তর্কাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্ত্তিক বংশগৌরববশত সংস্কৃত ভাষার বিশেষ সেবা করেন। কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি সংস্কৃতের নাট্যসমূহের প্রয়োগে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এমনকি তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের 'নাট্যাচার্য' পদেও সমাসীন হন এবং সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে সদাচারসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। এক সময় তিনি পরিষদের সচিব পদের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ ভাই কার্ত্তিক বাদে অপর দুইজন হরিহর ও রামরতনের সংস্কৃত সেবায় কোন প্রকার আগ্রহ ছিল না। তারা পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সাথে তাদের বিদ্যাবৈষম্য তৈরী হয়, এতে তর্কাচার্য বিশেষ মর্মাহত হন-

কার্ত্তিকেন কনিষ্ঠেন তথাপি কুলগৌরবাত্।

গীর্বাণবাণীসেবায়াং পরতঃ স্থাপিতা মতিঃ।

অধীত্য কাব্যশাস্ত্রঞ্চ সংস্কৃতজ্ঞানমর্জিতম্।

দাক্ষ্যং সংস্কৃতনাট্যানাং প্রযোগেষ্বপি দর্শিতম্।

কালে পরিষদা সোঽসৌ নাট্যাচার্য্যপদে বৃতঃ।

সংস্কৃতস্য প্রভাবোঽস্য শীলেঽপি সমলক্ষ্যত।

প্রিয়া সংস্কৃতসাহিত্যপরিষত্তস্য সর্বথা।

যেন সর্বেষু কৃত্যেষু তস্যাঃ স সচিবো মহান্।

ভ্রাতৄণামন্যবিদ্যানাং বিদ্যাবৈষম্যসম্ভবম্।

যত্ কবের্মানসং দুঃখং তত্ তেনৈবাপসারিতম্।[১৭]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বংশলতিকা

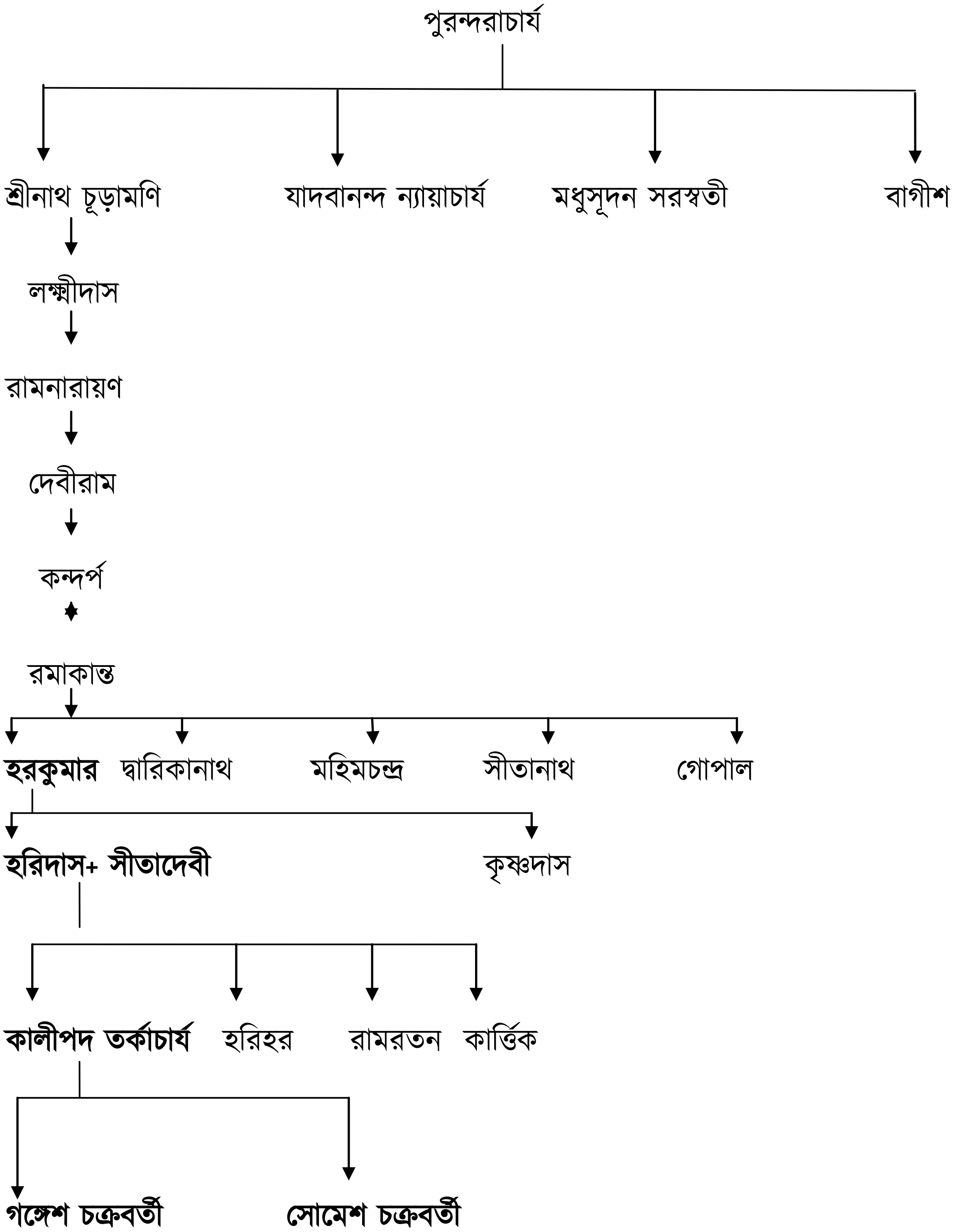

বাল্যকাল ও প্রারম্ভিক শিক্ষা :- পণ্ডিত হরিপদ ও সীতাদেবীর অগ্রজ সন্তান কালীপদ বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। শৈশবকাল থেকেই তার প্রত্যুৎপন্ন বিদ্যাবত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কালীপদকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্য প্রথমে পিতার ইচ্ছানুসারে ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু তার ইংরেজি বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ব্যর্থ হয় এবং ইংরেজি বিদ্যালয় ছেড়ে বাল্যকাল থেকেই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন শুরু করেন। কালীপদ ব্যতীত অপর তিনভাই হরিহর, রামরতন ও কার্ত্তিক পিতার ইচ্ছায় পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা যত্নের সাথে অধ্যয়ন করে বিদ্বান হয়ে ওঠেন।

যেহেতু কালীপদ মহাশয়ের বিদ্যাবংশ তাই চতুষ্পাঠীতে নিজ পিতৃব্যের নিকটে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা প্রারম্ভ হয়। প্রথমে নিজ পিতৃব্য পণ্ডিত কৃষ্ণদাসের কাছে সংস্কৃত প্রারম্ভিক শিক্ষা শুরু হয়। এরপর পিতার পিতৃব্য স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত সীতানাথ বিদ্যাভূষণের নিকটে কালীপদ মহাশয়ের সংস্কৃত শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। এরপর বিদ্যাভূষণের মৃত্যু হলে বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন ও কাশীকান্ত শিরোমণির নিকট তিনি কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। শৈশবকালে নিজের দেশে কিছুটা শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও পিতৃব্য কৃষ্ণদাসের সদুপদেশে সংস্কৃতবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। আত্মপরিচয়ে এ বিষয়ে বলা হয়েছে-

কালে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যায়াঃ শিক্ষণে পিতুরিচ্ছয়া।
প্রবৃত্তোঽপি নিবৃত্তোঽভূদাদ্যঃ কালীপদস্ততঃ।
সর্বঃ প্রযত্নো ব্যর্থোঽভূত্ পিতুরিচ্ছাপ্রপূরণে।
নহি যত্নশতেনাপি বিধেরিচ্ছা প্রবাধ্যতে।
পিতুরিচ্ছানুসারেণ পরতস্তু পরে ত্রয়ঃ।
পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাং যত্নেনৈবাশিক্ষন্ত যথাবিধি।

অগত্যা তাতসম্মত্যা জ্যেষ্ঠঃ কালীপদাভিধঃ।

সংস্কৃতে রতিমাপন্নঃ প্রারেভে তত্ প্রশিক্ষিতুম্।

শব্দশাস্ত্রমধীত্যাদৌ স্বদেশে শৈশবে অংশতঃ।

কলিকাতাপুরং প্রাপ্য তত্পাঠং স সমাপয়ত্।

পিতৃব্যকৃষ্ণদাসস্য সুগমাদুপদেশতঃ।

বিশিষ্টং সংস্কৃতজ্ঞানং তদৈবাত্র দধে পদম্।[১৮]

উচ্চতর শিক্ষা ও উপাধিপ্রাপ্তি :- বাল্যকালে নিজদেশে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে কলকাতায় এসে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তৎকালীন সময়ে ভট্টপল্লীর বিখ্যাত মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে তিনি ভর্ত্তি হয়েছিলেন কাব্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য। অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর বলেছেন-

'পাথুরিয়াঘাটা রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং উক্ত পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধি, বিশেষত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের সহিত সুদীর্ঘ মৈত্রী পণ্ডিত হরিদাসকে পুত্রের পরবর্তী শিক্ষার জন্য উক্ত কলেজকে নির্বাচনে প্রেরণা দিল'।[১৯]

মূলাজোড়ের অধ্যাপক হরিপদ বিদ্যারত্নের কাছে অলংকার ও সাহিত্য অধ্যয়ন পূর্বক উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন – 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পান। প্রখ্যাত অধ্যাপক ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নিকটে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে, কলাপ ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারপূর্বক স্বর্ণপদক লাভ করেন – 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি পান।

এইসময় থেকেই সরল সংস্কৃতে নলের বৃত্তান্তকে আশ্রয় করে তিনি নাটক রচনা করেন এবং সুহৃদ্বর্গের সাথে তা অভিনীত হয়। তার দক্ষতার নির্দশনস্বরূপ নানাবিধ পত্র-পত্রিকায় সংস্কৃত ভাষায় গদ্য, পদ্য ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। আসলে বলা যেতে পারে ছাত্রাবস্থা থেকেই নাট্যাভিনয়ে অসাধারণ পারদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। তিনি খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। আবার অসাধারণ বাগ্মী পুরুষও ছিলেন। বলা হয়েছে –

ক্রীড়াসু ন সমাসক্তিস্তস্য বাল্যেঽপ্যদৃশ্যত।
নাট্যাভিনয়কৃত্যে তু বাল্যাদেব রতিঃ পরা।
উত্তমা বক্তৃতাশক্তিরস্য কোবিদতোষণী।
যত্র নাট্যপ্রয়োগাদিকৃত্যমাপ সহায়তাম্।[২০]

তারপর মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকটে দশবছর নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, মূলত এই শিবচন্দ্র মহাশয় কালীপদের ন্যায়গুরু ছিলেন। শিবচন্দ্র ভট্টপল্লীর (বর্তমান নাম ভাটপাড়া) বিদ্যাবৈভবের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। অধ্যাপনাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। সেই সময় তিনি অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ ন্যায়াধ্যাপক এবং তাঁর শিষ্যেরা অধ্যাপনা নৈপুণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হযেছিলেন। এরপর তর্কশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়নপূর্বক তর্কের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ‘সুবর্ণ কেয়ুর’ সম্মানজনক পুরস্কার পান – ‘তর্কতীর্থ’ উপাধি অর্জন করেন। ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার পূর্বক ‘ন্যায়তীর্থ’ উপাধিও পান। ন্যায়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম কালীপদের প্রতিভায় খুশি হয়ে তাঁকে ন্যায়ের বিশেষ বৃত্তি প্রদান করেন এবং “তর্কাচার্য” উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর থেকেই ‘কালীপদ-তর্কাচার্য’ উপাধিটি নিজের সাথে ব্যবহার করেন এবং তর্কাচার্যরূপে তিনি সমধিক পরিচিত হন। ‘কবিবংশাদিশংসনম্’ অংশে বলা হয়েছে-

ততঃ কাব্যাদিবিদ্যানাং বিশেষাধিগমেচ্ছয়া।
মূলাজোড়-মহাবিদ্যালয়ে স পঠিতুং গতঃ।
তত্র কাব্যং পঠন্নেব লব্ধবান্ স পরং যশঃ।
কাব্যতীর্থপরীক্ষায়ামব্যাপ্তঃ প্রথমং পদম্।
নলস্য বৃত্তমালম্ব্য তদৈব সুরভাষয়া।
রচিতং নাটকং তেন প্রযুক্তং তত্র বন্ধুভিঃ।
দৃষ্টাস্তদা প্রভৃত্যেব নানাপত্রপ্রকাশিতাঃ।
গদ্যপদ্যনিবন্ধাশ্চ তত্কৃতা দেবভাষয়া।
অথ গৌতমসঙ্কাশাত্ সার্বভৌমাদ্ গুরোশ্চিরম্।
মহামহোপাধ্যায়াচ্চ শিবচন্দ্রান্মহামতেঃ।
তর্কবিদ্যাং সমাসাদ্য প্রথমোঽভূত্ পরীক্ষণে।
মহাদৈন্যেঽপি নৈবাসৌ সঙ্কল্পাদ্ বিচ্যুতোঽভবত্।
পরীক্ষানিয়মাদেষ তর্কতীর্থপদং গতঃ।
ভূষিতো গুরুণা স্নেহাত্ তর্কাচার্য্যেত্যুপাধিনা।
কাব্যে ব্যাকরণে তর্কে তীর্থোপাধিষু সত্স্বপি।
যমুপাধিং গুরুং মত্বা নাম্নি ধত্তে তমেব সঃ।[২১]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যাপকগণ :

প্রারম্ভিক শিক্ষা : ১. নিজ পিতৃব্য পণ্ডিত কৃষ্ণদাস
২. পিতৃপিতৃব্য সীতানাথ-বিদ্যাভূষণ-স্মৃতিতীর্থ

উচ্চশিক্ষা : ৩. বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন
৪. কাশীকান্ত শিরোমণি

(কাব্যতীর্থ উপাধি)　　৫. হরিপদ বিদ্যারত্ন

(ব্যাকরণতীর্থ উপাধি)　৬. ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার

(তর্কতীর্থ, ন্যায়তীর্থ, তর্কাচার্য)　৭. মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যার্থিগণ :

১. গৌরীনাথ শাস্ত্রী

২. অশোকনাথ শাস্ত্রী[২২]

৩. দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

৪. বিমলকৃষ্ণ মতিলাল[২৩]

৫. পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ[২৪]

৬. অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য

৭. মার্কিন যুক্তরাষ্টের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইঙ্গল[২৫]

৮. নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ[২৬]

৯. ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী[২৭]

১০. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ[২৮]

১১. উপেন্দ্রমোহন কাব্যসাংখ্যতীর্থ[২৯]

১২. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়[৩০]

এছাড়াও জনার্দন কাব্যব্যাকরণতীর্থ, রামধন কাব্যব্যাকরণতীর্থ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী, ধীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, গোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ, হেমন্তকুমার তর্কতীর্থ, যাদবেন্দ্রনাথ রায়

অষ্টতীর্থ, তারাপদ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, পঞ্চানন্দ তর্কতীর্থ, লোকনাথ তর্কতীর্থ, প্রমুখ শিষ্যেরা অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং অধ্যক্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

অধ্যাপনা ও কর্মজীবন :- বিদ্যার্থিজীবন সমাপন করে প্রথমেই নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে (১৯১৬ প্রতিষ্ঠাকাল) নিযুক্ত হন। ‘তর্কাচার্য মহাশয় ছিলেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালের সদস্য। ১৯১৮ সালে ইনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে চতুষ্পাঠীর প্রথম অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন’।[৩১] ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত তর্কাচার্য মহাশয়ের মৌলিক নাটক *প্রশান্তরত্নাকরম্* গ্রন্থের ভূমিকা অংশে পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন–

‘Pandit Kalipada Tarkacharya the author of the present work, is one of the band of energetic pioneer workers who founded the Parishat and made it what it now is. He was at one time the Professor of this Institution and the Editor of the Monthly Journal of the Parishat. He devoted the best portions of his life and energy in moulding the present batch of youthful workers and scholars of the Parishat’.[৩২]

পণ্ডিত কালীপদ নানাবিধশাস্ত্র বিষয়ে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করেন। ফলস্বরূপ তর্কাচার্য মহাশয়ের অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী হয়। যাইহোক সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে প্রথমে পরিষত্ পত্রিকার সহ সম্পাদক, পরে সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তিকালে এই পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন এবং আমৃত্যু এই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বলা যায় ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৪ বছর সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন।

এই অধ্যাপনার অবসরে তিনি বহুবিধ সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং সেই গ্রন্থের আশ্রয়ে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় স্বকীয় টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন সাধারণ

বিদ্যার্থিদের বোধার্থে। প্রতিটি গ্রন্থ অনুবাদ করবার সময় মূল গ্রন্থ প্রারম্ভ হবার পূর্বে তিনি গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থসম্পাদনা উচ্চ পর্যায়ের শাস্ত্রীয় আলোচনায় সমৃদ্ধ। অবশেষে ১৯৩১ সালে কলকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজে চতুষ্পাঠী বিভাগের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন, পরে চতুষ্পাঠী বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন। দীর্ঘকাল এই প্রধান অধ্যাপকের পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন, এই সময় তার অসংখ্য দেশি ও বিদেশি ছাত্রগোষ্ঠী তৈরী হয়।

১৯৫১ সালে আচার্যদেবের অবসরের কাল নির্দিষ্ট থাকলেও সরকার তাঁর ক্ষেত্রে অবসরের মেয়াদ তিন বছর বৃদ্ধি করেন। ১৯৫৪ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও উক্ত কলেজে 'মহাচার্য বিভাগ' খোলা হলে আজীবন তিনি মহাচার্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ২৩ বছর ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং পরবর্তিকালে অবসর গ্রহণের পর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ১৮ বছর 'মহাচার্যবিভাগীয়' অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং বলা যায় কলকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রায় ৪১ বছর কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় অধ্যাপনা করেছেন। আত্মপরিচয়ে বলা হয়েছে-

অথ শিক্ষাসমাপ্ত্যেব সমং দৈবনিয়ন্ত্রণাত্।
নবে সংস্কৃতসাহিত্যপরিষত্-সুপ্রতিষ্ঠিতে।
নানাশাস্ত্রমহাবিদ্যালয়েঽধ্যাপকতাং গতঃ।
প্রাধ্যাপয়ত্ প্রযত্নেন বহুশিষ্যানতন্দ্রিতঃ।
তস্মিন্নবসরে গ্রন্থাবহবস্তেন নির্মিতাঃ।
টীকারূপাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ শ্রিত্বা সাহিত্যদর্শনে।
যেষাং কতিপয়গ্রন্থান্ পরিষত্ সংস্কৃতাশ্রয়া।

প্রীত্যা প্রকাশয়ামাস কেচিচ্চান্যপ্রকাশিতাঃ।

সাহিত্যপরিষত্পত্রীসম্পাদনবিধৌ হি সঃ।

সহ-সম্পাদকঃ পূর্বং ততঃ সম্পাদকোঽভবত্।

বিদ্যাকারণকৈঃ কৃত্যৈঃ সংস্তুতঃ স বুধৈরথ।

রাজকীয়মহাবিদ্যালয়েঽধ্যাপকতামগাত্।

তত্রাধ্যাপ্য বহূন্ শিষ্যানুত্কর্ষেণ মহীয়সা।

গ্রন্থগ্রন্থনকর্মাদ্যৈর্যশো মহদপি শ্রিতঃ।

মহাবিদ্যালয়াদেষ গৃহীত্বাবসরং পুনঃ।

মহাচার্যবিভাগীয়াধ্যাপনে তত্র যোজিতঃ।[৩৩]

কলকাতা সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে অধ্যাপনা করা ছাড়াও কর্মজীবনে আরও অধিক গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। যেমন বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত *আর্যশাস্ত্র* গ্রন্থাবলীর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া তর্কাচার্য মহাশয় ‘বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ’ এর কার্য-নির্বাহক সমিতিরও সদস্য ছিলেন। নানান পত্র পত্রিকায় তাঁর অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যেমন *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা* ছাড়াও *দেবযান, বিদ্যোদয়, আর্যপ্রভা, সুদর্শন, সংস্কৃত প্রতিভা* (দিল্লী থেকে প্রকাশিত) ইত্যাদি। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি *সংস্কৃত পদ্যবাণী* নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা এবং ‘সংস্কৃত পদ্য গোষ্ঠী’ নামে একটি সংস্কৃত সভাও স্থাপন করেন।

সম্মান-প্রাপ্তি :- পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য আজীবন অসংখ্য সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। বঙ্গদেশে এবং ভারতে তো বটেই ভারতের বাইরেও তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রসারিত হয়। পণ্ডিতসমাজে তর্কাচার্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্য এক আশ্চর্য। শাস্ত্রের সকল ক্ষেত্রে তাঁর ছিল

অবাধ বিচরণ। পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে প্রীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার জ্ঞানতপস্বী পণ্ডিত শিরোমণিকে ১৯৪১ সালে সম্মানসূচক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। বলা হয়ে থাকে তিনিই ইংরেজ সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের শেষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

প্রসঙ্গত বলা দরকার পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী মহাশয় *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় বাঙ্গালার প্রথম মহামহোপাধ্যায় নামক প্রবন্ধে বলেছেন –

'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৮৭ সনের জুবিলি উপলক্ষে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজশক্তির শাসনাধীন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই নূতন উপাধি নামের পূর্বে বসিবে, মহামহোপাধ্যায়কে উপাধির চিহ্নস্বরূপ "উষ্ণীব" ও "উত্তরীয়", পাগড়ী ও শাল প্রদত্ত হইবে এবং দরবারে তাঁহাদের স্থান হইবে রাজাদের পরেই'।[৩৪]

১৯৬১ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ 'বিশেষ সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি শংসাপত্র' এবং আজীবন ভোগ্য বার্ষিক ৩০০০ টাকা বৃত্তি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৬২ সালে ভারত সরকার তর্কাচার্য মহাশয়কে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭২ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানজনক ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন, এছাড়াও কাশির ভারতধর্মমহামণ্ডলের পক্ষ থেকে 'বিদ্যাবারিধি' উপাধি, শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য বিদ্যাবংশজ তর্কালংকার নামক 'তর্কবিদ্যাপ্রিয়া' উপাধিতে সম্মানিত করেন এবং স্বর্ণপদক, মহামূল্যবান বস্ত্র ও সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করেন। হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক 'মহাকবি' উপাধি প্রদান করা হয়। এই সংস্থার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়কে

অনেক সম্মান প্রদান করা হয়। তিনি এই সময় একটি খণ্ডকাব্য রচনা করেন। 'কবিবংশাদিশংসনম্' অংশে বলা হয়েছে-

ভারতাধীশ্বরেণাথ কালে তোষমুপেযুষা।
মহামহোপাধ্যায়েতি তস্মৈ মানপদং দদে।।[৩৫]
স্বাধীনভারতস্যাপি তস্মৈ রাষ্ট্রপতির্বরঃ।
দদাবাজীবনং ভোগ্যাং সসম্মানাং পুরস্কৃতিম্।।
বর্দ্ধমানপ্রদেশীয়বিশ্ববিদ্যালয়েন চ।
দত্তং তস্মৈ গুণপ্রীত্যা সসম্মানং 'ডি-লিট্' পদম্।।
কাশী-ভারতধর্মাদিমহামণ্ডলসংসদা।
'বিদ্যাবারিধি' নামাস্মৈ বিতীর্ণঃ বহুপূর্বতঃ।।
শ্রীশৃঙ্গেরিমঠাধীশ-শঙ্করাচার্য্যসূরয়ঃ।
তর্কালংকারনামাস্মৈ তর্কবিদ্যাপ্রিয়া দদুঃ।।
সুবর্ণপদকঞ্চাপি সমহার্ঘপরিচ্ছদম্।
দত্ত্বা সংসাধয়াঞ্চক্রুর্গৌরবং তস্য পুষ্কলম্।
দত্তং সংস্কৃতসাহিত্যসমাজেন প্রতুষ্যতা।
'মহাকবি' পদং তস্মৈ তত্কবিত্বস্য গৌরবাত্।।
মানোঽস্য ভূয়ান্ কাশীস্থবিশ্ববিদ্যালয়াদিষু।
কালীপদেন তেনৈব খণ্ডকাব্যমিদং কৃতম্।[৩৬]

দাম্পত্যজীবন : কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হবার পর, তিনি গুরু কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গুরু দক্ষিণারূপে স্বকন্যা 'রাধালক্ষ্মীর' সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি গুরুর কন্যাকে বিবাহ করেন। পূর্বে গুরুর কন্যার প্রতি

স্নেহশীল হলেও বিবাহের পর রূপে কৃষ্ণবর্ণীয়া রাধালক্ষ্মীকে তিনি প্রীতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে পারলেন না। শ্বশুরালয়ে সকলের অত্যন্ত স্নেহ লাভ করলেও কালীপদের কাছে রাধা ছিল অত্যন্ত অপ্রিয়।

পতি অবহেলার স্বীকার হয়ে রাধালক্ষ্মী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। পতির অবজ্ঞায় দুঃখে ও অপমানে জর্জরিত হয়ে রাধা নিজ জীবনের মূল্যহীনতার কথা ভেবে নিদ্রা ও আহারাদি ত্যাগ করেন। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। চিকিৎসকের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাধা মৃত্যুর দিন গুনতে থাকে। কালীপদ তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রাধার শয্যার পাশে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলেন। কিন্তু পতিগতপ্রাণা রাধা অস্ফূটস্বরে বললেন – ‘স্বপ্নে মে প্রিয়া নান্যা ভবিতা যদি মে মৃতিঃ’। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর সকলকে দুঃখে দগ্ধ করে তিনি চিরতরে ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ করলেন।

কালীপদ অকালে স্বর্গগতা রাধালক্ষ্মীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ছয়টি বিলাসে সম্পূর্ণ *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* নামে একটি খণ্ডকাব্য রচনা করেন। মোট ৬৫৯ টি শ্লোকে মন্দাক্রান্তা ছন্দে কালীপদ ও রাধালক্ষ্মী দেবীর দাম্পত্যজীবনের চিত্র অভিব্যক্ত হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী এখানে ব্যক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থটি কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডকাব্যে কালীপদকে শ্যামদাস, পিতা হরিপদকে বিষ্ণুদাস এবং পিতামহ হরকুমারকে বিপ্রদাস নামকরণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ‘প্রকৃতকাব্য-বিষয়সংক্ষেপঃ’ অংশে শ্লোকাকারে গ্রন্থের সারনির্যাস আলোচিত হয়েছে–

... তস্য প্রথমশিক্ষায়াং সমাপ্তায়াং স্বকে গৃহে।
বিশিষ্টবিদ্যালাভার্থং দূরদেশে স বাসিতঃ।

সুযোগ্যস্য গুরোস্তত্র সন্নিধৌ সুচিরং বসন্।

নানা বিদ্যাসু যত্নেন স জ্ঞানং সম্প্রপেদিবান্।

সমাপ্তে তত্র তস্যাথ বিদ্যাগ্রহণকর্মণি।

উপমেয়ে গুরোঃ কন্যাং তেনাসৌ দৃঢ়মর্থিতঃ।

পূর্ব গুরুসুতামেতামতিস্নেহেক্ষিতামপি।

বিবাহাত্ পরতঃ কৃষ্ণাং প্রীত্যা নাসৌ গৃহীতবান্।

অসৌ পতিগৃহং প্রাপ্য রাধাখ্যা সর্ববান্ধবান্।

প্রীণয়িত্বাপি শীলাদ্যৈঃ পত্যুঃ প্রীতের্বহিঃ স্থিতা।

রাধাদর্শনমপ্যস্য বভূব দৃঢ়মপ্রিয়ম্।

পিতুর্বিদ্যালয়ং যস্মাত্ স্বাশ্রয়ং স সদা ব্যধাত্।

ক্রমেণ প্রাপ্তয়া বৃদ্ধিং পত্যুরাত্মন্যবজ্ঞয়া।

ব্যর্থং সা জীবনং মত্বা নিদ্রাহারাদিকং জহৌ।

জীবনে নির্ব্যপেক্ষাসৌ নিদ্রাহারাদিবর্জনাত্।

আক্রান্তাঙ্গনি রোগেণ গুরুণা রাজযক্ষ্মণা।

ক্রমেণ ববৃধে রোগশ্চিকিত্সয়া ব্যর্থতামগাত্।

পরিবৃত্তিং তদা প্রাপ শ্যামাদাসস্য মানসম্।

রাধায়া রোগশয্যায়ামুপবিষ্টঃ কদাচন।

ক্ষমাং সম্প্রার্থয়াঞ্চক্রে নানা কোমলভাষিতৈঃ।

রাধয়া যাচিতোঽপ্যন্তে প্রাহ প্রস্খলিতাক্ষরম্।

স্বপ্নেঽপি মে প্রিয়া নান্যা ভবিতা যদি মে মৃতিঃ।

তেনাসাধ্যেন রোগেণ সাঽচিরেণ জহাবসূন্।

শোকে নিমজ্জ্য নিঃশেষান্ শীলাদ্যাকৃষ্টবান্ধবান্।[৩৭]

তর্কাচার্য মহাশয় তার পত্নীকে শ্রদ্ধা জানাতে *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* শীর্ষক খণ্ডকাব্য রচনা করলেও আরও বেশ কয়েকটি দর্শনশাস্ত্রের উপর মৌলিক টীকাগ্রন্থে তাঁর নামে শ্লোক রচনা করে পত্নীকে উৎসর্গ করেছেন। যেমন *দীধিতির* টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্যের গুরু হরিরামতর্কবাগীশ বিরচিত *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থের উপরে *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা। অপরটি হল কণাদ তর্কবাগীশ প্রণীত *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের সম্পাদনাকালে এই গ্রন্থের উপরেই কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় বিরচিত *রত্নলক্ষ্মী* টীকা। এই দুটি টীকাগ্রন্থের প্রারম্ভে এবং অন্তিমে নিজ পরলোকগতা পত্নীকে স্মরণ করেছেন।

মুক্তিবাদবিচার গ্রন্থের *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকার অন্তিমে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

> রাধালক্ষ্মীনামধেয়া মদীয়া
> পত্নী প্রাপ্তা মুক্তিমুক্তামকালে।
> তস্যা মুক্তের্ব্যক্তমন্যোক্তিলোভাদ্
> ব্যাখ্যা নীতা মুক্তিলক্ষ্মীত্যভিখ্যাম্।[৩৮]

আবার *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের *রত্নলক্ষ্মী* টীকার প্রারম্ভে তর্কাচার্য মহাশয় নিজ পত্নীকে স্মরণ করে বলেছেন –

> ভাষারত্নং শ্রীকণাদপ্রণীতং
> ভাসা রত্নং যত্নদৃশ্যং বিধত্তে।
> তস্মাদস্যা প্রোজ্জ্বলা কাপি লক্ষ্মী-
> র্লক্ষ্যা লোকৈ রত্নলক্ষ্মীতি নাম্না।।
> অকালে স্বর্গমাপ্তায়াঃ স্বপত্ন্যাঃ স্মৃতিহেতবে।
> তন্নামাংশমুপাদায় টীকানাং ব্যধামিদম্।।[৩৯]

এরপর পিতামহ পণ্ডিত হরকুমার মহাশয় দ্বিতীয়বার বিবাহ করার জন্য পৌত্র কালীপদকে অনুরোধ করেন। পত্নী মৃত্যুর শোকে বিহ্বল উন্মাদপ্রায় কালীপদ সেই প্রস্তাবে রাজী হয় না এবং এই বিষয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য গৃহত্যাগ করেন। জানা যায় এই সময় তিনি নবদ্বীপ গিয়ে অবস্থান করে এবং শিষ্যদের শাস্ত্র অধ্যাপনায় ব্রতী হয়েছিলেন। নবদ্বীপের পুণ্য ভাগীরথী তটে পত্নীর আত্মার শান্তি কামনায় তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* খণ্ডকাব্যের ‘প্রকৃতকাব্য-বস্তুসংক্ষেপঃ’ অংশে বলা হয়েছে –

> ততো বৈধবিধানান্তে পুনর্দারপরিগ্রহে।
> শ্যামাদাসপ্রবৃত্ত্যর্থং যত্নং চক্রে পিতামহঃ।
> অচিরেণ গৃহং ত্যক্ত্বা তেনাত্মা রক্ষিতস্ততঃ।
> ক্রমেণ চ নবদ্বীপং গত্বা তত্র কৃতস্থিতিঃ।
> শিষ্যাধ্যাপনকৃত্যাদ্যৈঃ প্রপেদে সুমহদ্ যশঃ।
> রাধেতি চাজপন্-নিত্যং মন্ত্রবজ্জাহ্নবীতটে।[৪০]

যাইহোক নানাকারণে কালীপদ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন সুশীলা দেবীকে এবং তাদের দুই পুত্র জন্মায়। প্রথমপুত্র হলেন গঙ্গেশ ও দ্বিতীয়পুত্র হলেন সোমেশ। আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় এই দুইপুত্র মহাবিদ্যালয়ে গণিত ও রসায়ন বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। **১৯৯৯** সালে তর্কাচার্য মহাশয় রচিত *শ্রীশ্রীচণ্ডীর* বঙ্গভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় আদ্যাপীঠ দক্ষিণেশ্বর বালিকাশ্রম থেকে। এই গ্রন্থে তর্কাচার্য পুত্র অধ্যাপক সোমেশ চক্রবর্তী গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন ‘পিতৃতর্পণ’ শীর্ষক নামকরণ করে।

নাট্যচর্চা ও অভিনয়দক্ষতায় তর্কাচার্য:- কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় যেমন একাধিক মৌলিক নাটক রচনা করেছেন, আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন নাট্যাচার্য এবং একজন দক্ষ

অভিনেতা। এদিক থেকে বিচার করলে অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাথে তাঁর অনন্যতা সহজেই অনুমান করা যায়। অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুরের প্রবন্ধ থেকে এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। অধ্যাপক ঠাকুর বলেছেন-

'কোনো কোনো বার গ্রীষ্ম অবকাশেও তিনি দেশে যাইতেন। ঐসময় তাঁহার স্বগ্রামে নাট্যাভিনয় হইত। উহাতে আচার্যদেব স্বয়ং এবং তার পরিবারের অন্যান্য অনেকে ভূমিকা গ্রহণ করতেন। আচার্যদেব অভিনয় করিবেন শুনিলে গ্রামান্তরের দ্রষ্টাশ্রোতাদের স্থান সংকুলন করিতে গিয়া গ্রামের লোকের বসিয়া অভিনয় দেখিতে পারিতেন না। আচার্যদেবের নানা ভূমিকার মধ্যে হরিরাজ নাটকে হরিরাজ, রিজিয়া নাটকে রিজিয়া, দেবলাদেবী নাটকে খিজির খাঁ ভূমিকার কথা আজ পর্যন্ত অনেকেরই মনে আছে'।[৪১]

এছাড়াও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তর্কাচার্য মহাশয় কর্তৃক অনেক সংস্কৃতরূপকের মঞ্চস্থ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক অভিনয়ে আচার্যদেব অন্যতম মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তিনি যে যে চরিত্রে অভিনয় করে সেই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর বলেছেন-

'*মৃচ্ছকটিকে* চারুদত্ত, *মুদ্রারাক্ষসে* বিভিন্নবারে চাণক্য, রাক্ষস এবং চন্দনদাস, *চণ্ডকৌশিকে* হরিশ্চন্দ্র, *অভিজ্ঞানশকুন্তলে* দুষ্যন্ত, *বেণীসংহারে* যুধিষ্ঠির, *মধ্যমব্যায়োগে* ভীম, *নলদময়ন্তীতে* নল, *উত্তররামচরিতে* রাম এবং *প্রশান্তরত্নাকরে* রত্নাকরের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন'।

তর্কাচার্য মহাশয়ের নেতৃত্বে নিমন্ত্রিত হয়ে পরিষদের নটমণ্ডলী বারাণসী, পাটনা, কানপুর, কাশিমবাজার, মূলাজোড় এবং চন্দননগরেও অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের আবশ্যকতার জন্য তিনি নিজে যেমন নাটক রচনা করেছেন তেমনি প্রয়োজনবোধে

প্রস্তাবনা পরিবর্তন ও নতুন গান রচনা করেছেন। সুতরাং এসকল আঙ্গিক তর্কাচার্য মহাশয়ের ব্যক্তি চরিত্রের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহাপ্রয়াণ :- ১৯৭২ সালের ২৭ শে জুলাই বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় পণ্ডিতপ্রবর কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের মহাজীবন নির্বাপিত হয়।[৩৭] বলা যায় বঙ্গদেশ সত্যিকারের পণ্ডিতহারা হল। পণ্ডিত তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনাবসানে বঙ্গদেশের অনেক পণ্ডিত শোকজ্ঞাপন করেন। *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকার* ১৯৭৩ সালের ৫৬ তম খণ্ডে 'নিদারুণঃ শোকসংবাদঃ' শিরোনামে শোকজ্ঞাপন করে বলা হয়েছে-

ভোঃ ভোঃ পাঠক-মহাভাগা ভারতবাসিনস্তথা দেশান্তরস্থাঃ! বিজ্ঞাপ্যন্তে ভবন্তো যত্ সংস্কৃতবাঙ্মূর্তয়োঃ মহাকবয়োঃ নৈয়ায়িক-চূড়ামণয়ঃ সর্বশাস্ত্রপারঙ্গমা ভারতললামভূতা মহাত্মানঃ সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-সভাপতয়-স্তথা-সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা-সম্পাদকা-মহামহোপাধ্যায়-ডক্টর- কালীপদ-তর্কাচার্য- মহোদয়া একোনাশীত্যধিক-ত্রয়োদশ-শততম-বঙ্গাব্দীয়-সৌর-শ্রাবণস্যৈকাদশদিবসে গুরুবাসরে নক্তং সার্ধাষ্টমহোরায়াং সর্বানস্মান্ শোকার্ণবে নিমজ্জ্য সজ্ঞানং পরলোকং প্রস্থিতা ইতি। এতেষাং তিরোধানেন ভারতবর্ষং বিশেষতো নিখিলবঙ্গদেশশ্চ অস্তমিতভাস্করো ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন ইব মন্যতে।[৪২]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় স্মরণে পণ্ডিতগণের মন্তব্য:- তর্কাচার্য মহাশয়ের মৃত্যুতে পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ, হেমন্তকুমার তর্কতীর্থ, অনুজ কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বর্ধমান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ থেকে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত দীননাথ ত্রিপাঠী ও সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিবুধগণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। ১৯৭৩ সালের ৫৬তম *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকাটি* তর্কাচার্য মহাশয়কে সমর্পণ করা হয়।

কবিশেখর শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ রচিত *কাব্যকুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে তর্কাচার্য মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে শ্লোকাকারে কাব্যের মাধ্যমে শোকজ্ঞাপন করেছেন। মূল পদ্যের পূর্বে তিনি আরম্ভ করছেন এই বলে –

'অশেষগুণালংকৃত- দিগন্তবিশ্রান্তকীর্ত্তীনাং পুণ্যশ্লোক-মহামহোপাধ্যায়- ডক্টর-কালীপদ তর্কাচার্যমহোদয়ানাং মহাপ্রয়াণে শোকোচ্ছ্বাসঃ'-

শীর্ণাশেষ-বিয়োগদুঃখ-বিধুরা রোরুদ্যমানা ভৃশং
শ্যামাপাঙ্গ- সিতাশ্রুবিন্দু-নিচয়া ক্লিষ্টেক্ষিপদ্মচ্ছটা।
স্তব্ধীভূত-বিহঙ্গকণ্ঠ-কবিতা শোকাকুলা ভারতী
মৌনং শোচতি বঙ্গসাগরজলৈঃ স্রোতস্বিনী জাহ্নবী।।
ব্রাহ্মণ্যে চিরনিষ্ঠিতাত্মমহিমা নানাগুণালঙ্কৃত
আচার্য্যো বহুকীর্তিতঃ কুলপতে! বিদ্যার্থি-সংসেবিতঃ।
তর্কাচার্য-মহাকবিশ্চ মহিতঃ সম্মানিতঃ সাদরং
ধন্যস্ত্বং পরিপূতরম্যচরিতো দেদীপ্যসে গৌরবাত্।।
রম্যা যা দেবভাষা ললিতরসময়ী শ্রৌতশাস্ত্রাদিমূর্তা
কল্পে কল্পে প্রকামং জগতি বিতনুতে জ্ঞানধর্মপ্রচারম্।
তাং বাণীং ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রতচরণপরঃ সেবমানো বরেণ্যঃ
কীর্ত্তিং ভো লব্ধবাংস্ত্বং দিশি দিশি বিমলাং সুপ্রতিষ্ঠো নরেষু।।
লব্ধ্বা তাপসবংশজন্মবিভবং প্রজ্ঞাতপোমণ্ডিতং
ধ্যায়ংস্তে হৃদয়াধিপং যদুপতিং ভক্তপ্রিয়ং ভক্তিমান্।
তত্ত্বজ্ঞো হরিপাদপঙ্কজমতিঃ প্রেম্ণা সদোল্লাসিতঃ
স্বর্গং গচ্ছসি দেব দুঃখবিধুরো ভদ্রং তব প্রার্থয়ে।।

অত্রৈব সংসদ্-ভবনে ত্বয়া ভোঃ!

সমর্পিতং মে শুভমানপত্রম্।

প্রাপ্তোঽসি হন্তাদ্য সুরেন্দ্রলোকং

ব্যথাতুরস্ত্বাং বিবুধং স্মরামি।।

কালীপদসুধাস্যন্দ-মকরন্দমধুব্রতঃ।

দীপ্যতাং পরমে ধাম্নি মহর্ষিঃ কাশ্যপঃ কবিঃ।।[৪৩]

কাঁথি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ন্যায়শাস্ত্রে ধুরন্ধর পণ্ডিতপ্রবর হেমন্ত কুমার তর্কতীর্থ মহাশয় ৩৬টি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে তর্কাচার্য মহাশয়ের স্মরণে *তর্কাচার্য্যানুধ্যানম্* রচনা করেছেন। শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত কবিতাটির মধ্য দিয়ে গুরুদেব তর্কাচার্যের প্রতি গভীর ভক্তি ব্যক্ত হয়েছে, শব্দচয়নে ও ভাবের বিস্তারে কবিতাটি অসাধারণ, কবিতাটি কয়েকটি শ্লোক দেওয়া হল-

যোঽসৌ কোটালিপাড়ে ফরিদপুরগতে ভূমিদেবান্ববায়ে

লব্ধাত্মা বাল্য এব প্রখরধিষণয়াঽপ্রীণয়দ্ ধীরধুর্য্যান্।

ঊহাপোহার্থবিত্ত্যাত্মধৃতিভিরপরৈশ্চাখিলৈর্ধীগুণৈঃ স্বৈঃ

পাঠাভ্যাসে নিযুক্তো গুরুগণমনসাং বিস্ময়াধ্যানহেতুঃ।।

আকৃত্যা সোমসৌম্যঃ স্ফুরদমলরুচিভ্রাজিতাস্যঃ সুহৃদ্ভয়ো

দত্তাপূর্ব্বপ্রিয়শ্রীঃ স্মিতসুভগবচোমোদমানাননেভ্যঃ।

অঙ্গৈর্লাবিণ্যলীলাঙ্কুরনিকরসমালিঙ্গিতৈঃ শ্রীঙ্গিতাঢ্যৈঃ

পিত্রোঃ প্রীতিং ব্যতানীচ্চপলমধুলিহাং কাকপক্ষৈঃ সপক্ষৈঃ।।

নানাশাস্ত্রেষু দাক্ষ্যাদুপরচিতমতের্জ্ঞানদীক্ষাগুরুণাং

বাগ্ভিঃ প্রাসঙ্গিকীভির্বিবৃতবহুমতাভিঃ সদা সুশ্রুতাভিঃ।

সাহিত্যে বুদ্ধিরগ্রা সহজরসবশাত্ কাপ্যভূত্ প্রোজ্জ্বলন্তী

নাট্যে দীব্যত্তিবর্গেঽস্ফুরদথ বিমলানর্গলাঽস্য প্রবৃত্তিঃ।।[৪৪]

তর্কাচার্য মহাশয়ের অন্তেবাসী ছাত্র রামধনশাস্ত্রী তাঁর 'আচার্য্যবর্য্য–মহাপ্রয়াণে পরিবেদনম্' অংশে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন-

মাতঃ কিং মলিনং তবাননমিদং সংদৃশ্যতে ভারতি,

পূর্ণং নেত্রযুগং কথঞ্চ সমভূদুষ্ণাশ্রুভিঃ সাম্প্রতম্।

কিং তে জাতমিহাতিবৈশসমুরস্তাড়ং কথং ক্রন্দসি

দুর্দৈবেন বিড়ম্বিতাহমিতি মাং স্বপ্নেঽবদন্মাতৃকা।।

গীর্বাণবাণীরসপানপুষ্টং

যস্যাস্যমাসীদ্ বিদুষামভীষ্টম্।

সোঽয়ং বিপশ্চিদ্-গগনাদ্ গতোঽস্তং

চন্দ্রশ্চিরাত্ সর্বজগত্তমোহা।।

তর্কাচার্য্যবরঃ সদর্থচতুরঃ সশ্রীকবিদ্যাধরঃ।

আসীদ্ যো মহিতঃ সমস্তবিদুষাং বিদ্যাবিধৌতান্তরঃ।

কালাকালবিচারণাপটুরসৌ কালঃ স্বয়ং নির্ঘৃণো

লোকান্মর্ত্তগতাদমুং সমনয়ল্লোকান্তরং স্বার্জিতম্।।[৪৫]

অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় যিনি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে *ভাষাপরিচ্ছেদ, সাহিত্যদর্পণ* ইত্যদি গ্রন্থের পাঠ নিয়েছিলেন। কাশ্যপকবির সাহচর্যে শিখেছিলেন নাট্যপ্রয়োগের নানান কৌশল, তিনি তর্কাচার্য স্মরণে *স্মৃতি-কুসুম-মালিকা* রচনা করে গুরুদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তার রচনাটি হল-

মহাবিদ্যালয়ে তস্মিন্নাট্যানুষ্ঠানে চ

তদা, তর্কাচার্য-পাদা আসন্নাট্যাচার্যাঃ।
সংস্কৃত-নাট্যেঽপি প্রাথমিকঃ পাঠো
ময়া লব্ধস্তর্কাচার্য-পাদানাং যত্নেন
কৃতিত্বং কিমপি যদি তত্র ময়ার্জিতম্,
তচ্চ সর্বং তেষামেব। সংস্কৃত-সাহিত্য-
পরিষদি তৈরেবাহং সমানীতঃ, যেয়-
মাসীত্তদাপরিচিতা সেয়মধুনা মে
জাতা জননী-স্বরূপা; সমালম্ব্য চ যাং
জীবনগতিরামূলং মে পরিবর্তিতা।
পরিষন্মাধ্যস্থনৈব বঞ্চিতঃ কদাপি
নাহং তর্কাচার্য-স্নেহ-সান্নিধ্যতঃ। ততো
লোকান্তরঞ্চ গতেষু সংস্কৃত-জননী-
বর-পুত্রেষু, জাতেয়ং সংস্কৃত-সাহিত্য-
পরিষত্ পিতৃ-বিহীনা। দুহিতেব প্রিয়া
তেষামিয়মাসীত্ পরিষত্।[৪৬]

পরিশেষে ১৯৮৯ সালে সারস্বত সমাজ কর্তৃক আয়োজিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ছাত্র শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ-ব্রহ্মচারি-নবতীর্থ-ন্যায়বেদান্তাচার্য মহাশয় *তর্কাচার্যপ্রশস্তিঃ* রচনা করে গুরুদেবের পাদপদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন-

নমামি শতবার্ষিক্যাং তর্কাচার্য্যগুরোঃ পদে।
স্মরাম্যদ্য তথা কীর্ত্তিং নানাকৃতিসমুত্থিতাম্।।
নতথা দৃশ্যতে লোকে কবিতাতর্কমেলনম্।
যথাস্মিন্ দৃষ্টমস্মাভিরুভয়ং পারমাগতম্।।

যথাস্মদগুরুপাদানাং সতীন্দ্রচন্দ্রবিদুষাম্।

পাণ্ডিত্যং তর্ককাব্যে চ দৃষ্টমস্মাভিস্তথৈবেষাং ন সংশয়ঃ।

উভয়োবন্তর্ধানে তু জগতি তর্ককাব্যয়োঃ।

ঘোরং তম ইবাতীর্ণং পথিকৃদ্-দৃশ্যতেনতু।।[৪৭]

এই অধ্যায়ের পরিশেষে একথা বলা যায় যে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় অসাধারণ শাস্ত্রবেত্তা ও সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পণ্ডিত, কারণ শাস্ত্রের সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস বিচরণ। উল্লেখ্য যে তর্কাচার্য মহাশয়ের বংশগৌরব। বংশের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলের পণ্ডিত। তাঁর পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য, পিতৃব্যের সন্তান সকলেই সংস্কৃতশাস্ত্রের ধুরন্ধর। বিশেষত বলা যায় প্রখ্যাত বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী তর্কাচার্য মহাশয়ের পূর্বপুরুষ। যাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবীব্যাপি বিদিত। ১৯৩৮ সালে পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* (মধুসূদনকৃত *গূঢ়ার্থদীপিকা* টীকা সমেত) অনুবাদ ও ব্যাখ্যানের পূর্বে ভূমিকা অংশে বলেছেন –

‘যে মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যা এতই অপার যে কিংবদন্তী হইয়া গিয়াছে –

‘মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী’।

স্বয়ং সরস্বতী মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যার পার কোথায় তাহা জানিতে পারেন। যাহার পাণ্ডিত্য, ন্যায়শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি এতই গভীর যে ঘটনাক্রমে –

নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদনবাক্-পতৌ।

চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্-গদাধরঃ।।[৪৮]

মধুসূদন সরস্বতী নবদ্বীপে যাইলে নবদ্বীপের তদানীন্তন প্রথিতযশা নৈয়ায়িক তর্কবাগীশ কম্পিত হইয়া উঠিতেন এবং গদাধর কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন’।

সুতরাং এ বিবরণ থেকেই মধুসূদন সরস্বতীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই মধুসূদন সরস্বতী প্রথম পুরুষ হলে, কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় হলেন অষ্টম পুরুষ। অতএব তাঁর প্রতিভা ছিল বংশগত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯৩৯ সালে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে প্রকাশিত তর্কাচার্য মহাশয়ের *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটকের অন্তিমে ‘কবিবংশপরিচয়’ অংশটি এখানে বিবৃত হল-

কোটালিপারে বুধবিপ্রসারে সত্কাশ্যপো জ্ঞানতপসমৃদ্ধঃ।
প্রমোদনাখ্যোঽজনি বিপ্রমুখ্য পুরন্দরাচার্য ইতি প্রসিদ্ধঃ।
সরস্বতী-শ্রীমধুসূদনাভিধ সমুদ্গতোঽদ্বৈতগুরুর্যদন্বয়ে।
কৃতক্রিয়ো জ্ঞানময়ো মহাযশাস্তমেষ ধন্য বিদধে স্বজন্মনা।
যত্কীর্ত্তিসীমা খলু পঞ্চমুণ্ডী-প্রতিষ্ঠিতাদ্যা ভুবি ভাতি বিদ্যা।
যা সর্বসৌভাগ্যকরী সমেষা সমর্চিতা তত্কুলসম্ভবানাম্।
কেচিদ্ বদন্তি মধুসূদনমস্য পুত্র কেচিত্ সহোদরমমুষ্য তমামনন্তি।
সংসারমোহমপহায় য এষ বাল্যে বারাণসীপুরমগাত্ পরতত্ত্বনিষ্ঠ।
অদ্বৈতসিদ্ধিমুখভূরিনিবন্ধরত্নৈরদ্বৈততত্ত্বমুপদিশ্য গুরু ক্রিয়াবান্ ।
কীর্ত্যা স্বয়া ধবলয়া স ভুবং সমগ্রামুদ্ভাস্য জীবতি গতোঽপি বিদেহমুক্তিম্।
শাস্ত্রজ্ঞানতপোনিধি সিতযশা শ্রীনাথচূড়ামণিঃ
র্জাতো ধীরপুরন্দরাত্ কুলপতিস্তেজস্বিনামগ্রণী।
লক্ষ্মীদাসপদাভিধোঽজনি বুধো ন্যায়ে কৃতী তত্সুতঃ।
শক্তিধ্যানপর সুতোঽজনি ততঃ শ্রীরামনারায়ণঃ।
দেবীরাম ইতি প্রভূতমহিমা জাতস্তনূজস্তত
কন্দর্পস্তনয়স্ততোঽজনি রমাকান্তস্তদীয়াত্মজ।

আয়ুর্বেদমহোদধেরূদধরত্ সোঽনর্ধরত্নোচ্চয়

তদ্‌বংশে জনিমাপ্তবান্ বুধমণিশ্চণ্ডীপ্রসাদো মহান্।

পুত্রাঃ পঞ্চ বভূবুরস্য মহতো ভব্যা স্বধর্মে রতা।

যেষামাদিভবো হরাদিরভবদ্ বিপ্রকুমারোত্তরঃ।

সংসারে স্থিতিমানপি প্রতিপদং সংসারচিন্তোজ্‌ঝিতো।

জীবন্মুক্তনিভ প্রভূততপসা দেবোঽথবা শঙ্করঃ।

তন্ত্রাদৌ নিপুণো দ্বিতীয়তনয়ঃ শ্রীদ্বারিকানাথকো।

দক্ষো বাচি তৃতীয়কো মহিমচন্দ্রাখ্য পুরাণে কৃতী।

সীতানাথপদাভিধঃ সুবিদিতঃ রমার্ত্তশ্চতুর্থোঽভবদ্।

গোপালঃ কিল পঞ্চমো বুধবরোঽকালে গতঃ পঞ্চতাম্।

তেষামাদ্যসুতস্য সংসৃতিকথামুক্তস্য মুক্তমর্থিন।

পুত্রোঽভূত্ কবিতার্কিকো মতিমতা মান্যঃ ক্রিয়াভাস্বরঃ।

বশ্যাত্মা হরিদাসনামবিবুধঃ সীতাখ্যশক্তীশ্বরো

যস্মাদাত্মবিমর্শনাদিরভবন্ন্যায়প্রবন্ধঃ পরঃ।

তস্মাদেষ জনিং জগাম বিদিত কালীপদত্যাখ্যয়া

ন্যায়ে ভারতরাজ সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়াধ্যাপকঃ।

যেনৈতন্নবরূপক মতিমতামন্তে পরীক্ষাকৃতে।

ন্যস্ত প্রাক্তনসিদ্ধবস্তুবিষয় নানানবীনক্রমম্।

ন্যায়ে বৈশেষিকে কাব্যে শাস্ত্রে ত্বান্যত্র নির্মিতা।

যেন টীকাদয়ো গ্রন্থা সন্তি সোঽত্রানুগৃহ্যতাম্।[৪৯]

উল্লেখপঞ্জি

১. তর্কাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মরণে রচিত পুস্তিকা, *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য* প্রবন্ধ, পৃ. ৮৫

২. *ভাষারত্নম্*, অনুবন্ধ অংশ, পৃ. ক

৩. *গীতাঞ্জলিঃ*, অনুবাদকের নিবেদন অংশ, পৃ. ১

৪. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*, কবিবংশাদিশংসনম্ অংশ, শ্লোক নং ৪৪

৫. *তদেব*, শ্লোক নং ১ - ৫

৬. তর্কাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মরণে রচিত পুস্তিকা, *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য* প্রবন্ধ, পৃ. ৮৪

৭. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*, কবিবংশাদিশংসনম্ অংশ, শ্লোক নং ৬

৮. *তদেব*, শ্লোক নং ৭ - ৮

৯. *অনুবাদ-নবোদয়ঃ*, উৎসর্গপত্রম্, শ্লোক নং ২

১০. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*, কবিবংশাদিশংসনম্ অংশ, শ্লোক নং ৯ - ১২

১১. তর্কাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মরণে রচিত পুস্তিকা, *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য* প্রবন্ধ, পৃ. ৮৫

১২. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*, কবিবংশাদিশংসনম্ অংশ, শ্লোক নং ১৩ - ২১

১৩. *শ্রীশ্রীচণ্ডী*, পিতৃতর্পণ অংশ, পৃ. ক

১৪. *বেণীসংহারম্*, তর্কাচার্যকৃত *কঙ্কতিকা* টীকার প্রারম্ভিক অংশ, পৃ. ১

১৫. *অনুবাদ-নবোদয়ঃ*, উৎসর্গপত্রম্ অংশ, শ্লোক নং ১

১৬. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*, কবিবংশাদিশংসনম্ অংশ, শ্লোক নং ৬২-৬৫

১৭. *তদেব*, শ্লোক নং ৫৭-৬১

১৮. *তদেব*, শ্লোক নং ২২-২৭

১৯. তর্কাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মরণে রচিত পুস্তিকা, *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য* প্রবন্ধ, পৃ. ৮৫

২০. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*, কবিবংশাদিশংসনম্ অংশ, শ্লোক নং ৫৪-৫৫

২১. *তদেব*, শ্লোক নং ২৮-৩৫

২২. *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটক, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৬

২৩. *আমি ও আমার মন*, অরিন্দম চক্রবর্তী, স্মরণ কথা, পৃ. ৯৬

২৪. *তর্কসংগ্রহ,* সম্পা. রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূমিকা অংশ, পৃ. ২

২৫. *মহর্ষি নগেন্দ্র স্মারক গ্রন্থ,* লেখকপরিচিতি, পৃ. ১৭৬

২৬. *শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ,* পৃ. ১০৩

২৭. *শ্রীশ্রীচণ্ডী,* ভূমিকা অংশ, পৃ. ২

২৮. *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটক, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৬

২৯. *তদেব,* অনুবন্ধ অংশ, পৃ. ড

৩০. *আধুনিক সংস্কৃত কাব্য: বাঙালি মনীষা শতবর্ষের আলোকে,* পৃ. ১১৭

৩১. *তদেব,* পৃ. ১২১

৩২. *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটক, ভূমিকাংশ, পৃ .৫

৩৩. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্,* কবিবংশাদিশংসনম্ অংশ, শ্লোক নং ৩৬-৪৩

৩৪. বাংলার প্রথম মহামহোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষ* পত্রিকা, ১ম খণ্ড, কার্তিক ১৩৫১, পৃ. ৩২২

৩৫. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্,* কবিবংশাদিশংসনম্ অংশ, শ্লোক নং ৪৩

৩৬. *তদেব,* শ্লোক নং ৪৫-৫২

৩৭. *তদেব,* প্রকৃতকাব্য বিষয়সংক্ষেপ, শ্লোক নং ৪-১৫

৩৮. *মুক্তিবাদবিচারঃ, মুক্তিলক্ষ্মী*টীকা, অন্তিম শ্লোক, পৃ. ৯৬

৩৯. *ভাষারত্নম্, রত্নলক্ষ্মী* টীকার প্রারম্ভিক শ্লোক নং ১

৪০. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্,* প্রকৃতকাব্য বিষয়সংক্ষেপ, শ্লোক নং ১৬-১৮

৪১. তর্কাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মরণে রচিত পুস্তিকা, *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য* প্রবন্ধ, পৃ. ৮৬

৪২. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খণ্ড. ৫৫, পৃ. ৪

৪৩. *কাব্য-কুসুমাঞ্জলি,* বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ, পৃ. ৯৩

৪৪. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খণ্ড. ৫৫, *তর্কাচার্য্যানুধ্যানম্,* শ্লোক নং ১-৩

৪৫. *তদেব,* খণ্ড. ৫৫, পৃ. ১৪৫, শ্লোক নং ১-৩

৪৬. *তদেব,* খণ্ড. ৫৫, পৃ. ১৭৪

৪৭. *তদেব,* খণ্ড. ৫৫, পৃ. ১০

৪৮. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, অনুবাদক ভূতনাথ সপ্ততীর্থ, নিবেদন অংশ, পৃ. ৮

৪৯. *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটক, পৃষ্ঠা. ১৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনালোকে আচার্য প্রতিভা

ন্যায়শাস্ত্রের প্রশংসা :

ভারতীয় দর্শনের আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে *ন্যায়দর্শন* অন্যতম। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য *অর্থশাস্ত্রের* বিনয়াধিকারিকম্ নামক প্রথম অধিকরণে বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণে আন্বীক্ষিকী স্থাপনা নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই চারটি শাস্ত্রকে বিদ্যা বলে স্বীকার করেছেন। *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে –

'ধর্মাধর্মৌ ত্রয্যাম্। অর্থানর্থৌ বার্তায়াম্। নয়াপনয়ৌ দণ্ডনীত্যাম্। বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণা লোকস্যোপকরোতি, ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্য-ক্রিয়া-বৈশারদ্যং চ করোতি।

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।।[১]

সুতরাং ত্রয়ীতে ধর্ম ও অধর্ম প্রধানত প্রতিপাদিত হয়েছে। বার্তাতে অর্থ ও অনর্থ, দণ্ডনীতিতে নয় ও অপনয় প্রতিপাদিত হয়েছে। ত্রয়ী প্রভৃতি তিনটি বিদ্যার বল ও অবল হেতুদ্বারা নির্ধারণ করে বলে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা লোকের উপকার করে থাকে এবং এটি ব্যসন ও অভ্যুদয়ের উৎপত্তিতে মানুষের বুদ্ধিকে অবিচলিত রাখে। এই বিদ্যা মানুষের প্রজ্ঞা, বাক্যপ্রয়োগ ও কর্মবিষয়ে পটুতা উৎপাদন করেন।

আরও বলা হয়েছে এই বিদ্যা অপর সকল বিদ্যার প্রদীপ-স্বরূপ, সর্বকর্মের উপায় বা সাধন এবং সকল ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ বলে বিবেচিত হয়। বলা যেতে পারে ন্যায়শাস্ত্র সকল শাস্ত্রের প্রবেশদ্বারস্বরূপ।

ঊনবিংশ শতকে বাংলায় যে শুধুমাত্র নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল তা নয়, সেই সাথে আবির্ভাব ঘটেছিল অসাধারণ মেধাবী, প্রতিভাবান, জ্ঞানতপস্বী কিছু বাঙালি পণ্ডিতদের। পরবর্তিকালে তাঁদের বহুমুখী কর্মশক্তি সমৃদ্ধ করেছিল সমাজ, সাহিত্য ও দর্শনচর্চাকে। আর বলতে গেলে বাঙালির দর্শন চর্চার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। ভারতীয় দর্শনের বিশেষত ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বাঙালির এই কৃতিত্ব সারা পৃথিবীব্যাপী আজ সুবিদিত। সেই জয়ের ইতিহাস একদা উঠে এসেছিল কবির কাব্যে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের *আমরা* কবিতায় বাঙালির দর্শনচর্চার সেই গৌরবের কথাই শোনা যায় –

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ সাতন করি,

বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।[২]

কবির এই মন্তব্য কল্পনার আদিনাথ রঘুনাথ শিরোমণি সম্বন্ধে। ন্যায়চর্চায় বাঙালির যে গৌরবময় ইতিহাস আছে তা সর্বজনবিদিত। পরবর্তিকালে মিথিলা থেকে নবদ্বীপ ন্যায়চর্চার লীলাভূমিতে পরিণত হয়। বাঙালির ন্যায়শাস্ত্রচর্চায় স্বতন্ত্রতা ছিল, তাই তো রঘুনাথ শিরোমণি সদর্ভে বলেছেন স্বকৃত *তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি* গ্রন্থের উপসংহারে-

বিদুষাং নিবহৈরিহৈকমত্যাদ্ যদদুষ্টং নিরটঙ্কি যচ্চ দুষ্টম্।

ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব।।[৩]

-'আমার পূর্ববর্তী পণ্ডিতমণ্ডলী ঐক্যমত্য সহকারে যে সকল মতবাদকে নির্দোষ সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন, সেই সমস্ত সিদ্ধান্তকে দুষ্ট বা অপসিদ্ধান্ত বলে মনে করি। আর ঐ সমস্ত

খণ্ডিত মতবাদকে বিপরীত বলে মনে করি।' সুতরাং এ উক্তি থেকে সহজেই অনুমেয় বাঙালির ন্যায়চর্চায় গৌরবময় জয়যাত্রা সম্বন্ধে। নবদ্বীপগৌরব জগত্ বিখ্যাত বরেণ্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি যথার্থই বলেছেন-

তর্কেষু কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে
কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেষু যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেষু সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে।।[৪]

অর্থাত্ নৈয়ায়িকই তর্কশাস্ত্রে কর্কশবুদ্ধি হয় –অন্যে নয়, নৈয়ায়িকই কাব্যে কোমলমতি হয় – অন্যে নয়, নৈয়ায়িকই তন্ত্রে যন্ত্রিতমতি হয় –অন্যে নয়, শ্রীকৃষ্ণে সংযত বুদ্ধি, নৈয়ায়িকই হয় অন্যে নয়।

ন্যায়শাস্ত্রের অপরিহার্যতার কথা বলতে গিয়ে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেছেন- 'ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞান যার নাই, তিনি বৈয়াকরণ হতে পারেন না, বৈদান্তিক হতে পারেন না, সাংখ্যশাস্ত্রের গভীরার্থ বুঝতে তিনি অসমর্থ, অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর প্রবেশাধিকার নাই, মীমাংসা-শাস্ত্রের সূক্ষ্মবিচারে তিনি একান্ত কুণ্ঠিত, সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁর সম্যক্ ব্যুৎপত্তিলাভের সম্ভবনা নাই। এককথায় বলতে হয় – যিনি নৈয়ায়িক নন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ়ভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে না। এই কারণে ন্যায়শাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় প্রকৃত ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য যে একান্ত আবশ্যক, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে'।[৫]

সুতরাং এই গৌরবের ধারা বজায় থেকেছে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকেও সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য

মহাশয়ের সারস্বত সাধনার মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন চর্চায় যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তা আলোকপাত করা হয়েছে। কাব্যিক, দার্শনিক, অনুবাদনৈপুণ্যতা, গ্রন্থ ও পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও অধ্যাপনা জীবনে তিনি খ্যাতির বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সকল গুণের জন্য তিনি 'স্বভাবকবি' বা 'কাশ্যপমহাকবি' নামে সুবিদিত হয়ে আছেন পণ্ডিতসমাজে।

তর্কাচার্য মহাশয়ের ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন কৃতি

১. মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের তর্কাচার্যকৃত *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা সহ সম্পাদনা।

২. প্রশস্তপাদভাষ্যের আশ্রয়ে জগদীশ তর্কালংকার রচিত *সূক্তি* টীকা অবলম্বনে *সূক্তিদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা।

৩. কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *ভাষারত্ন* গ্রন্থের স্বকৃত *রত্নলক্ষ্মী* টীকা সহ সম্পাদনা।

৪. গদাধর ভট্টাচার্য রচিত *মুক্তিবাদ* গ্রন্থের স্বকৃত *মুক্তিদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা।

৫. হরিরাম তর্কবাগীশ প্রণীত *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থোপরি স্বকৃত *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা সহ সম্পাদনা।

৬. ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ* গ্রন্থ সম্পাদনা।

৭. *ন্যায়দর্শনবিন্দু* (*প্রবচনত্রয়ী*) – বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনাসত্রে তর্কাচার্য মহাশয় কর্তৃক ন্যায়দর্শন বিষয়ক তিনটি প্রবচন।

৮. জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য বিরচিত *শব্দার্থসারমঞ্জরী* গ্রন্থ ও স্বকৃত *সারদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা।

৯. *অক্ষপাদদর্শন*।

১০. *জাতিবাধকবিচার*।

১১. *ন্যায়পরিভাষা*।

এছাড়াও *সাংখ্যদর্শনের* উপর আচার্য মহাশয় টীকাসহ দুটি গ্রন্থ অনুবাদ করে সম্পাদনা করেন, গ্রন্থগুলি হল-

১২. বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত *সাংখ্যসার* গ্রন্থোপরি *সারপ্রভা* টীকাসহিত সম্পাদনা।

১৩. *গৌড়পাদভাষ্য* ও *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* টীকাদ্বয়সহ স্বকীয় *ভাষ্যপ্রভা* পাদটীকাসহ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থ সম্পাদনা।

১. মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের স্বকৃত বঙ্গভাষায় *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা সহ সম্পাদনা :-

১.১ গ্রন্থকারের পরিচয় ও রচনাকাল :-

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৮৩৬ সালে হাওড়া জেলার নারাট নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নারাট গ্রামের এই ভট্টাচার্য পরিবার সংস্কৃত চর্চায় পূর্ব থেকেই বিশেষ অবদান রেখেছেন। পিতা ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত এবং তাঁর দুজন পিতৃব্য হলেন গুরুপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ও ঠাকুরদাস চূড়ামণি। মহেশচন্দ্রের প্রথমে সংস্কৃত শিক্ষা প্রারম্ভ হয় নিজ গৃহেই তার বয়স যখন মাত্র ৯ বছর, তখন থেকেই তিনি

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধানের পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুরের রসিকগঞ্জ গ্রামে নিজ পিতৃব্য বৈয়াকরণ ঠাকুরদাস চূড়ামণির কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রহণ করেন, তার বয়স ১২। এই সময় থেকে মহেশচন্দ্র পণ্ডিতদের কাছে প্রিয় বিদ্যার্থীতে পরিণত হয়।

এরপর মহেশচন্দ্র ১৮৫২ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় চলে আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময় থেকে তিনি এই কলেজের পণ্ডিত প্রকাণ্ড অধ্যাপকগণের সান্নিধ্যে আসেন। এই কলেজের নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কাছে মহেশচন্দ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

পরবর্তিকালে ১৮৮৫ সালে তিনি কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। ১৮৮৫-১৮৯৫ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। *The Mahamahopadhyas Of India* গ্রন্থে বলা হয়েছে–

'He Succeeded Sarbadhikari as Principal of the college in 1872. For nine years his post as principal of the college was temporary. His post was made permanent in 1885. His tenure of service to the college as principal was for ten years(1885-1895)'[৬].

১.২ *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের প্রয়োজন ও *সুপ্রভা* ব্যাখ্যার নামকরণ :-

এই গ্রন্থটি রচনা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়শাস্ত্রে মূলত নব্যন্যায়শাস্ত্রে প্রথম প্রবেশ পাঠার্থীর জন্য। কারণ হল প্রাচীন ন্যায়ের ভাষার সাথে নব্যন্যায়ের ভাষার প্রভেদ রয়েছে। নব্য ন্যায়ের ভাষা হল তৈরী করা একটি কৃত্রিম ভাষা এবং এই ভাষায় পরবর্তিকালে বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু এই ভাষা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নির্দিষ্ট বিষয়কে অভিহিত করে। অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় এই বিষয়ে বলেছেন-

‘দুরূহ ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে– বিশেষত নব্যন্যায়ে প্রথম প্রবেশার্থিগণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে রচিত হইয়াছিল। নব্যন্যায়ের পরিভাষার সহিত পরিচয়ের অভাবে কোনও শাস্ত্রেরই পদার্থবিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা হওয়া সম্ভব হয় না। কেননা মহামনীষী গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আভির্ভাবের পরবর্তিযুগে যে কোন শাস্ত্রে গভীর আলোচনা নব্যন্যায়ের পরিভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি, বেদান্ত, মীমাংসা, বৈশেষিক প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রস্থানে নব্যন্যায়ের বিচারশৈলী ও পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলি আচার্যগণ যত্র তত্র সাবলীলভাবে প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন ও প্রতিপক্ষসিদ্ধান্ত প্রতিক্ষেপণ করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছেন।’[৭]

এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থের ‘মুখবন্ধ’ অংশে আবারও বলেছেন –

‘ন্যায়শাস্ত্র- জিজ্ঞাসুগণের দৃষ্টিতেই শুধু নহে, শাস্ত্রান্তরের বিষয় জানিতে হইলে নব্যন্যায়ের পরিভাষা সম্বন্ধে সম্যগ্-জ্ঞান অপরিহার্য। এই গ্রন্থখানি দীর্ঘকাল যাবত্ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। তাই সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী ও গবেষকগণের উপকার হইতে পারে ভাবিয়া আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের উপর এই নিবন্ধটির বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা ও অপেক্ষিত টিপ্পণী প্রভৃতি যোজনার দ্বারা সম্পাদনের ভার অর্পণ করি’।[৮]

সুতরাং অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই উক্তি থেকে এই *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থ প্রকাশের কথা বলতে গিয়ে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন- বহুকাল পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ হলেও সেই গ্রন্থের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে যাওয়ায়, এমনকি গ্রন্থের পৃষ্ঠা হাত স্পর্শ করা মাত্র তা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এই গ্রন্থের আবার পুনরায় মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অধ্যক্ষ মহাশয়ের

অনুরোধে গ্রন্থ সম্পাদনা এবং বিদ্যার্থীদের সুবিধার জন্য *সুপ্রভা* নামক বঙ্গভাষায় একটি ব্যাখ্যা সহিত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত গ্রন্থের 'প্রাথমিক-ভারতী' অংশে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'গ্রন্থোঽয়ং বিদ্যার্থিগণানুজিঘৃক্ষয়া সুচিরাত্ পূর্বং গ্রন্থকৃতা ন্যায়রত্নেনৈব প্রথমং মুদ্রাপণমকারি। মুদ্রার্পিতস্য তস্য কতিচন খণ্ডাঃ কলিকাতাস্থ-রাষ্ট্রিয়-সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ে সমুপলভ্যন্তে। তেঽপি স্বল্পমাত্রা এব খণ্ডাঃ সুজীর্ণপ্রতিপত্রাঃ কথঞ্চিদেব রক্ষিতাস্তদ্-গ্রন্থগারাধিকৃতৈঃ পুরুষৈঃ। তেষাং সাম্প্রতমীদৃশী দশা সমজনি, যয়া নাতিচিরাদুত্তরমেব তেষাং বিলয়ঃ সম্ভাব্যতে। যদি তাবদদ্যাপি সুতরাং জীর্ণপর্ণানামশক্যাক্ষরপাঠানাং করতলস্পর্শমাত্রমপ্য-সহমানানাং তেষাং সাহায়কেন কেনাপি গ্রন্থস্যাস্য পুনঃ সংস্করণং কৃতং স্যাত্ তদৈবাস্য ন্যায়বিদ্যাপ্রবেশার্থিনামত্যুপকারকস্য গ্রন্থস্য সংরক্ষণেন সংস্কৃতবিদ্যা নিতরামুপকৃতা স্যাত্। তদেতদ্ সর্বং সাবধানং পরিচিন্ত্য সংস্কৃতবিদ্যায়ামতিপ্রসিদ্ধেন সুদীপ্তপ্রতিভানেন কোবিদকুল-পয়োধিসুধাকরেণ শ্রীমদ্-বিষ্ণুপদ-ভট্টাচার্যেণ কলিকাতারাষ্ট্রিয়-মহাবিদ্যালয়াধ্যক্ষ-পদমধিষ্ঠিতবতা গ্রন্থস্য তস্য পুনঃ সংস্করণে মনো ব্যধায়ি। বিদ্যার্থিনাং বোধসৌকর্যায় সমাদিষ্টাশ্চ বয়ং বঙ্গভাষয়া তদর্থবিবরণার্থম্। বয়মপি তদাদেশবশীকৃতা এব গ্রন্থস্যাস্য বঙ্গভাষয়ৈব যথামূলমনুবাদং মূলরহস্যাদিনিবেদনায় চ তয়ৈব ভাষয়া *সুপ্রভা* সমাখ্যাং কাঞ্চন ব্যাখ্যাং রচিতবন্তঃ। যদুভয়মস্মিন্ সংস্করণে সমেষা দৃষ্টিপথমুপেয়াত্'।[৯]

এই *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের নামকরণ বিষয়ে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন- 'সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ প্রাতঃস্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত (*Brief Notes on the Modern Nyāya system of Philosophy and Its Technical Terms.*) নিবন্ধটি ১৮৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুনরায় গ্রন্থটি ১৯৫৬

সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপঃ* এই নামে পরিচিত হয়। গ্রন্থকার মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের কোন সংস্কৃতভাষাময় নাম দিয়ে যান নি, নাম পরবর্তিকালের সংযোজন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইংরেজি প্রবন্ধের নামের সাথে সাযুজ্য রেখে এই নামকরণ করা হয়েছে বলে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন। এ ছাড়া আচার্য মহাশয়ের *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা গ্রন্থটিও *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* নামের সাথে সাদৃশ্য মেনে করা হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'যদ্যপি গ্রন্থকারেণ গ্রন্থস্যাস্য কিমপি সংস্কৃতভাষাময়ং নাম নোপদিষ্টং তথাপি তদুক্তস্য '*Brief Notes on the Modern Nyāya system of Philosophy and Its Technical Terms.*'- ইত্যাঙ্গলভাষাময়-বাক্য-বিশেষস্যানুসারেণ *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* ইত্যেব সংস্কৃতভাষাময়ং নাম বিহিতমস্মাভিঃ বিবৃতেরপি তদনুগতং নাম সুপ্রভেতি'।[১০]

১.৩ *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচি

নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি হল-

i. ধর্মপদার্থপ্রকরণ
ii. জাতি ও উপাধি প্রভেদ বিষয়ক প্রকরণ
iii. সম্বন্ধ ও তার ভেদাদি প্রকরণ
iv. পর্যাপ্তিসম্বন্ধবিষয়ক প্রকরণ
v. সাংসর্গিকপ্রতিযোগিতা ইত্যাদি প্রকরণ
vi. আধার ও আধেয়াদি প্রকরণ
vii. অভাবীয় প্রতিযোগিতা প্রকরণ
viii. অভাব বৈলক্ষ্যণের প্রতিযোগিতা প্রকরণ

ix. অভাব ও তার প্রতিযোগি এবং নিরূপ্য-নিরূপকভাবাদি প্রকরণ

x. অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাবাদি প্রকরণ

xi. অবচ্ছেদকতাদি ও তার ধর্মসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাদি প্রকরণ

xii. সবিকল্পক ও নির্বিকল্পকজ্ঞানাদি প্রকরণ

xiii. সিদ্ধসাধ্যবিশেষণ ও তার ভেদাদি প্রকরণ

xiv. সংশয় নিশ্চয় ভেদাদি প্রকরণ

১.৪ *সুপ্রভা* ব্যাখ্যার মৌলিক বিষয় :-

নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ গ্রন্থের উপর এই *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা গ্রন্থটি বঙ্গভাষায় রচিত সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের পূর্বে আর তেমন কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, যা কিনা *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের মূলকে আশ্রয় করে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় রচিত *সুপ্রভা* ব্যাখ্যার মৌলিকতা বা স্বকীয়তা হল তিনি এই টীকাটি মূলানুগ ব্যাখ্যা করলেও বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বাচার্যগণের মতকে সন্নিবেশ করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাংশে স্বয়ং বলেছেন– 'তত্র সুপ্রভাখ্যায়াং ব্যাখ্যায়াং মূলাধিকারেণাস্মাকং বিশেষতো বক্তব্যানি সর্বানি বস্তূনি সমুপন্যস্তানি। যথাসম্ভবং বিষয়বিশেষেষু তত্তদ্-বস্তুসাম্যবৈষম্যাদিনিবেদনায় পূর্বাচার্যমতান্যপি সংগৃহ্য সন্নিবেশিতানি'।

সুপ্রভা হল *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপে*র মূলকে অনুসরণ করে রচিত একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। *অর্থশাস্ত্রের* তন্ত্রযুক্তি প্রকরণে ব্যাখ্যানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'অতিশয়বর্ণনা ব্যাখ্যানম্'[১১]। অর্থাত্ সিদ্ধ বিষয়ের অতিশয় বর্ণনাকে ব্যাখ্যান বলে। এই *সুপ্রভা* নামক আলোচনায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সিদ্ধ বিষয়ের অতিশয় বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, তাই

এই গ্রন্থটিকে ব্যাখ্যাগ্রন্থ নামে অভিহিত করা অধিক যুক্তিযুক্ত। তর্কাচার্য মহাশয় এটিকে স্বয়ং ব্যাখ্যা গ্রন্থ বলে দাবী করেছেন-

'যথাযথমূলানুবাদং মূলরহস্যাদিনিবেদনায় চ তয়ৈব ভাষয়া সুপ্রভা সমাখ্যাঃ কাঞ্চন ব্যাখ্যাং রচিতবন্তঃ'।[১২]

নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ গ্রন্থটি নব্যন্যায়ের পরিভাষা গ্রন্থ হলেও *সুপ্রভা* ব্যাখ্যাগ্রন্থে প্রয়োজনবোধে মূল গ্রন্থকারের মত প্রতিপাদন করার বিচারের রীতি দেখা যায়। রঘুনাথ শিরোমণির *দীধিতি,* গদাধর ভট্টাচার্যের *গাদাধরী,* জগদীশ তর্কালংকারের *জাগদীশী* টীকাগ্রন্থ অন্যতম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উপাধির প্রকারভেদে সখণ্ডোপাধি ও অখণ্ডোপাধির বিভাগের কথা বলতে গিয়ে *তত্ত্বচিন্তামণির* সামান্যলক্ষণার *দীধিতির* ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালংকারের মতের উত্থাপন করা হয়েছে- 'সখণ্ডং স্বরূপতো জ্ঞানপ্রকারীভূতভিন্নম্, অখণ্ডং স্বরূপতঃ প্রকারীভূতম্'।[১৩]

সমবায়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথের *কারিকাবলী* ও *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* থেকে আলোচনা প্রতিপাদিত হয়েছে-

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণ-কর্মণোঃ।

তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।[১৪]

সুপ্রভা ব্যাখ্যাগ্রন্থে অনেক স্থানে ব্যাকরণসম্মত আলোচনা বহুত্র দৃষ্ট হয়, যেমন প্রথমে ধর্ম পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন- 'ধৃঙ্ অবস্থানে' এইরূপে তুদাদিধাতুগণোক্ত 'ধৃ' ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যে ধর্ম পদ নিষ্পন্ন ইহাই 'ধ্রিয়তে তিষ্ঠতি' এই দুইটি পদের উপাদানে সূচিত হয়'। আবার 'দণ্ডী পুরুষঃ' এই বিশেষণ-বিশেষ্যের সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে 'অন্তরাঽন্তরেণ যুক্তে' সূত্রের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করেছেন।

নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ গ্রন্থের মূল অংশের সাথে পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থের মূল পাঠের সাদৃশ্য অনেকস্থলে তর্কাচার্য মহাশয় তাঁর *সুপ্রভা* ব্যাখ্যায় প্রতিপাদন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সংশয় ও নিশ্চয়ভেদে জ্ঞানের বিভাগটি *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থের জ্ঞানের বিভাগের সাথে অনুরূপ তা দেখা যায়। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'*ভাষাপরিচ্ছেদ*-কারিকায় বিশ্বনাথ নিশ্চয় ও সংশয় এই দ্বিবিধ জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা যেরূপ করিয়াছেন, মূলকারের বর্ণনা তদনুসারী'।[১৫]

১.৫ তর্কাচার্য মহাশয়কৃত নব্যন্যায়ের পারিভাষিক শব্দাবলী :- আচার্য মহাশয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পারিভাষিক শব্দাবলী ছাড়াও বিদ্যার্থিগণের সহজবোধ্যতার জন্য পরিশিষ্ট নামকরণ করে বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করেছেন, সেখানে মূল সংস্কৃত পাঠ ও অনুবাদ তিনি নিজেই করেছেন। এই সংযোজন আচার্য মহাশয়ের মৌলিক কৃতি। এখানে তিনি যে বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন সেগুলি হল- লক্ষণ ও তার বিভিন্ন দোষ (যেমন অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভবদোষ), লক্ষণের প্রয়োজন, হেত্বাভাস, পঞ্চবিধ হেতুর দোষ আলোচনা, হেতুপদার্থের আলোচনা, কারণ ও তার প্রকারভেদ (নব্যন্যায়ের ভাষায় সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ), যেমন তর্কাচার্য মহাশয় অসমবায়ী কারণের লক্ষণ করেছেন-

'সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কার্যতা-নিরূপিতং সমবায়-স্বসমবায়ি-সমবেত-ত্বান্যতর-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নম্ আত্ম-বিশেষগুণাবৃত্তি, কারণত্বম্ অসমবায়িকারণত্বম্'।[১৬]

১.৬ *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ :-

নিবন্ধটি ১৮৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় *Brief Notes on the Modern Nyāya system of Philosophy and Its Technical Terms.* এই নামে, তখন *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* এই নামে গ্রন্থটিকে অভিহিত করা হত না, তা নিবন্ধের পূর্বে বলা হয়েছে। মূল গ্রন্থটি কলকাতার হেয়ার প্রেস থেকে ১৮৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় ৩০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রথমদিকে ইংরেজি ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তিনি বলেছেন ১৮৭৫ সালে ভীমাচার্য ঝালকীকার মহাশয়ের *ন্যায়কোষ* গ্রন্থটি নব্যন্যায়ের অতুলনীয় গ্রন্থ হলেও গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নয় বলে এই গ্রন্থের অবতারণা।

‘A Book called the *Nyāyakoṣa* was brought out in Bombay by Bhīmācārya Jhālakikār in 1875, and this book is a Dictionary of the Technical terms used in Nyāya. The explanations it gives are, however , Not full enough, and the work itself has not yet come to be generally known.’[১৭]

পুনরায় গ্রন্থটি ১৯৫৬ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হয় *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপঃ* এই নামে পরিচিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা সমেত। পরবর্তিকালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে অধ্যাপিকা উজ্জলা ঝা মহাশয়া এই *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন ২০০৪ সালে, ২০১০ সালে এই গ্রন্থের একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এরপর অধ্যাপিকা ঝা মহাশয়া পুনের শ্রুতভবন সংশোধন কেন্দ্র থেকে ২০১৮ সালে এই গ্রন্থের আবার একটি হিন্দি অনুবাদ করেন প্রয়োজনীয় টিপ্পণী সমেত।

তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বর্তমানে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ (সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়), এশিয়াটিক সোসাইটি ও জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

২. *প্রশস্তপাদভাষ্যের* আশ্রয়ে জগদীশ তর্কালংকার রচিত *সূক্তি* টীকা অবলম্বনে *সূক্তিদীপিকা* টীকা গ্রন্থ সম্পাদনা :-

২.১ মূল টীকাকারের পরিচয় :-

ভারতীয় দর্শনের ছয়টি আস্তিক শাখার মধ্যে বৈশেষিক দর্শন হল অন্যতম। এই বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থ হল কণাদের *বৈশেষিকসূত্র*, এই বৈশেষিক দর্শনের উপর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ হল *পদার্থধর্মসংগ্রহ* বা *প্রশস্তপাদভাষ্য*। আচার্য জগদীশ তর্কালংকার এই *প্রশস্তপাদভাষ্যের* উপর *সূক্তি* টীকা রচনা করেন। তিনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী ভারতবিখ্যাত নৈয়ায়িক ও রামভদ্র সার্বভৌম মহাশয়ের ছাত্র। তার সময়কাল প্রসঙ্গে ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন 'জগদীশের সময়কাল ১৫৪০-৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে করায় যুক্তিযুক্ত। জগদীশ তর্কালংকারের কুলপরিচয় ও বংশধারা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'নবদ্বীপে জগদীশের বংশধরদের নিকট জানা যায়- এই বংশ কাশ্যপগোত্র, যর্জুবেদী, পাশ্চাত্ত্য বৈদিক এবং ইহাদের ক্রিয়াকলাপ মৈথিলমতে সম্পাদিত হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রের প্রপৌত্রই জগদীশ।....... বটেশ্বর মিশ্রের পুত্র সনাতন, তৎপুত্র মাধবমিশ্র, তৎপুত্র যাদব বিদ্যাবাগীশ (নৈয়ায়িক)। তাহার পাঁচ পুত্র রামচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগদীশ তর্কালংকার, ষষ্ঠীদাস ন্যায়বাগীশ, লক্ষ্মণ ও বাণীনাথ'।[১৮]

২.২ *সূক্তিদীপিকা* উপটীকা গ্রন্থের প্রকাশকাল ও প্রকাশস্থান :-

পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই জগদীশ তর্কালংকারকৃত *সূক্তি* টীকার আশ্রয়ে *সূক্তিদীপিকা* টীকা রচনা করেন। ১৯২৫ সালে কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে তর্কাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় স্বকৃত টীকা ও বঙ্গভাষায় ভাষ্যতাৎপর্য সমেত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পুঁথি থেকে এই গ্রন্থ সম্পাদনা করা হয়, তবে এর পূর্বে চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ থেকে এই *দ্রব্যসূক্তি* গ্রন্থটি প্রকাশিত হলেও তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ তাই পরিষদের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং *সূক্তি* টীকার সর্বপ্রথম নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তর্কাচার্য গ্রন্থের ভূমিকা অংশের পরিশেষে 'সম্পাদকীয়বিশেষনিবেদনম্' অংশে বলেছেন-

'সূক্তিরিয়মদ্য যাবত্ ন কেনাপি সাকল্যেন প্রকাশিতা, চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালায়াং অস্যা অংশতঃ প্রকাশনে কৃতেঽপি তদংশস্য বহুলপ্রমাদপর্যালোচনয়া সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদা সেয়ং প্রকাশ্যতে'।[১৯]

তবে এই গ্রন্থের যথার্থ পাঠনির্ণয়ের জন্য বারাণসী থেকে মুদ্রিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ ত্রিবেদী মহাশয় সম্পাদিত *ন্যায়কন্দলী* সহিত *প্রশস্তপাদভাষ্য* গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে বলে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থের প্রথমে *প্রশস্তপাদভাষ্য,* তারপর সেই ভাষ্য যে *কণাদসূত্র*কে অবলম্বন করে হয়েছে সেই সূত্রগুলি, অনন্তর জগদীশসূক্তি, অনন্তর তর্কাচার্য স্বকৃত *সূক্তিদীপিকা* এবং সংস্কৃতে *সূক্তিবিবৃতি,* অনন্তর বঙ্গভাষায় ভাষ্যতাৎপর্য অংশ, তারপর পাদটীকায় নানান পাঠান্তর সন্নিবেশিত হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'অহঞ্চ তত্র নিযুক্তঃ সম্পাদকরূপেণ যথামতি আদর্শদ্বয়ো সূক্তেঃ প্রবিচার্য্য বারাণসীমুদ্রিতবৈশেষিকদর্শনাদিসাহায়কেন পাঠভেদাদিকং বিনির্দিশ্য প্রথমতঃ

প্রশস্তপাদভাষ্যং প্রকরণভেদেন সন্নিবেশ্য ততস্তদবলম্বনসূত্রাণি ততো জগদীশসূক্তিং তদনন্তরং স্বকৃতাং সূক্তিদীপিকানাম্নীং সংস্কৃতময়ীং সূক্তিবিবৃতিং ততোঽপি বঙ্গভাষাময়ং ভাষ্যতাৎপর্যং বিন্যস্য পুনঃ পাদটীকায়াং বিবিধপাঠান্তরাদিকঞ্চোপনিবধ্য প্রারব্ধমস্যাঃ সম্পাদনম্'।[২০]

পূর্বেই বলা হয়েছে এই *সূক্তি*টীকা গ্রন্থটি পুঁথি থেকে সম্পাদনা করা হয়েছে। এখানে দুটি পুঁথির সাহায্য নিয়ে গ্রন্থ সম্পাদনা করা হয়েছে। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের এই পুঁথিদুটি একটি সম্পূর্ণ ও অন্যটি খণ্ডিত। এই গ্রন্থের পাদটীকায় সম্পূর্ণ পুঁথির পাঠে (ক) এবং খণ্ডিত পাঠে (ঙ) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া জগদীশসূক্তির পাঠনির্ণয়ে চৌখাম্বাকৃত যে সংস্করণ পাওয়া যায় তা (খ) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা অংশে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন-

'Now, the *Sūkti*, with the editors Original Sanskrit Commentary and Bengali elucidation on it, is edited in the following pages from two, manuscripts-one complete and another fragmentary indicated respectively by ক and ঙ both belonging to the Sanskrit Sāhitya Parishat. The text book of Sūkti so far as it has been published in the Chowkhamba Series, though highly defective, has also been consulted, It has been indicated by খ. For the text book of *Praśastapādabhāṣya* both the Benaras editions of it one with *kiraṇ*ā*val*ī and the other with *Nyāya-kandalī* have been compared and indicated respectively by গ and ঘ.[২১]

২.৩ তর্কাচার্যকৃত গ্রন্থের ভূমিকা অংশের জ্ঞাতব্য বিষয় :-

তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থের বিশেষত্ব হল মূল গ্রন্থ আরম্ভ হবার পূর্বে দীর্ঘ ভূমিকা (প্রায় ২৫ পৃষ্ঠা) অংশের আলোচনা। এই ভূমিকাতে বৈশেষিক দর্শনের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেখানে নানান বিশেষ বিষয় উঠে এসেছে। তর্কাচার্য মহাশয়ের উত্থাপিত বিষয়গুলি হল – 'বৈশেষিকদর্শনস্য সপ্তপদার্থপরত্বম্', 'বৈশেষিক-দর্শনসংজ্ঞাভেদাঃ', 'বৈশেষিক-দর্শনমিতি সংজ্ঞাবীজম্', বৈশেষিক-দর্শনাধ্যাদিকথা, 'বৈশেষিক-দর্শন-ব্যাখ্যানকথা', 'প্রশস্তপাদভাষ্যস্য বিশেষতঃ প্রামাণ্যম্', 'প্রস্তুতভাষ্যস্য প্রশস্তপাদ-ভাষ্যত্বযুক্তিঃ', 'প্রশস্তপাদস্য নামবিচারঃ', 'প্রশস্তপাদস্য কালঃ', 'প্রশস্তপাদ-গ্রন্থস্য ভাষ্যত্ববিচারঃ', 'জগদীশ-তর্কালংকারকৃতিঃ', 'জগদীশ-তর্কালংকারস্য কাব্যপ্রকাশ-টীকাকারত্ব-খণ্ডনম্', 'দ্রব্যভাষ্যসূক্তৌ জগদীশ-কৃতত্বস্থাপনম্', 'তস্যাঃ পদার্থতত্ত্বনির্ণয়-সংজ্ঞাবিচারঃ', 'দ্রব্যভাষ্যটীকায়া নামভেদাঃ', 'কিরণাবল্যাদিকমাদর্শোকৃত্য জগদীশস্য সূক্তিনির্মাণসম্ভাবনম্', 'জগদীশ-তর্কালংকারপরিচয়ঃ', 'জগদীশনিবন্ধেষু ভাষ্যসূক্তেঃ প্রাথম্যবিচার', 'সম্পাদকীয়বিশেষনিবেদনম্'।[২২]

ভূমিকা অংশের উপরিউক্ত আলোচনা গ্রন্থ পর্যালোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের মৌলিক চিন্তাভাবনা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হয়েছে। বৈশেষিকদর্শন সম্বন্ধে বহু সিদ্ধান্ত তিনি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ নিয়ে যুক্তি স্থাপন করে সুদৃঢ় করেছেন তা তর্কাচার্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত আলোচনা করলেই বোধগম্য হয়। আচার্য মহাশয়ের উত্থাপিত সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

বৈশেষিকদর্শনসংজ্ঞাভেদাঃ এই অংশে বৈশেষিকদর্শনের নামভেদের কথা বলা হয়েছে, এই গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থে ভিন্ন নামে আখ্যাত করা হয়েছে। যেমন *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে

একে *ঔলুক্যদর্শন* বলা হয়েছে- '*সর্বদর্শনসংগ্রহে* ঔলুক্যদর্শনতয়া মাধবাচার্যেন কৃতঃ পরিগ্রহঃ'। আবার কোন কোন গ্রন্থে *কাণাদদর্শন* ও *বৈশেষিকদর্শন* গ্রন্থ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'তদিদং বৈশেষিকদর্শনং ঔলূক্যদর্শনমিতি কাণাদদর্শনমিতি বৈশেষিকদর্শনমিতি চ বহুবিধাঃ সংজ্ঞা বোধকতয়া অঙ্গীকরোতি। তত্রাস্য সংজ্ঞাভেদবীজমিদমেব বিশ্রুয়তে যথা ঔলূক্যঃ উলুকর্ষিগোত্রসম্ভূতঃ তত্কৃতং দর্শনম্ ঔলূক্যদর্শনমিতি'।[২৩]

'বৈশেষিকদর্শনমিতিসংজ্ঞাবীজম্', এখানে *বৈশেষিকদর্শন* নামকরণের হেতু প্রতিপাদিত হয়েছে। তিনি বলেছেন বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে বৈশেষিক নামের উৎপত্তি হয়েছে, এ বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকটি যুক্তি ক্রমান্বয়ে প্রতিপাদন করেছেন-

'তত্র প্রথমং তাবদ্ বিশেষেণ অন্ত্যলক্ষণেন সংসৃষ্টং দর্শনং বৈশেষিকদর্শনম্, দ্বিতীয়ং তাবত্ একদেশিনাং মতে অত্যন্তবিশেষগুণোচ্ছেদ এব মোক্ষঃ, ন তু দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদঃ, অত এব মুক্তেঃ সর্বদর্শনপ্রতিপাদ্যতয়া তত্রৈব বিশেষগুণমাদায় দর্শনান্তরবৈলক্ষণস্য উপপাদিতত্বাত্ বিশেষ এব বৈশেষিক ইতি। তৃতীয়ং তাবত্ বিগতঃ শেষঃ যস্য তত্ বিশেষং নিরবশেষং তদেব বৈশেষিকম্। চতুর্থং তাবত্ বিশেষণং বিশেষঃ পদার্থানাং লক্ষণপরীক্ষাদিভিঃ প্রতিপাদনম্, স এব বৈশেষিকম্। পঞ্চমং তাবত্ বিশেষো ভেদঃ বিশেষো বিশেষগুণশ্চ তাভ্যাং সংসৃষ্টং দর্শনং বৈশেষিকম্'।[২৪]

বৈশেষিকদর্শনাধ্যাদিকথা, ও 'বৈশেষিকদর্শনব্যাখ্যানকথা' এই দুটি আলোচনায় বৈশেষিকদর্শনের অধ্যায়সংখ্যা ও এই দর্শনের ব্যাখ্যা, টীকা টিপ্পণী গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে। সেখানে শংকর মিশ্রের *উপস্কারটীকা,* চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার রচিত

বৈশেষিকসূত্রভাষ্য, রাবণপ্রণীত ভাষ্য, *কণাদরহস্য,* বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতী* প্রভৃতি গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে।

'সম্পাদকীয়বিশেষনিবেদনম্' - উক্ত নামে গ্রন্থ সম্পাদনার বিষয় পদ্ধতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্থান পেয়েছে। সেখানে নিজ পিতা হরিদাস তর্কতীর্থ, বিদগ্ধ নৈয়ায়িক কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং অন্তেবাসী ছাত্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী নামের উল্লেখ করেছেন-

'পদার্থতত্ত্ববিজ্ঞানবিশেষে চ পরমনুগৃহীতোঽস্মি তার্কিককুলমুকুটালঙ্কারহীরৈঃ তত্রভবড্ভিঃ মহামহোপাধ্যায়-কামাখ্যানাথ-তর্কাবাগীশপাদৈঃ পরমপূজ্যপাদ-তার্কিকপ্রবরৈঃ স্বীয়পিতৃদেবৈশ্চ শ্রীহরিদাস-তর্কতীর্থ-মহাভাগৈঃ'। এতদ্-ভূমিকা-গতবস্তু-সংগ্রহণেন চ নিতরামমুপকৃতোঽস্মি পরম-স্নেহাস্পদেন মদীয়ান্তেবাসিনা এম-এ-কাব্যতীর্থোপাধিকেন শ্রীমতা চিন্তাহরণচক্রবর্ত্তিনা'।[২৫]

২.৪ জগদীশকৃত *সূক্তিটীকা* গ্রন্থের অন্যান্য সংস্করণ :-

১৯২৪ সালে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই *সূক্তিটীকা* গ্রন্থটি সর্বপ্রথম পুঁথি থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন (যদিও আচার্য মহাশয়ের পূর্বে চৌখাম্বা থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তবে তা অশুদ্ধ সংস্করণ বলে আচার্য মহাশয়ের নির্দেশ)। এরপর ১৯৮৩ সালে চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন থেকে জগদীশ তর্কালংকারের *সূক্তি,* পদ্মনাভ মিশ্রের *সেতু* ও বল্লভাচার্যের *ব্যোমবতী* এই তিনটি টীকাসহ *প্রশস্তপাদভাষ্য* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ও পণ্ডিত দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী।

তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বর্তমানে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ (সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়), এশিয়াটিক সোসাইটি ও জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

৩. কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের স্বকৃত *রত্নলক্ষ্মী* টীকা সহ সম্পাদনা:-

৩.১ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় :-

কণাদ তর্কবাগীশের রচিত গ্রন্থ *ভাষারত্নম্*। এটি বৈশেষিক দর্শনের পদার্থতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। তর্কবাগীশ মহাশয় নবদ্বীপ নিবাসী নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর সময়কাল ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি জানকীনাথ চূড়ামণি ও বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন'। আর পিতার নাম কমুদানন্দ মুকুন্দ বা মকরন্দ। তাঁর জন্মস্থান হল খানাকুল। রচিত গ্রন্থ *ভাষারত্ন*, *তর্কবাদার্থমঞ্জরী* ও *তত্ত্ব চিন্তামণির* টীকা।[২৬]

নবদ্বীপ থেকে মিথিলায় ন্যায় অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম। তিনিই মিথিলা থেকে নবদ্বীপে ন্যায়ের শিক্ষা আরম্ভ করেন। তার দুই ছাত্রের নাম শোনা যায়, একজন হলেন রঘুনাথ শিরোমণি এবং অন্যজন হলেন কণাদ তর্কবাগীশ। রঘুনাথ শিরোমণির থেকে কণাদ তর্কবাগীশ হলেন বয়সে বড়। আচার্য মহাশয় এ বিষয়ে বলেছেন-

তেষু বাসুদেবসার্বভৌমঃ সর্বতো গরিষ্ঠঃ। এষঃ বাসুদেব এব প্রথমতো বঙ্গদেশান্মিথিলানগরীং গত্বা ন্যায়শাস্ত্রমধ্যগীষ্ট। শ্রূয়তে কণাদতর্কবাগীশো রঘুনাথ শিরোমণিশ্চেতি দ্বাবেব তস্য সার্বভৌমস্য শিষ্যাবিতি। বয়সা কণাদতর্কবাগীশো জ্যায়ান্ রঘুনাথশিরোমণিশ্চ কনীয়ান্।[২৭]

৩.২ টীকাগ্রন্থের প্রকাশকাল ও প্রকাশস্থান:-

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই *ভাষারত্ন* গ্রন্থটি স্বকৃত *রত্নলক্ষ্মী* টীকা সহিত কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থমালার ২০নং গ্রন্থ, ১৯৩৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এইসময় আচার্য মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। তর্কাচার্য মহাশয়ের স্ত্রী অকালপ্রয়াত হন সম্ভবত স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই টীকাগ্রন্থটি রচনা করেন। *রত্নলক্ষ্মী* টীকার প্রারম্ভেই স্বয়ং বলেছেন –

লক্ষ্ম্যা লোকৈ রত্নলক্ষ্মীতি নাম্না।
অকালে স্বর্গমাপ্তায়াঃ স্বপত্ন্যাঃ স্মৃতিহেতবে।
তন্নামাংশমুপাদায় টীকানাং ব্যধামিদম্।।[২৮]

এই *ভাষারত্নের* উপর টীকাগ্রন্থটি তর্কাচার্য মহাশয় বিদ্যার্থিগণের বোধের জন্য রচনা করেছেন তা টীকায় তিনি স্বয়ং বলেছেন – ‘বিদ্যার্থিনাং বোধসৌকর্য্যায় রত্নলক্ষ্মীনাম্নী কাপি টীকাপ্যত্র সন্নিবেশিতা’। এছাড়াও এই টীকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আলোচনার স্পষ্টতার জন্য পূর্বাচার্য্যগণের মতের সমাবেশ। গ্রন্থারম্ভে তর্কাচার্য মহাশয় নব্যন্যায়ের পারিভাষিক শব্দাবলীর আলোচনা করেছেন।

৩.৩ তর্কাচার্যকৃত গ্রন্থভূমিকা অংশের জ্ঞাতব্য বিষয় :-

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় কণাদ তর্কবাগীশ রচিত এই *ভাষারত্নম্* গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই ‘ভাষারত্নানুবন্ধ’ নামক ভূমিকাতে তিনি গ্রন্থের অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রতিপাদন করেছেন। প্রথমেই তর্কাচার্য মহাশয় বঙ্গদেশের গৌরব ন্যায়চর্চার ইতিহাস ও নৈয়ায়িক গুরুপরম্পরা তুলে ধরেছেন –

‘তেষু বাসুদেবসার্বভৌম-কণাদতর্কবাগীশ-রঘুনাথশিরোমণি-মথুরানাথ-জগদীশ-গদাধর-ভবানন্দ রঘুনন্দন-ভুবনমোহন-হরচরণ-চন্দ্রনারায়ণ-কালীশঙ্কর-গোলকনাথ-হরিনাথ-হলধরচূড়ামণি-রাখালদাস-শিবচন্দ্র-গঙ্গাচরণ-রামনাথ-জয়নারায়ণাদয়ঃ সুতরাং নামতঃ সমুল্লেখমর্হতি। অস্তি তদা তদা তেষাং তেষাং গ্রন্থনির্মাণে অধ্যাপনাদৌ বা সুমহানেব সমুত্কর্ষ ইতি বিদিতমেব সাময়িকানাং বিপশ্চিতাম্’।[২৯]

এরপর কণাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বিদ্যাগ্রহণ, গ্রন্থরচনা ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তিনি রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের পূর্বসূরী হয়ে নব্যন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ *তত্ত্বচিন্তামণি*র উপর একটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন, যদিও সেই গ্রন্থ প্রচার পায় নি। আচার্য মহাশয় বলেছেন এই তথ্য তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে জানতে পারেন একটি আলোচনাসত্রের সভাপতির ভাষণে। আচার্য মহাশয় ‘ভাষারত্নানুবন্ধ’ অংশে বলেছেন-

‘স এব শিরোমণেঃ পূর্বতো নব্যন্যায়শাস্ত্রমূলভূতস্য চিন্তামণিগ্রন্থস্য টীকামেকাং বিরচয়ামাস। তস্যাঃ চিন্তামণিটীকায়াঃ কিয়ানপ্যংশবিশেষো বারাশতসন্নিহিতে ব্রাহ্মণগ্রামে হরপ্রসাদশাস্ত্রিণা লব্ধঃ, যত্র টীকায়াং রচনাশৈলী গভীরা, মূলস্য বৈশদ্যসম্পাদনে সুতরামুপকারিণী চ ইতি তেনৈব প্রস্তুতং স্বলিখিতে খানাকুলকৃষ্ণনগরাখ্যে বঙ্গভাষাময়নিবন্ধে, যঃ কিল পঞ্চদশবঙ্গীয়সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতিপদমধ্যাসীনেন তেনৈব বাচিতঃ খানাকুলকৃষ্ণনগরে’।[৩০]

কণাদ-তর্কবাগীশ কেবলমাত্র খানাকুল কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত ছিলেন না, এখানে আরও অনেক পণ্ডিতের নাম শোনা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কণাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শিষ্য নারায়ণ ঠাকুর মহাশয়। এছাড়াও এখানে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের

নামও শোনা যায়। এখানকার জমিদার কণাদ তর্কবাগীশ মহাশয় ও তার শিষ্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমি দান করেন এবং এখানে সংস্কৃত চর্চার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই বিদ্যালয়ে ভারত বিখ্যাত পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা করেন এবং ক্রমেই এটি সংস্কৃত চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'ন কেবলং কণাদতর্কবাগীশ এব খানাকুলকৃষ্ণনগরমলকার্ষীত্, তত্রাভূবন্নপরেঽপি সুবিদ্বাংসঃ, যেষাং বিদ্বাকীর্ত্তিরত্যুত্তমা সমলঙ্করোত্যদ্যপি ভারতবসুন্ধরাম্। তেষু প্রধানতমঃ কোঽপি নারায়ণঠাকুরো নাম। তস্য শুদ্ধিকারিকা বহুনাং বিদুষাং মুখেষু প্রচরন্তী বিশ্রুয়তে। স হি নারায়ণো বন্দ্যোপাধ্যায়বংশপ্রভব ইত্যস্তি বিশ্রুতিঃ প্রত্নতাত্ত্বিকেষু। মহেন্দ্রনাথ-বিদ্যানিধির্নাম কশ্চিত্ খানাকুলকৃষ্ণনগরসমাজপ্রবন্ধনির্মাতা তং নারায়ণ-বন্দ্যোপাধ্যায়ং কণাদশিষ্যং প্রখ্যাপয়দিতি শাস্ত্রিনিবন্ধপাঠেনাভিজ্ঞায়তে'।[৩১]

তর্কাচার্য মহাশয় কণাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মিথিলা থেকে বঙ্গে আগমনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সময় বঙ্গে তথা নবদ্বীপে নব্যন্যায় চর্চার গৌরবময় ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়। বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয়ের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি ও কণাদ তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়চর্চায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শিরোমণির বিখ্যাত *দীধিতি* টীকা প্রথম প্রচারিত হলেও মণিগ্রন্থের উপরে কণাদ তর্কবাগীশ যে একটি টীকা রচনা করেন, তার কথা আচার্য মহাশয়ের লেখনীতে স্পষ্ট। আচার্য মহাশয় এ বিষয়ে বলেছেন-

'শ্রীমান্ কণাদতর্কবাগীশো যদা মিথিলাপ্রদেশাত্ ন্যায়শাস্ত্রমধীত্য বিশিষ্টং বিজ্ঞানমাসাদ্য তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থং গভীরার্থয়া টীকয়া স্ফুটীচকার, তদা নব্যন্যায়শাস্ত্রসম্প্রদায়ো বঙ্গেষু ন তথা প্রচচার, যথা কিল অদ্যত্বে সমুপলভ্যতে। কণাদতর্কবাগীশ এব প্রথমো ন্যায়শাস্ত্রনিবন্ধকৃতাং বঙ্গেষ্বিতি নিরুক্ত-প্রমাণাদ্ ব্যবস্থাপ্যতে। তদা ন্যায়শাস্ত্রেষু প্রথমতঃ

প্রবিবিক্ষূণাং নাসীত্ তথা কোঽপি গ্রন্থো, যেন গভীরার্থন্যায়শাস্ত্রগ্রন্থনিবন্ধবস্তুবিজ্ঞানানুকূলা পদার্থপ্রতিপত্তিঃ সুলভা সম্পদ্যেত'।[৩২]

পরবর্তী আলোচনাতে *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের প্রয়োজন আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের বহু গ্রন্থ থাকলেও কেন *ভাষারত্নম্* গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন হল, সেই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে দেখা যায়। *কিরণাবলী ন্যায়কন্দলী* প্রভৃতি গ্রন্থ থাকতেও এই গ্রন্থ রচনার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে সহজবোধ্যতার জন্য অর্থাৎ ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের প্রথম পাঠার্থীর কথা স্মরণে রেখে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রের কর্কশতা পরিহার করে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের ধারণা দেবার জন্য এই *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন বলে দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে আচার্য মহাশয় বলেছেন-

'সন্ত্যপরেঽপি গ্রন্থাতর্কভাষাপরিচ্ছেদকাঃ সুবিদিতা এব সুবিদুষাং প্রশস্তপাদভাষ্য-কিরণাবলী-ন্যায়কন্দলী-ন্যায়লীলাবতী-প্রভৃতয়ো গ্রন্থাঃ, সুগমাঃ সংক্ষিপ্তরূপাশ্চ ভাষাপরিচ্ছেদতর্ক-সংগ্রহ-তর্কামৃত-তর্কভাষা-পদার্থদীপিকা-সপ্তপদার্থীপ্রভৃতয়ঃ সংখ্যাতীতাঃ। তেষু কেচিদতিসংক্ষিপ্তাঃ সিদ্ধান্তমাত্রপ্রতিপাদিকা ন পরিতর্পয়ন্তি চেতাংসি প্রথমতোঽপি জিজ্ঞাসাভূমিকামারোহতাম্ নিপুণধিয়াং বিদ্যার্থীনাম্, যুক্তিতর্কাদিরাহিত্যেন চ ন দৃঢ়ং সংস্থাপয়িতুং ভবন্তি সিদ্ধান্তানন্তঃকরণে পদার্থতত্ত্বসম্বন্ধান্।...... ন চাতিদুরূহবাচোযুক্ত্যা বিপ্লাবয়তি প্রথমতঃ শিক্ষামধিগন্তুমীহমানানাং পদার্থতত্ত্বসিদ্ধান্তান্। ঈদৃশস্য গ্রন্থস্য নিতরাং প্রয়োজনমনুভূয় কণাদঃ স্বয়ং ভাষারত্নং নাম তাদৃশলক্ষণং গ্রন্থং প্রণিনায়, প্রণীয় চেদং গ্রন্থরত্নং সফলশ্রমঃ পরাং প্রতিষ্ঠামুপলেভে।[৩৩]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এরপর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন এই গ্রন্থ তেমন ভাবে প্রচার হয়নি। উক্ত গ্রন্থের থেকে অর্বাচীন গ্রন্থ সমূহের প্রচার হলেও এই কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *ভাষারত্ন* গ্রন্থের তেমন জনপ্রিয়তা বঙ্গদেশে বিরল, এই বিষয়টি আচার্য মহাশয়ের উক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে। *তর্কসংগ্রহ ভাষাপরিচ্ছেদ* প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচার হলেও তার থেকে প্রাচীন গ্রন্থ *ভাষারত্ন* প্রচারের আলোর অন্তরালে থেকে গেছে এ বিষয়ে তর্কাচার্য মহাশয়ের বিশেষ পরিতাপ এই আলোচনায় দেখা যায়। আচার্য মহাশয় আরও বলেছেন কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *চিন্তামণি* ব্যাখ্যা গ্রন্থ আজ বিলুপ্ত, *তর্কবাধার্থমঞ্জরী* গ্রন্থটি নামেমাত্র শোনা যায়। এছাড়াও এই *ভাষারত্নম্* গ্রন্থটি পাঠ তেমনভাবে পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত নয় বলে আচার্য মহাশয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

'পরমিদমস্মাকমতিদুঃখস্থানমেব, যদীদৃশস্যাপি তস্য গ্রন্থস্য ভাষারত্নস্য বিদ্বত্সু বিদ্যার্থিষু চ তথা প্রচার নোপলভ্যতে, যথা ততোঽর্বাচীনানামপি পদার্থতত্ত্ব-প্রতিপাদকাগ্রন্থানাম্।..... পরমস্য ভাষারত্নস্য প্রতিভাতি শিক্ষামার্গে প্রকর্ষাতিশয়মধিকুর্বতো নামাপ্যবিদিতপ্রায়ম্। কণাদেন এতদ্-গ্রন্থপ্রণেত্রা রচিতা বিলুপ্তা তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা, নামমাত্রসারাতর্কবাদার্থমঞ্জরী, অস্মদেব চ মন্যে প্রথমতো লব্ধপ্রকাশং ভাষারত্নম্, তদত্র তত্তদ্-গ্রন্থপ্রচারবিরহে বিধিবির্গুণা এব হেতুতামধ্যাস্তে'।[৩৪]

এরপর *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের রচনাশৈলী বর্ণনা করা হয়েছে, এ বিষয়ে আচার্য মহাশয় বলেছেন-

'... যাবন্তঃ কিল প্রতিপদ্যন্তে প্রাচীনটীকাগ্রন্থাদয়ঃ, তাবত্সু সর্বেষু এব তথৈব রীতিঃ সমবলোক্যতে। পরং ভাষারত্নগ্রন্থে যাদৃশী রচনাশৈলী, সা সুতরাং নবীনৈব প্রতীয়মানা শিরোমণিকালাদর্বাকতনত্বং কণাদকালস্য প্রত্যায়য়তি'।[৩৫]

পরবর্তী আলোচনায় আচার্য মহাশয় গ্রন্থ আলোচিত বিষয়টি তুলে ধরেছেন সেখানে গ্রন্থ নির্মাণের কারণ, গ্রন্থ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনাতে কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *ভাষারত্ন* গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের বিশেষ সমীক্ষা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের সাথে প্রাচীন ন্যায় বৈশেষিক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থশৈলীর বিভিন্নতা, লেখনশৈলীর ভিন্নতা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। মঙ্গলাচরণে চূড়ামণি শব্দের দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে সেই আলোচনা, গ্রন্থকার দ্বারা লিখিত অন্য গ্রন্থ আলোচনা *চিন্তামণি* গ্রন্থের বিভিন্ন টীকা পরিশেষে *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের অনন্যতা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রতিপাদিত হয়েছে।

তর্কাচার্য মহাশয় *ভাষারত্ন* গ্রন্থ বিষয়ে একটি পর্যালোচনা করেছেন। অর্থাৎ *ভাষারত্ন* গ্রন্থ ন্যায়দর্শন নাকি বৈশেষিক দর্শন। সেখানে বৈশেষিক পক্ষে যুক্তি প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং পরিশেষে এই গ্রন্থটি যে সমানতন্ত্রীয় দর্শনের একটি অন্যতম গ্রন্থ সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মিল ও অমিল গুলি যুক্তিসহকারে আলোচিত হয়েছে। প্রমাণ চিন্তা, পদার্থ চিন্তা, পাকজোৎপত্তি বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা আলোচনাতে স্পষ্ট হয়েছে।

ভূমিকা অংশের পরবর্তী আলোচনায় *ভাষারত্ন* গ্রন্থের পদার্থের বিভাগ, টীকা প্রণয়নের কারণ, গ্রন্থের প্রবৃত্তি অর্থাৎ উদ্দেশ্য লক্ষণ ও পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা, *ভাষারত্ন* গ্রন্থের সহজবোধ্যতা, গ্রন্থ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, পদার্থ তারপর চারটি প্রমাণ নিয়ে আলোচনা, পরিশেষে *ভাষারত্ন* গ্রন্থের প্রচারের অভাব এবং গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ের তথ্য প্রতিপাদিত হয়েছে।

এ ছাড়া এই *ভাষারত্ন* গ্রন্থের ‘ভাষারত্নানুবন্ধ’ নামক ভূমিকা অংশে তর্কাচার্য মহাশয় নব্যন্যায়পারিভাষিক শব্দের আলোচনা করেছেন। প্রায় ২৭ পৃষ্ঠার ‘পারিভাষিকপদার্থবিবৃতিঃ’ এই অংশে যে বিষয়গুলি তিনি প্রতিপাদন করেছেন সেগুলি হল- ‘অভাবীয়-প্রতিযোগিত্বম্’, ‘সাংসর্গিক-প্রতিযোগিত্বম্’, ‘অভাবীয়মনুযোগিত্বম্’, সাংসর্গিক-অনুযোগিত্বম্’, অবচ্ছেদকত্বম্, পর্যাপ্তিসম্বন্ধ ইত্যাদি।

৩.৪ *ভাষারত্ন* গ্রন্থের অন্যান্য সংস্করণ :-

এই *ভাষারত্ন* গ্রন্থের অন্য সংস্করণ পাওয়া যায় নি, সুতরাং তর্কাচার্য মহাশয়ের গ্রন্থটি একমাত্র তা বলা যেতে পারে। কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বর্তমানে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ(সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়), এশিয়াটিক সোসাইটি ও জাতীয় গ্রন্থাগারে উপলব্ধ।

৪.গদাধর ভট্টাচার্য রচিত *মুক্তিবাদ* গ্রন্থের স্বকৃত *মুক্তিদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা:-

৪.১ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় :-

প্রখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির *দীধিতি* টীকার উপর *গাদাধরীর* রচয়িতা গদাধর ভট্টাচার্য্যের বিরচিত গ্রন্থ হল *নবমুক্তিবাদ*। গদাধর ভট্টাচার্যচক্রবর্তী হলেন *দীধিতি* সম্প্রদায়ের সর্বশেষ গ্রন্থকার। তিনি ছিলেন ভারতবিশ্রুতকীর্তি মহানৈয়ায়িক। তার পিতার নাম জীবু আচার্য, একজন তান্ত্রিক সাধক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তার বিদ্যাগুরু ছিলেন হরিরাম তর্কবাগীশ মহাশয়। গদাধর ভট্টাচার্যচক্রবর্তী সমগ্র অনুমান দীধিতির উপর টীকা রচনা করে প্রসিদ্ধ হন। তারপর সমগ্র অনুমান *দীধিতি* গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন

একমাত্র ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশ। বঙ্গে *নব্যন্যায়চর্চা* গ্রন্থে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'অনুমানদীধিতির সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ টীকার রচয়িতা গদাধরকে *দীধিতি* সম্প্রদায়ের সর্বশেষ এবং চরম গ্রন্থকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা যতদূর জানি তাঁহার পর একজনমাত্র নবদ্বীপনিবাসী নৈয়ায়িক সমগ্র অনুমানদীধিতির টীকা রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশ। নব্যন্যায়ের ইতিহাসে গদাধরই সুনির্দিষ্ট তৃতীয় যুগের অবসানকারী'।[৩৬] গদাধর ভট্টাচার্যের সময়কাল হল জন্ম আনুমানিক ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ প্রয়াণ ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দ।

নব্যন্যায় দর্শনে গদাধর ভট্টাচার্যের বাদ গ্রন্থ গুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, প্রবাদ অনুযায়ী তিনি নাকি ৬৪ প্রকার বাদ গ্রন্থ রচনা করেন এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা* গ্রন্থে বলেছেন-

'তদ্রচিত বহু বাদগ্রন্থ নানাস্থানে পাওয়া যায়- তাহাদের মোট সংখ্যা কত, প্রবাদানুযায়ী ঠিক ৬৪ কি না নির্ণয় করার উপায় নাই। *শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, বিষয়তাবাদ* ও বিধিস্বরূপ তন্মধ্যে প্রধান এবং একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে-ইহাদের পঠনপাঠন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই'।[৩৭]

৪.২ টীকাগ্রন্থের প্রকাশকাল ও প্রকাশস্থান :-

গদাধর ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থের নাম *নবমুক্তিবাদ*। 'নব' পদের এখানে সার্থকতা আছে কারণ গদাধরের পূর্বে বহু প্রধান নৈয়ায়িক মুক্তি বিচার প্রচার করেন, তাদের মধ্যে

রামভদ্র সার্বভৌমের *মোক্ষবাদ* মথুরানাথতর্কবাগীশ মহাশয়ের *মুক্তিরহস্য* অন্যতম। মূলত টীকাকার শিবরাম এই কারণে নব শব্দটির সংযোজন করেন।

গদাধর ভট্টাচার্য রচিত *মুক্তিবাদের* উপর শিবরাম বাচস্পতি যে টীকা রচনা করেন, গ্রন্থটি বহুল প্রচার না হলেও এটি দুষ্প্রাপ্য নয়। এই টীকা গ্রন্থের প্রারম্ভতে শিবরাম তার নিজের কথা উল্লেখ করেছেন-

প্রণম্য শান্তং হরমদ্বিতীয়ং, বেদান্তবেদ্যং জগদেকহৃদ্যম্।

গদাধরোক্তে নব-মুক্তিবাদে, তনোতো টীকাং শিবরামনামা।।[৩৮]

শিবরাম কাশীতে বসে ১৭৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই টীকাগ্রন্থ্ রচনা করেন বলে জানা যায়, এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের মত-

'শিবরাম কাশীতে বসিয়া ১৬৬৪ শকাব্দে (১৭৪২-৪৩ খ্রীঃ) গ্রন্থ্ রচনা করিয়াছিলেন- মুদ্রিত সংস্করণে এই মূল্যবান তথ্য লিখিত হয় নাই। আমরা নবদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ গোলকনাথ ন্যায়রত্নের স্বহস্তলিখিত প্রতিলিপিতে টীকার শেষে এই তথ্য পাইয়াছি'।[৩৯]

এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে শিবরামের বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। *নবদ্বীপ মহিমা* গ্রন্থে যে পরিচয় উল্লেখিত হয়েছে তা হল – 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালীন প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে ষড়্দর্শনবিদ্ শিবরাম বাচস্পতির নাম আছে। তাঁহার পুত্র হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত শঙ্করের পূর্বে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন'।[৪০]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে শিবরামের টীকাসহ গদাধর ভট্টাচার্যের *নব-মুক্তিবাদ* এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন। আচার্য মহাশয় শিবরামের টীকার সহিত *মুক্তিদীপিকা* নামক টীকাগ্রন্থটি সংযোজন করে সেই সাথে বঙ্গভাষায় 'তাৎপর্য-বিবরণ' নামক একটি আলোচনা

তিনি প্রতিপাদন করেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের বোধগম্যের জন্য। গ্রন্থের প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আদিত্যনাথ মুখার্জি মহাশয় ইংরেজিতে একটি ভূমিকা রচনা করেছেন সেখানে তর্কাচার্য মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন-

'Pandit Kālīpada Tarkācārya, Kāvya-Vyākaraṇ-Tarkatīrtha is an eminent Sanskrit scholar of the orthodox type. His academic career was all through an exceptionally brilliant one, in almost all the examinations he won the first place. He possesses a rare mastery over the Sanskrit language'.[৪১]

৪.৩ তর্কাচার্যকৃত গ্রন্থভূমিকা অংশের জ্ঞাতব্য বিষয় :-

এই গ্রন্থের দীর্ঘ প্রাসঙ্গিক (প্রায় ৬৬ পৃষ্ঠা) আলোচনা গ্রন্থারম্ভে দৃষ্ট হয়। আচার্য মহাশয় এই *মুক্তিবাদ* গ্রন্থের ভূমিকা অংশের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শনের নানান বিষয় বিশেষ করে মুক্তিবাদ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনের দিক্‌দর্শন করে ন্যায়মতের সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে। কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় 'মুক্তিবাদ-ভূমিকা' অংশে মুক্তিবাদ প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে যে সিদ্ধান্ত বিশেষকরে আস্তিক ও নাস্তিক ভারতীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মতের নির্যাস এখানে দেখা যায়। মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স প্রসঙ্গে সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রতিপাদন করলেও চরম সিদ্ধান্ত মুক্তিবাদকে প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। রুচি ভিন্ন হলেও সকলের লক্ষ্য এক অপবর্গ বা মোক্ষলাভ, আর বলা বাহুল্য ভারতীয় দর্শনের এটিই হল পরম উদ্দেশ্য। সকল নদী যেমন নানান প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই এক মহাসমুদ্রে মিলিত হয় এই বিষয়টি যেন সেইরূপ। তাই প্রখ্যাত বাঙালি মহাপরিব্রাজক বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী *প্রস্থানভেদ* গ্রন্থের শিবমহিম্নস্তোত্রে যথার্থই বলেছেন-

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতিঃ

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথ-জুষাম্

নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।[৪২]

অর্থাত্ বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈব ও বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা মতধারা আছে, সেই একরূপ আবার কেউ অন্যরূপ মত অনুসরণ করে। কিন্তু লক্ষ্য সেই এক তুমিই। কোন মত ঋজু, কোন মত কুটিল, রুচি অনুসারে লোকে তার আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন সকল নদী সমুদ্রে মিশে থাকে, তেমনি সকল মতের লক্ষ্য তুমি সেই এক ঈশ্বর।

তর্কাচার্য মহাশয় প্রথমেই সকল দেহীকে অন্তঃচেতন ও বহিঃচেতন ভেদে দ্বিবিধ বিভক্ত করেছেন *মনুসংহিতা* এবং *সাংখ্যসূত্র* থেকে মত উত্থাপন করে। অন্তঃচেতন বলতে বৃক্ষগুল্মাদি এবং বহিঃচেতন বলতে মানুষপশুপক্ষি পতঙ্গাদয়কে বুঝিয়েছেন। এ জগতে দুঃখ সকল চেতনের আবশ্যিক তা প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলেছেন-

‘অথ সর্ব এব তে চেতনাঃ প্রতিদিবসমুপজায়মানোদয়েন দুঃখেনাভি-ভূয়ন্তে, নাস্তি সংসারে তথা কিমপি চেতনং বস্তু, যত্র প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখং ন পদমাধত্তে, তথাহি যে দীনাস্তে ধনাভাবেন স্বজনসভাজনাদি সামর্থ্যশূন্যাঃ পরং দুঃখমনুভবন্তো দৃশ্যন্তে, মধ্যবিত্তা গৃহস্থাঃ কথঞ্চন স্বজনসভাজনাদিবিধৌ সামর্থ্যবন্তোঽপি ধনিকসাম্যেন ব্যবহর্ত্তুমপারয়ন্তো নিজমনোরথপ্রতিঘাতেন পরিদূয়ন্তে.....তদেবং গতে সর্ব এবৈতে চেতনাঃ সততদুঃখভাগিন ইতি নিরায়াসবেদ্যো বিষয়ঃ’।[৪৩]

এরপর তর্কাচার্য মহাশয় সাংখ্যদর্শনের ত্রিবিধ দুঃখের কথা বলেছেন- ‘তানি চ দুঃখানি ত্রিবিধানি আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকম্’ এই শিরোনামে বাচস্পতি মিশ্রের

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী আলোচনা সমেত। আচার্য মহাশয় এই ভূমিকা অংশে যে বিষয়গুলি প্রতিপাদন করেছেন তার শিরোনামগুলি হল-

'নহি লৌকিকবৈদিকোপায়ৈসন্নিবৃত্তিরৈকান্তিকী আত্যন্তিকী চ', 'অত এব তদর্থে বিশেষদর্শিনামলৌকিকোপায়ানুসন্ধানম্','অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির্বিশেষদর্শিনামেব পুরুষার্থঃ, ন তু বিষয়িণাম্', 'তদুপায়তত্ত্বজ্ঞানাদেঃ শাস্ত্রভেদেন ভেদোপলম্ভঃ', ' অধিকারিভেদেন শাস্ত্রাণাং প্রবৃত্তেঃ কস্যাপি নাপ্রামাণ্যম্',' সাক্ষাত্ পরম্পরয়া বা মোক্ষে সর্বশাস্ত্রাণামুপযোগঃ'।

'তত্র তব শাস্ত্রে অধিকারিণাং দৃঢ়প্রবৃত্ত্যর্থমেব পরপক্ষাধিক্ষেপঃ',' বৈদিকাবৈদিক-ভেদেন দ্বিবিধানি, দর্শনানি তত্র বৈদিকানি ষট্ অবৈদিকানি চ ষট্', 'লোকায়তিকমন্তরেণ সর্বত্র দর্শনে চত্বারঃ পুরুষার্থাঃ', ' দেহাত্মবাদিচার্বাকপ্রস্থানে মরণ-রূপমোক্ষাদি-সংক্ষেপঃ',' আর্হতদর্শনে কর্মক্ষয়াত্ সততোর্দ্ধগমনা-দিরূপো মোক্ষঃ',' তন্মতে সম্যগ্-দর্শনাদিত্রিকং মুক্তিজনকম্', 'তন্মতে সম্যগ্-দর্শনাদিত্রিকস্য সম্ভূয় মুক্তিজনকতা',' আত্মনঃ স্বাভাবিকাংমুর্দ্ধগতেরপি কর্মণ প্রতিবন্ধঃ', 'মুক্তি-লাভান্তরং জীবস্যালৌকিক-নিরবধিসুখলাভঃ','আর্হতমতসিদ্ধমুক্তিস্বরূপগতবৈষম্যপরিহারঃ','বৌদ্ধমতসিদ্ধ মোক্ষাদি-সংক্ষেপ-প্রারম্ভঃ','মাধ্যমিকানাং সর্বশূন্যতা যোগাচারাণাং বিশুদ্ধিবিজ্ঞানসন্তানোদয়ো মোক্ষঃ','সৌত্রান্তিক-বৈভাষিকয়ো-র্বিশুদ্ধবিজ্ঞান-সন্তানতাবাপ্তিরূপা মুক্তিঃ',।

'চার্বাকমতেঽপি মোক্ষস্য স্বরূপদ্বয়-বিচারঃ',' চার্বাকমতাপ্রেক্ষয়া বৌদ্ধনাং প্রস্থানে সমুৎকর্ষঃ',' বৈশেষিকমত-সিদ্ধমুক্ত্যাদি-সংক্ষেপারম্ভঃ', ' প্রবৃত্তি-লক্ষণ-ধর্মাত্ সংসারঃ নিবৃত্তি-লক্ষণধর্মাদপবর্গঃ',' পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানস্য পরমেশ্বর-প্রসাদ-সম্পাদকত্বেন মোক্ষো-পযোগঃ',' উদয়নমতে কর্মণামারাদুপকারকত্বং জ্ঞানস্য সন্নিপত্যোপকারকত্বম্', কণাদ-মতোক্ত-নানাবিধ-মোক্ষস্বরূপবিচারঃ'

'চার্বাকমতসিদ্ধমুক্তিনিরাকরণেন নৈয়ায়িকমুক্তিস্থাপনম্','কাণাদমোক্ষাত্ নৈয়ায়িক-মোক্ষে সুখজ্ঞান-রূপ বিশেষসমর্থনম্,' ন্যায়ভাষ্যাদীনামপি মোক্ষস্য দুঃখ্যাত্যন্তনিবৃত্তিরূপত্বে তাৎপর্যম্,' মীমাংসকমতভেদপ্রবর্তকভট্টপ্রভাকরয়োর্মতভেদঃ',' পূর্বমীমাংসায়াঃ স্বর্গাতিরিক্ত-পরমপুরুষার্থপ্রতিপাদনম্','সাংখ্যসিদ্ধান্তে সংসারাপবর্গয়োঃ কারণনিরূপণম্',' সেশ্বর-নিরীশ্বর-সাংখ্যয়োর্দ্বয়োরেব দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির্মোক্ষঃ',' সগুণ-ব্রহ্মবাদিরামানুজমতে জীবেশ্বরয়োঃ পারমার্থিকভেদাদিকথনম্','মুক্তাপেক্ষয়া তন্মতে পরমেশ্বরস্য সর্ব-কর্ত্তৃত্বমেবাধিকা বিভূতিঃ','মুক্তিবাদনিরূক্তবস্তুসংক্ষেপাদিঃ',গ্রন্থকৃতো গদাধরস্য জন্মাদি-বৃত্তান্তঃ, ' প্রকৃতসংস্করণপ্রকারনিবেদনম্', 'বিজ্ঞতমেষু দোষক্ষমাপবাদি প্রার্থনা-পূর্বকোপসংহারঃ'।[৪৪]

৪.৪ *মুক্তিবাদ* গ্রন্থের অধুনালব্ধ সংস্করণ :-

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তর্কাচার্য মহাশয়ের উক্ত সংস্করণের পর গদাধর ভট্টাচার্যের *মুক্তিবাদ* গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। বামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য পণ্ডিত দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে শাস্ত্রী মহাশয় *মুক্তিবাদচন্দ্রিকা* নামক বিবৃতি অংশটি সংযোজন করেন, যা কিনা গদাধর ভট্টাচার্যের *মুক্তিবাদের* স্পষ্ট ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। প্রথমে বেনারস থেকে প্রকাশিত হলেও পরবর্তিকালে 'হরিদাস সংস্কৃত গ্রন্থমালা' নামক সিরিজে চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ নামক প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১১ সালে এই গ্রন্থের আবার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে 'প্রাচীন-নবীন-মুক্তিবাদ-সংক্ষেপঃ' অংশে একটি প্রাচীন এবং নবীন দর্শনের মুক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখা যায়।

তর্কাচার্যকৃত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বর্তমানে কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্, সংস্কৃত কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

৫. হরিরাম তর্কবাগীশ প্রণীত *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থোপরি *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা রচনা :-

৫.১ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় :-

বঙ্গদেশের নৈয়ায়িককুলচূড়ামণি হরিরাম তর্কবাগীশ হলেন গদাধর ভট্টাচার্যের গুরু। গদাধর ভট্টাচার্য তাঁর টীকা গ্রন্থের প্রারম্ভে গুরুদেবের দিগন্তপ্রসারী কীর্ত্তির কথা বলেছেন। এই হরিরাম সম্মানসূচক জগদ্-গুরু পদে ভূষিত হয়েছিলেন। গ্রন্থসম্পাদক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থের 'পূর্বভাষণম্' অংশে বলেছেন-

'বঙ্গদেশীয়-নৈয়ায়িক-কুলচূড়ামণীনাং তত্রভবনাং গদাধর-ভট্টাচার্য-পাদানামধ্যাপক-পাদা মহামহোপাধ্যায়-হরিরাম-তর্কবাগীশমহোদয়াঃ খলু নব্যন্যায়-শাস্ত্রীয়-পাণ্ডিত্য-বিশেষ-বশাত্ তদানীন্তনে কালে দিঙ্-মণ্ডলব্যাপিনীং বিশেষকীর্তিমাবহতা সর্বশ্রেষ্ঠ-সম্মানসূচকেন 'জগদ্-গুরু সংজ্ঞকেন বিরূদরত্নেন বিভূষিতা ইতি তেষামধ্যাপনানৈপুণ্যং সুতরাং প্রতিভাতি'।[৪৫]

নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তা হরিরাম তর্কবাগীশ মহাশয়ের খ্যাতি সূচিত করে – 'হরের গদা, গদার জয়। জয়ার বিশু লোকে কয়'।।[৪৬] তিনি *দীধিতি* বা মণি গ্রন্থের কোন টীকা রচনা না করলেও বিচার পূর্বক নানান বাদ গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে মণিকার, আলোককার ও দীধিতিকার প্রভৃতি মতের খণ্ডন মণ্ডন করে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেছেন। তার রচনা ও প্রখ্যাত নৈয়ায়িক শিষ্যের কথা বলতে গিয়ে *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা* গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'প্রত্যক্ষখণ্ডের মঙ্গলবাদ, প্রামাণ্যবাদ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া শব্দখণ্ডের বিধিবাদ, অপূর্ববাদ প্রভৃতি পর্যন্ত হরিরামের রচনা সুপ্রাপ্য।...... হরিরাম স্বয়ং কোন টীকাগ্রন্থ রচনা না করলেও দিকপালসদৃশ তাহার দুইজন প্রধান শিষ্য নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়া গুরুর কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, নবদ্বীপের গদাধর এবং তাঁহার কিঞ্চিত্ পূর্ববর্তী কাশীর অধ্যাপক রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার'।[৪৭]

হরিরামতর্কবাগীশকৃত অনেক গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থটি অন্যতম, কারণ এটি *তত্ত্বচিন্তামণির দীধিতি* বা অন্য কোন বিষয়কে অবলম্বন করে লেখা গ্রন্থ নয়, বরং বলা যায় প্রচলিত চিন্তামণির খণ্ডত্রয়ের প্রধান বিষয়কে অবলম্বন করে বিচারমূলক একটি মৌলিক গ্রন্থ হল *মুক্তিবাদবিচার*। এই গ্রন্থের নানান বিচারে পূর্বপক্ষের মতকে প্রতিবাদীর মত হিসেবে উল্লেখ করে তার সম্যক্ পর্যালোচনা করে পাণ্ডিত্যপূর্ণবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্তের স্বমতকে স্থাপন করা হয়েছে। তাই *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থটি কোন গ্রন্থবিশেষের ব্যাখ্যা নয়, এটি মূলগ্রন্থরূপে সমাদৃত। গ্রন্থের 'পূর্বভাষণম্' অংশে বলা হয়েছে-

'লভ্যন্তে চ অত্রত্যগ্রন্থশালায়াং হরিরামকৃতগ্রন্থা অনেকে এব। তেষামবলোকনেন এবং জায়তে যদ্ হরিরামেণ তত্ত্বচিন্তামণিং দীধিতিমথবা অন্যং কমপি গ্রন্থবিশেষমবলম্ব্য ব্যাখ্যা ন কৃতা, পরং প্রচলিতচিন্তামণিখণ্ডত্রয়স্য প্রধানবিষয়ানবলম্ব্য বিচাররহস্যনামধেয়ানি মৌলিকগ্রন্থরত্নানি রচিতানি। তেষু তেষু গ্রন্থেষু পূর্বপক্ষরূপেণ প্রতিবাদিনাং মতান্যুল্লিখ্য তেষাং সম্যক্-পর্যালোচনয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণবুদ্ধিবৈশদ্যঞ্চ প্রদর্শ্য স্বমতং সংস্থাপিতম্'।[৪৮]

৫.২ টীকাগ্রন্থের প্রকাশকাল ও প্রকাশস্থান :-

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থের উপর *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা রচনা করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে, কারণ **১৯২৪**

সালে তর্কাচার্য মহাশয় *মুক্তিবাদ* গ্রন্থের উপর *মুক্তিদীপিকা* টীকা রচনা করেন এবং তা পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হয়। তাই উক্ত কর্মের যোগ্যতম পণ্ডিত বলে মনে করা হয় তর্কাচার্য মহাশয়কে, গ্রন্থের ভূমিকা অংশে অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই সেকথা বলেছেন-

'I requested Mahāmahopādhyāya kālīpada Tarkācārya to write a running commentary in simple sanskrit for a benefit of a wider circle of readers. Mahāmahopādhyāya in his earlier years published an edition of Gadadhar's *Muktivāda,* or more precisely, *Nava Muktivāda* with a commentary of his own under the auspices of the Sanskrit Sahitya Parishat.

Culcutta, and so I considered that he would be the fittest person to undertake this work and attempt a comparative study between the productions of the teacher and his disciple. I felt particularly happy, therefore, when this savant acceded to my request and completed it in all earnestness defying the infirmities of age. I have, therefore no words for adequately expressing my gratitude to him. I can only add that this sanskrit college has always a place in his wide bosom and he can never refuse a call from it.[৪৯]

১৯৫৯ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তর্কাচার্য মহাশয়ের পত্নী রাধালক্ষ্মী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আত্মার শান্তি কামনায় এই টীকার নামকরণ করা হয়েছে বলে তিনি *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থের আলোচনায় টীকার অন্তিমে বলেছেন –

রাধালক্ষ্মীনামধেয়া মদীয়া

পত্নী প্রাপ্তা মুক্তিমুক্তামকালে।

তস্যা মুক্তের্ব্যক্তমন্যোক্তিলোভাদ্

ব্যাখ্যা নীতা মুক্তিলক্ষ্মীত্যভিখ্যাম্।।[৫০]

৫.৩ *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থের পুঁথিসংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় :-

মুক্তিবাদবিচার গ্রন্থের প্রারম্ভেই সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য তর্কতীর্থ মহাশয়‘ MANUSCRIPT MATERIALS’ অংশে গ্রন্থের পুঁথি সংক্রান্ত তথ্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে এই গ্রন্থটি চারটি হস্তলিখিত পুঁথি থেকে সম্পাদন করা হয়েছে। পুঁথিগুলি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে উপলব্ধ তা সম্পাদক মহাশয় নিজেই উল্লেখ করেছেন। এই পুঁথিগুলি দেশীয় কাগজে বঙ্গভাষায় লেখা। এই অংশে ভট্টাচার্য মহাশয় পুঁথিগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

‘The present edition of Harirāma Tarkavāgīś’s *Muktivāda-vicāra* has been prepared on the basis of four manuscripts preserved in the Calcutta Sanskrit College Library. The manuscripts on which the present edition is based are designated A B C and D. They are written on country-made paper in Bengali script. The writing of A seems to be the oldest. Details of the manuscripts are mentioned below’.[৫১]

তবে উক্ত পুঁথিগুলির প্রারম্ভ ও পুষ্পিকা অংশে কিছু ভিন্ন ভিন্ন উক্তি দেখা যায় যেমন প্রথম পুঁথির পুষ্পিকাতে বলা হয়েছে ‘মুক্তিবাদরহস্যম্’। দ্বিতীয় পুঁথির প্রথমে আরম্ভ হয়েছে ‘ওম্ লিপিমম্বোদরায়’, পুষ্পিকাতে ‘শ্রীহরয়ে নমঃ’ এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ‘মুক্তিঃ’ এরূপ উল্লেখ। আবার অন্তিমে বলা হয়েছে-‘ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীহরিরাম-তর্কবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতো মুক্তিবাদবিচারঃ সম্পূর্ণঃ’। তৃতীয় পুঁথি আরম্ভ হয়েছে ‘ওম্ নমো পরমাত্মনে’, পুষ্পিকাতে উল্লিখিত- ‘ইতি মুক্তিবাদরহস্যম্ ওম্ নমো গণেশায়’। চতুর্থ পুঁথিতে প্রারম্ভ হয়েছে- ‘কস্তাবদপবর্গঃ’(এই পাঠটি বর্তমান সংস্করণে গ্রহণ করা হয়েছে) অন্যদিকে

পুষ্পিকাতে বলা হয়েছে- ‘শ্রীহরিঃ সম্পূর্ণোঽয়ং *মুক্তিবাদঃ*। এইসকল তথ্য সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্যকৃত MANUSCRIPT MATERIALS’ অংশে উপলব্ধ।

তবে এই সমস্ত ভিন্ন পাঠ দেখা গেলেও এই গ্রন্থটি যে হরিরামতর্কবাগীশ প্রণীত একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তবে ‘ইণ্ডিয়া অফিস’ নামক গ্রন্থাগারের পুঁথিতে ‘ইতি মুক্তিবাদরহস্যং সম্পূর্ণম্’ অংশে গ্রন্থকার বা লিপিকারের নাম না থাকায় এই গ্রন্থ হরিরামের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হলেও এই গ্রন্থের সম্পাদক সংস্কৃত কলেজের হরিরামতর্কবাগীশ মহাশয়ের চারটি পুঁথির কথা উল্লেখ করে সে বিষয়ে সংশয়ের নিরসন করেছেন। তিনি বলেছেন-

‘ইণ্ডিয়া অফিস্ ইত্যাখ্যপুস্তকবিবরণাবলোকেন মহান্ সন্দেহো জায়তে যন্মুক্তিবাদরহস্যং হরিরামবিরচিতং ন বেতি। তত্রত্যমুক্তিবাদপুষ্পিকায়াং‘ইতি মুক্তিবাদরহস্যং সম্পূর্ণম্’ ইত্যেবন্মাত্রং বর্ততে, নাস্তি গ্রন্থকারস্য লিপিকারস্য বা নামাদিকং কিঞ্চিত্, তথাপি কথং তৈর্নির্ণীতং গ্রন্থোঽয়ং হরিদাসস্যেতি? কলিকাতারাষ্ট্রীয়সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়-গ্রন্থশালায়াং চতুঃসংখ্যকা মুক্তিবাদস্যাদর্শগ্রন্থা বর্তন্তে, তেষু সর্বত্রৈব ‘ইতি হরিরামবিরচিতং মুক্তিবাদরহস্যং(বিচারঃ বিচাররহস্যং বা) সম্পূর্ণ’ মিত্যেতাদৃশ এবোল্লেখো দৃশ্যতে, পরং ইণ্ডিয়া অফিস্ বিবরণে মুক্তিবাদবিষয়ে যা বিবৃতির্লভ্যতে তয়া সহ পূর্বোক্তগ্রন্থচতুষ্টয়স্য নাস্তি কশ্চিদ্বিরোধঃ। অতো মুক্তিবাদরহস্যং হরিরামবিরচিতমেবেতি নাস্ত্যত্রাংশতোঽপি সন্দেহাবসরঃ’।[৫২]

৫.৪ *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থের অধুনালব্ধ সংস্করণ :-

১৯৫৯ সালের কালীপদ তর্কাচার্য টীকাকৃত গ্রন্থটি ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের আর কোন বর্তমান সংস্করণ অনুপলব্ধ। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

৬. ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ* গ্রন্থ সম্পাদনা :-

৬.১ টীকাকার ও টীকাগ্রন্থ পরিচয় :-

'ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ভারত বিশ্রুত মহানৈয়ায়িক। তাঁর আবির্ভাবকাল **১৫১৫** খ্রিস্টাব্দ। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন জগদীশ তর্কালংকার'। তিনি বহুটীকা গ্রন্থের প্রণেতা সেগুলি হল- *চিন্তামণি দীধিতির* টীকা, *আখ্যাতবাদ* টীকা, *নঞ্-বাদ* টীকা, *গুণদীধিতি* টীকা, *লীলাবতী দীধিতি* টীকা, *শব্দচিন্তামণির* টীকা *সারমঞ্জরী, শব্দার্থসারমঞ্জরী, কারকচক্র, দশলকারবিবেচন, আখ্যাতবিচার, ষট্ সমাস বিবেচন, কারণতাবিচার* '।[৫৩]

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা* গ্রন্থে বলেছেন-

'ভবানন্দের গ্রন্থ একসময় ভারতবর্ষের সর্বত্র গৌরবের সহিত অধীত হইয়াছে, অথচ তাঁহার নাম নিজ বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। একসময় অনুমান দীধিতির টীকাকারগণের মধ্যে ভবানন্দের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। বাঙ্গলার চারি জন মহানৈয়ায়িক সম্বন্ধে যে শ্লোক প্রচারিত ছিল –

গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
সর্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী ক্বচিত্ ক্বচিত্।।[৫৪]

৬.২ তর্কাচার্যকৃত *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ* গ্রন্থ সম্পাদনা :-

এটি ভবানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং এর খ্যাতি ভারতব্যাপি। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থের সম্পাদনায় এই গ্রন্থের প্রথমাংশ (ব্যাপ্তিগ্রহোপায়-প্রকরণ পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়। *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা* গ্রন্থে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'অনুমানদীধিতি টীকা ভবানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং তাহার ভারতব্যাপিনী খ্যাতির নিদান। এই প্রতিলিপি বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্র –কাশ্মীর, পুণা, মাদ্রাজ, তাঞ্জোর প্রভৃতি পুঁথিশালায় সুপ্রাপ্য। সৌভাগ্যবশত এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থের সম্পাদনায় ইহার প্রথমাংশ মুদ্রিত হয়েছে।[৫৫]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনাকালে ভূমিকা 'শ্রীভবানন্দাদি-বৃত্তরেখা' অংশে অনুরূপ বলেছেন-

'তস্য চ প্রথমো ভাগো ব্যাপ্তিগ্রহোপায়গ্রন্থপর্য্যন্তঃ কতিপয়-বত্সরেভ্যঃ পূর্বমস্যা এব পরিষদঃ প্রেরণয়া স্বর্গতমহামহোপাধ্যায়-গুরুচরণতর্কদর্শনতীর্থমহাভাগৈঃ সুসংস্কৃতঃ প্রাকাশ্যমাসসাদ'।[৫৬]

এরপর ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশকৃত *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ* গ্রন্থটির দ্বিতীয়ভাগ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি (BIBLIOTHECA INDICA :Work Number 194) থেকে ১৯৬৩ সালে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বর্তমানে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের

অনুমানকাণ্ডের ‘তর্কপ্রকরণ’ থেকে ‘পক্ষতাপ্রকরণ’ পর্যন্ত অংশ কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা *শ্রীভবানন্দাদিবৃত্তরেখা* নামক অংশে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তর্কাচার্য মহাশয়।

শ্রীভবানন্দাদিবৃত্তরেখা অংশে তর্কাচার্য মহাশয় গ্রন্থভূমিকা প্রতিপাদন করেছেন। সেখানে প্রথমেই ন্যায়চর্চায় বঙ্গদেশের প্রশংসা করে নবদ্বীপে নৈয়ায়িক পরম্পরার কথা বলেছেন-

‘নূনং বিদিতমিদং ধীরধুরন্ধরাণাং যত্ সুচিরাত্ প্রভৃত্যৈব প্রভূতসুবিশ্রুতযশোধবলায়া রত্নভূতায়া মিথিলায়া ইব সুতরামশিথিলা চানবদ্যা চ কীর্ত্তির্বরীবর্ত্তি বিদ্যায়ামান্বীক্ষিক্যাং বিদ্বদ্-বরিষ্ঠসমধিষ্ঠিতায়া বঙ্গবসুন্ধরায়াঃ। যত্র কিল সংখ্যাতীতাঃ প্রথিতমহিমানো মানোন্নতাস্তার্কিকবিপশ্চিতঃ প্রচিতপ্রতিভাপ্রোদ্দীপ্তাঃ........ বিদ্যাসম্প্রদায়মবতাং বিপশ্চিদ-পশ্চিমানাম্’।[৫৭]

গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের উপর পরবর্তিকালে টীকা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হতে থাকে এবং এক একটি সম্প্রদায়ের পরিণত হয়। চিন্তামণি গ্রন্থের আশ্রয়ে প্রথম টীকাগ্রন্থ হল পক্ষধরমিশ্রের *আলোক* টীকা। তবে মণিগ্রন্থের রহস্য উদঘাটনের জন্য নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম *সার্বভৌমনিরুক্তি* নামক একটি টীকা প্রণয়ন করেন, এরপর থেকে বঙ্গদেশে ক্রমে নব্যন্যায়ের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

‘স্বয়ঞ্চ সার্বভৌমনিরুক্তিং নাম মণীগ্রন্থস্য টীকাং প্রণীয় বঙ্গেষু শিষ্যান-ধ্যাপয়িতুমারেভে তদনন্তরং বঙ্গেষ্বেব নব্যন্যায়স্য সম্প্রদায়ঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ সমজনিষ্ঠ। ক্রমেণ মণিগ্রন্থমবলম্ব্য বঙ্গেষু পরেঽপি বহবো ব্যাখানকৃতঃ সমজায়ন্তেতি কেচন প্রবদন্তি’।[৫৮]

এরপর *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের উপর রঘুনাথ-শিরোমণি সুবিখ্যাত *দীধিতি* টীকা রচনা করলে এই মূল *দীধিতি* গ্রন্থের আশ্রয়ে রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ্ রচনা করেন। *দীধিতি* টীকার সুগভীর বিপুলার্থ পরিষ্কার করার জন্য বঙ্গের নৈয়ায়িকেরা তাদের স্বকীয় প্রতিভা দিয়ে নানান টীকাগ্রন্থ্ রচনা করতে থাকে। এই *দীধিতি* টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার, গদাধর ভট্টাচার্য অন্যতম। তর্কাচার্য মহাশয় এ বিষয়ে বলেছেন-

'অথ দীধিতেরতিগভীরার্থায়াঃ স্বল্পসংস্থানায়াঃ নিঃশেষার্থবোধে তথাবিধ-সংক্ষিপ্ত-টীকামপর্য্যাপ্তাং মন্যমানাঃ শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ-মথুরানাথতর্কবাগীশ-জগদীশতর্কালংকার-গদাধরভট্টাচার্য-প্রমুখাস্তার্কিকবিপশ্চিদপশ্চিমাস্তথা.....'।[৫৯]

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ হলেন *দীধিতি* টীকার প্রথমদিকের টীকাকার, তার টীকার নাম *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ*। এই *প্রকাশ* টীকার উপর আবার উপটীকা রচিত হয়েছে, মহারাষ্ট্রীয়দেশীয় নৈয়ায়িকপ্রবর মহাদেবভট্ট *সর্বোপকারিণী* নামক একটি উপটীকা রচনা করেন। এ থেকে সহজেই অনুমেয় ভবানন্দের *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ* টীকার জনপ্রিয়তা।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল বঙ্গদেশে ভবানন্দের টীকার জনপ্রিয়তা বা পঠনপাঠন লুপ্ত হয়। *মাথুরী* ও *গাদাধরী* টীকাদির সাথে ভবানন্দের রচিত গ্রন্থ্ ম্লান হয়ে পড়ে। আচার্য মহাশয় বলেছেন-

'দেশান্তরেষু সত্যপি দীধিতিপ্রকাশস্য ভবানন্দীয়স্য তথা ভূয়সি প্রচারে বঙ্গেষু কিমিতি তস্য নোপজাতস্তথা প্রচার ইত্যত্র কারণমনুসন্ধেয়ম্। বয়ং মন্যামহে- শ্রীভবানন্দ-সিদ্ধান্ত-বাগীশাদনন্তরং শ্রীজগদীশতর্কালংকারঃ শ্রীগদাধরভট্টাচার্যশ্চ সুতরামুত্কৃষ্টগুণে

দীধিতিব্যাখ্যানে প্রণীতবন্তৌ, ততঃ স্বপ্রবর্ত্তিতেষু সম্প্রদায়েষু দীধিতিপ্রকাশমপাস্য প্রশস্তিপ্রতিপাদনপুরঃসরং তাভ্যাং স্বস্বটীকায়া এব ভৃশং প্রচারণেন সহৈব চ স্বব্যাখ্যানেষ্বন্তরা প্রকাশপক্ষপ্রতিক্ষেপেণ দীধিতিপ্রকাশস্য বহুলঃ প্রচারো বঙ্গেষু ব্যাহতিমাপেদে'।[৬০]

তর্কাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থটি যে ক্রমে সম্পাদনা করেছেন তা বলতে গিয়ে বলেছেন – প্রথমে *তত্ত্বচিন্তামণি*র মূল তারপর তদনুগত *দীধিতি* টীকা, তদনুগামী দীধিতি প্রকাশ, পাঠান্তর, স্বকৃত পদটিপ্পণী। *দীধিতিপ্রকাশ* টীকাগ্রন্থটি পুঁথি থেকে সম্পাদনা করা হয়েছে, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে হস্তলিখিত পুস্তকদ্বয়, সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারের পুস্তকদ্বয় এবং সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একটি অখণ্ড *অনুমানদীধিতিপ্রকাশ* গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এই গ্রন্থের 'ভবানন্দাদিবৃত্তরেখা' ভূমিকা রচনা করতে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের *ন্যায়পরিচয়* ও অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা* গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিয়েছেন বলে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'দীধিতি-প্রকাশাদপাঠান্তরবিষয়ে কলিকাতা এশিয়াটিক-সোসাইটী-গ্রন্থালয়-সংরক্ষিতং হস্তলিখিতঃ পুস্তকদ্বয়ং, কলিকাতা-রাষ্ট্রিয়সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়-গ্রন্থাগাররক্ষিতং গ্রন্থদ্বয়ং, কলিকাতা-সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্-গ্রন্থাগারগতং বঙ্গাক্ষর-লিখিতমখণ্ডমেকমনুমান-দীধিতি-প্রকাশপুস্তকঞ্চ কেবলমত্র মে সাহায্যং ব্যধত্ত'।..... প্রকৃত শ্রীভবানন্দাদিবৃত্তরেখা নিবন্ধনিবন্ধনে সুমহদুপকৃতং নো মহামহোপাধ্যায়-ফণিভূষণ-তর্কবাগীশকৃতন্যায়পরিচয়গ্রন্থেন দীনেশচন্দ্রভট্টাচার্য্য-কৃতেন চ বঙ্গে-নব্যন্যায়চর্চেত্যাখ্যেন গ্রন্থেন'।[৬১]

৭. *ন্যায়দর্শনবিন্দু (প্রবচনত্রয়ী)* – বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে তর্কাচার্য মহাশয় কর্তৃক *ন্যায়দর্শন* বিষয়ক তিনটি প্রবচন :-

১৯৬৪ সালে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যক্ষীয় তিনটি প্রবচন বা বক্তৃতার সমাহার। এই বক্তব্যগুলি *প্রবচনত্রয়ী* নামে পরবর্তিকালে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথমে প্রবচনগুলি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। কাশীর সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক সংস্কৃত পত্রিকা হল *সারস্বতী সুষমা* । 'সারস্বতী' পদটির অর্থ হল সরস্বতী বা বিদ্যাসম্বন্ধীয়, আর *অমরকোষে* 'সুষমা' পদটির অর্থ হল পরমা শোভা। অতএব বিদ্যাসম্বন্ধীয় পরমা শোভা যেখানে বিরাজমান তাই হল *সারস্বতী সুষমা*।

এই পত্রিকাটির উক্ত সংখ্যার (১৯ বর্ষ, ৪ অঙ্ক, সংবত্ ২০২১) সম্পাদক ছিলেন শ্রীসুরতিনারায়ণমণিত্রিপাঠী। এই সংখ্যার পূর্বে ১-৩ সংখ্যার পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এক বছরে এই পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ সালে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যক্ষীয় তিনটি প্রবচন বা বক্তৃতার সমাহার। অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুরের *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য* নামক একটি প্রবন্ধে বলেছেন-

বারাণসেয়সংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনপরিষদের আমন্ত্রণে আচার্যদেব কয়েকটি বক্তৃতা দান করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যামহাসম্মেলনের পণ্ডিতপরিষদে তিনি সভাপতিত্ব করেন। পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গঙ্গানাথঝা স্মৃতি বক্তৃতা দান করেন।[৬২]

প্রবচনের বিষয়গুলি হল- ক.'নব্যন্যায়পারিভাষিকপদার্থাঃ', খ. 'ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনয়োঃ পৃথগ্-দর্শনত্বম্', গ. 'প্রাচীনন্যায়-নব্যন্যায়য়োঃ সৈদ্ধান্তিকং পৃথকত্বম্'।

এই তিনটি প্রবচনের তারিখগুলি হল – **২১.১২.১৯৬৪, ২১.১২.১৯৬৪, ২২.১২.১৯৬৪**। এই বক্তব্যত্রয় প্রদান করার পূর্বে স্বভাবকবি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় গঙ্গার তীরে বারাণসী নগরীর পবিত্র বিশ্বনাথ ধামের কথা স্মরণ করে স্বকীয় অনবদ্য মঙ্গলশ্লোক রচনা করেছেন, শ্লোকটি হল –

গঙ্গাতরঙ্গনিকরৈর্মুখরোত্তমাঙ্গং
ভূত্যা সিতং দলিতভূতিবিশেষসঙ্গম্।
জ্ঞানেশ্বরং তিমিরভারহরং সদারং
শ্রীবিশ্বনাথমভয়ং সভয়োঽহমীড়ে।।
কেদারেশ্বরমাশ্রয়ে গণপতিং বিঘ্নৌঘবিদ্রাবণং
পুণ্যাঙ্কাং মণিকর্ণিকামভয়দাং দুর্গা তথৈবান্নদাম্।
কাশ্যামত্র মহেশ্বরস্য নগরে যাশ্চাপরা দেবতা
স্তাভ্যো মেঽস্তু নমো নমঃ পরিষদে চাস্মৈ বিনীতস্য মে।।[৬৩]

ক. প্রথম প্রবচন 'নব্যন্যায়পারিভাষিকপদার্থাঃ' – অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এই প্রবচনের পূর্বে পরিভাষাতত্ত্ব-প্রকরণ আলোচিত হয়েছে, যেটি কিনা **১৯৬১** সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়। তবে সেটি বঙ্গভাষায় আর এখানে সংস্কৃত ভাষায় একই শোধ নিবন্ধের অনুবাদ করা হয়েছে। এখানে পূর্বের মত প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, অবচ্ছেদকতা, অধিকরণতা প্রভৃতি পরিভাষা নিয়ে নৈয়ায়িক মত সম্বলিত সংস্কৃত ভাষায় একটি আলোচনা করা হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় প্রবচন 'ন্যায়বৈশেষিকদর্শনয়োঃ পৃথগ্-দর্শনত্বম্'- এই প্রবচনে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সমানতান্ত্রিক হলেও এই দুই দর্শনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে তা আলোচনা করেছেন। এই পার্থক্যগুলি হল- প্রমাণচিন্তা, পদার্থচিন্তা, পাকজোৎপত্তি,

সমবায়ের প্রমাণসিদ্ধি, লিঙ্গস্বীকার প্রসঙ্গে এবং হেত্বাভাস নিরূপণে, সংশয়ের প্রকারবিষয়ে, দ্বিত্ব ও বিভাগজ বিভাগ প্রসঙ্গে প্রতিপাদিত হয়েছে।

প্রত্যেক দর্শন নানা প্রস্থানে বিভক্ত হলেও সকল দর্শনের চরম লক্ষ্য হল নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভ। সুতরাং জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হল সকল দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং সকল দর্শন গ্রন্থেই তত্ত্বের দিক থেকে ভেদ প্রতিপন্ন হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'বিভিন্না দর্শনশাস্ত্রকারাঃ বিভিন্নপ্রস্থানানি বিভিন্নানি দর্শনানি নির্মায় বিভিন্নরূপতত্ত্বোপদেশেন জীবানাং তত্ত্বজ্ঞানমুত্পাদ্য দুঃখপঙ্কনিমগ্নানাং তেষামাত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিং সাধয়ন্তি। প্রতিদর্শনং বিভিন্নানি তত্ত্বানি। তান্যেব দর্শনশাস্ত্রাণাং মিথো ভেদং নির্বর্তয়ন্তি'।[৬৪]

এরপর ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে উভয়দর্শনের প্রমাণচিন্তার কথা বলা হয়েছে, যেহেতু নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞানহেতু ন্যায় দর্শনে ১৬ টি পদার্থ এবং বৈশেষিক দর্শনে ৭ টি পদার্থের বক্তব্য প্রতিপাদিত হলেও পরবর্তিকালে *ভাষাপরিচ্ছেদ* ইত্যাদি গ্রন্থে এই বৈষম্যের সমাধান করে সিদ্ধান্ত বলা হয়েছে'এতে চ পদার্থাঃ বৈশেষিকে প্রসিদ্ধাঃ, নৈয়ায়িকানামপ্যবিরূদ্ধাঃ, প্রতিপাদিতশ্চৈব ভাষ্যে'।

সমবায়ের স্বীকারে উভয়দর্শনের মতপার্থক্য আলোচিত হয়েছে, ন্যায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষবেদ্য হলেও বৈশেষিকমতে সমবায় অনুবেদ্য। *ভাষাপরিচ্ছেদ*কারের মত উত্থাপন করে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'তস্য তথাভূতস্য সমবায়স্য প্রত্যক্ষবিষয়ত্বমিতি নৈয়ায়িকাঃ। তদুক্তং কারিকাবল্যাং বিশ্বনাথেন-'প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেত্' ইতি।.... বৈশেষিকাস্তু তস্য সমবায়স্য প্রত্যক্ষবিষয়ত্বং নানুমন্যন্তে। তদুক্তং মুক্তাবলীকারেণ-'বৈশেষিকমতে তু সমবায়ো ন প্রত্যক্ষঃ' ইতি'।[৬৫]

পাকজোৎপত্তি বিষয়ে উভয়দর্শনের মধ্যে মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, নৈয়ায়িকেরা অবয়বে পাক স্বীকার করলেও বৈশেষিক দার্শনিকেরা পরমাণুতে পাক স্বীকার করেন তাই নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কে পিঠরপাকবাদী ও বৈশেষিক সম্প্রদায়কে পীলুপাকবাদী বলা হয়। আচার্য মহাশয় বলেছেন-

'আমঘটাদীনাং পাকার্থে বহ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্তানাং পাককর্মণি বৈশেষিকাঃ পীলুপাকমঙ্গীকুর্বন্তি, নৈয়ায়িকাশ্চ পিঠরপাকম্'।[৬৬]

এই উভয়মতের মধ্যে তর্কাচার্য মহাশয় ন্যায়সম্প্রদায়ের মতকে লাঘব বলে প্রতিপন্ন করে বলেছেন-

'প্রথমোক্তরীত্যা পীলুপাকমঙ্গীকুর্বতাং বৈশেষিকাণাং মতাপেক্ষয়াঽনন্তরোক্ত-নৈয়ায়িক-সম্মতপিঠরপাকমতে মহালাঘবাদিকং দৃশ্যতে। তথাহি বৈশেষিকাণাং পীলুপাকসিদ্ধান্তে পূর্ব্বব্যূহনাশঃ পশ্চিমস্য ব্যূহান্তরস্য সমুত্পাদঃ। তদনুরোধেন তত্প্রাগভাবাদিকল্পনা, পশ্চিমব্যূহে পূর্ব্বব্যূহভেদ ইত্যাদিকম্, তথা তদনুষঙ্গতঃ পশ্চিমব্যূহে সোঽয়মিত্যাদিরূপায়াঃ পূর্ব্বব্যুহাভেদাবগাহিন্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞায়া ভ্রমত্বাদিকং কল্পনীয়মিতি সুমহদ্ গৌরবম্। নৈয়ায়িকমতে তু তত্তদকল্পনাত্ সুতরাং লাঘবম্, তদেবংবিধবৈষম্যমপি ন্যায়বৈশেষিকদর্শনয়োর্মিথঃপৃথকত্বে বীজম্'।[৬৭]

পরবর্তী আলোচনায় প্রমাণচিন্তা বিষয়ে বরদরাজ *তার্কিকরক্ষার* সকল দর্শনে প্রমাণস্বীকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ন্যায়দর্শনে চারপ্রকার প্রমাণ ও বৈশেষিকদর্শনে দ্বিবিধপ্রমাণ স্বীকারের প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচনা করে পরিশেষে ন্যায়সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবার লিঙ্গস্বীকার প্রসঙ্গে উভয়দর্শনের মতপার্থক্য প্রতিপাদন করতে গিয়ে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'পঞ্চরূপাণি চ তানি পক্ষসত্ত্ব-সপক্ষসত্ত্ব-বিপক্ষাসত্বাবাধিতত্বাসত্প্রতিপক্ষিতত্বানি'.... বৈশেষিকাস্তু ত্রিরূপস্যৈব লিঙ্গস্য সাধ্যগমকতৌপয়িকত্বং স্বীকুর্বন্তি। ত্রীণি রূপাণি চ তেষাং পক্ষসত্ত্বং সপক্ষসত্ত্বং বিপক্ষাসত্ত্বং চেতি'।[৬৮]

এই বিষয়টি স্পষ্ট যে ন্যায়দর্শনে পাঁচটি লিঙ্গ স্বীকার করা হলেও বৈশেষিক দর্শনে ত্রিবিধ লিঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে। ফলত হেত্বাভাস স্বীকারের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, ন্যায়দর্শনে পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের কথা বললেও বৈশেষিকদর্শনে অসিদ্ধ, অনৈকান্তিক ও বিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ হেত্বাভাস স্বীকার করা হয়েছে।

উপসংহারে উভয়দর্শনের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে তর্কাচার্য মহাশয় প্রচলিত আভানক স্মরণ করিয়ে বলেছেন-

দ্বিত্বে চ পাকজোত্পত্তৌ বিভাগে চ বিভাগজে।

যস্য ন স্খলিতা বুদ্ধিস্তং বৈশেষিকং বিদুঃ।।[৬৯]

এইভাবে সমগ্র প্রবচনে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের বৈষম্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রতিপাদিত হয়েছে।

গ. তৃতীয় প্রবচন ‘প্রাচীনন্যায়নব্যন্যায়য়োঃ সৈদ্ধান্তিকং পৃথকত্বম্’- এই প্রবচনে এবার প্রাচীনন্যায় ও নব্যন্যায়ের মধ্যে বৈষম্য আলোচনা করেছেন তর্কাচার্য মহাশয়। এই প্রবচন আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

প্রাচ্যন্যায়ে তথা নব্যন্যায়ে সিদ্ধান্তগোচরম্।

যত্ পৃথকত্বং সমুদ্ভূতং তদত্র পরিকীর্ত্যতে।।[৭০]

এরপর ন্যায়শাস্ত্রের প্রশংসাপূর্বক প্রাচীনন্যায় সম্প্রদায়, নব্যন্যায় সম্প্রদায়, প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের সময়কালের কথা বলে উভয় দর্শনের বৈষম্য প্রতিপাদন করতে গিয়ে আচার্য মহাশয় বলেছেন-

‘যদ্যপি প্রাচীনন্যায়মুপজীব্যৈব প্রবৃত্তিরজনিষ্ট নব্যন্যায়স্য, তথাপি সমীক্ষাবিশেষবশাত্ ক্বচিত্ ক্বচিত্তয়োঃ সিদ্ধান্তে কিঞ্চিত্ কিঞ্চিত্ পার্থক্যং সমজনিষ্ট। তদ্যথাপ্রতিভানং প্রতিপাদয়িতুং প্রযত্নং কুর্বে’।[৭১]

প্রথমেই বৈষম্য বোঝাতে গিয়ে করণ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, কারণ এই করণের আলোচনার উপর বহুবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যা নির্ভর করছে। যেমন প্রাচীনন্যায়ে অনুমানের করণ বলতে লিঙ্গপরামর্শ জ্ঞানকে এবং নব্যন্যায়ে অনুমানের করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে বলা হয়েছে। এখানে উভয় মতের বৈষম্য হয়েছে করণের ভিন্নতা অনুসারে, প্রাচীনমতে – ফলযোগব্যাবচ্ছিন্নং কারণং করণম্, নব্যমতে-‘ব্যাপারবত্ কারণং করণম্’। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

‘তথাহি অন্নংভট্টেন তর্কসংগ্রহগ্রন্থে ‘অনুমিতৌ ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণং পরামর্শশ্চ ব্যাপারঃ’ ইতি প্রসিদ্ধং সিদ্ধান্তমনভ্যুপেত্য ‘ফলযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্’ ইত্যেতন্মতমুপজীবৈব লিঙ্গপরামর্শস্যানুমিতৌ করণত্বমুপদিষ্টম্। যথা স্বার্থানুমিতি-

পরার্থানুমিত্যোর্লিঙ্গপরামর্শ এব করণম্। তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানম্ ইতি। তত্রৈব দীপিকাখ্য-টীকায়াম্ উক্তম্-'ব্যাপারবত্ কারণং করণমিতি মতে পরামর্শদ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণম্'।[৭২]

নব্যন্যায়ে এই 'ব্যাপারবত্ কারণং করণম্' ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করে অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণের কারণ ও করণ এবং ব্যাপার আলোচিত। যেমন *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে অনুমানপ্রকরণে 'ব্যাপারস্তু পরামর্শ করণং ব্যাপ্তিধীভবেত্, উপমানপ্রকরণে-'সাদৃশ্যধীর্গবাদীনাং যা স্যাত্ সা করণং মতম্, শব্দপ্রকরণে-'পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ' ইত্যাদি। প্রাচীনন্যায়ে তেমন আলোচনা পরিদৃষ্ট হয় না।

এ ছাড়া এই প্রবচনে তর্কাচার্য মহাশয় পক্ষতার লক্ষণবিষয়ে, প্রকরণসম হেত্বাভাসবিষয়ে, পদস্বরূপবিষয়ে, মঙ্গলাচরণের ফলবিষয়ে, বিশেষ পদার্থ স্বীকারে, ধাত্বর্থনির্ণয়ে, যে প্রাচীনন্যায় ও নব্যন্যায়ের মধ্যে মতবৈষম্য রয়েছে তা প্রতিপাদন করেছেন। উপসংহারে বলেছেন-

দিঙ্মাত্রমেতত্ প্রতিপাদিতং ময়া বিশেষতো ধীবিভবৈঃ সমীক্ষ্যতাম্।
গবেষণাসাধনয়া নয়দ্বয়ে ধ্রুবং বিশেষান্তরমপ্যবাপ্স্যতে।।[৭৩]

৮. জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য বিরচিত *শব্দার্থসারমঞ্জরী* গ্রন্থ ও স্বকৃত *সারদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা :-

শাব্দিক শিরোমণি জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য বিরচিত *সারমঞ্জরী* গ্রন্থটি মুখ্যত ব্যাকরণশাস্ত্রের সহায়ক পাঠ্য হলেও গ্রন্থকারের বিশেষণটির দ্বারাই অনুমিত হয় যে, তিনি ন্যায়তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গম তথা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেকারণে তাঁর গ্রন্থটিতে ব্যাকরণের কারকাদি বিষয়গুলিকে ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে বিচার করা হয়েছে। তবে গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে

বর্তমানে প্রায় অজ্ঞাত পরিচয় লেখক সম্পর্কে যে যৎকিঞ্চিৎ তথ্য পাওয়া যায়, তা উদ্ধার করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

৮.১ জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য পরিচিতি :-

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি নৈয়ায়িক জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্যের নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই বাঙালির মন থেকে কিভাবে মুছে গেল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে সৌভাগ্যবশত জয়কৃষ্ণের রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে *শব্দার্থসারমঞ্জরী* যা সংক্ষেপে *সারমঞ্জরী* নামে পরিচিত, সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত তথা ক্ষুদ্রগ্রন্থখানি দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কৃত টোলবিভাগে ব্যাকরণের উপাধির পাঠক্রমে নির্ধারিত থাকায় তার মাধ্যমে জয়কৃষ্ণ নামটি পশ্চিমবাংলার মাটিতে এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত *শব্দার্থসারমঞ্জরী* কেবল *সারমঞ্জরী* — এই সংক্ষিপ্ত নামেই যেমন পরিচিত অনুরূপ গ্রন্থকারের নাম ও কেবল শাব্দিক শিরোমণি জয়কৃষ্ণ বলেই উল্লিখিত আছে।

এই জয়কৃষ্ণ এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের *শব্দার্থসারমঞ্জরীর* কারিকাংশ মাত্র – যা *কারকচক্রম্* নামে সুপ্রচারিত, সেই গ্রন্থটির এবং জগদীশের *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের সারসংকলন করে তিনি সমসাময়িককালে যেরূপ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা আজও বাঙালির গর্বের বিষয়। এরূপ গর্ব ও গৌরব যাঁর মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করেছিলেন, সেই মানুষটিকে এবং তাঁর অসাধারণ সারস্বত কৃতিগুলি আজ বিস্মিত হয়ে গেছে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। শাব্দিকশিরোমণি জয়কৃষ্ণ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ন্যায়শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসাবে মহামহোপাধ্যায় ও তর্কাচার্য উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়ে বাংলা তথা বাঙালির গৌরববর্ধন করেছিলেন।

৮.২ *সারমঞ্জরী* গ্রন্থপরিচয় :-

সারমঞ্জরী এই নামের ব্যাখ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় *সারদীপিকা* টীকায় বলেছেন-'সারস্য স্থিরাংশস্য উৎকৃষ্টভাগস্য ইত্যর্থঃ, মঞ্জুরী কারণীভূতবস্তু বিশেষঃ, তথাহি যথা প্রথমতো মঞ্জরী জাতা অনন্তরং ক্রমেণ সৈব বৃক্ষস্য সারবত্তামনুকূলয়তি তথৈব অয়ং গ্রন্থঃ ব্যুত্পত্তিবিশেষলাভে উপযোগিতাং গমিষ্যতীতি নাম তাত্পর্য্যম্'।[৭৪]

অতএব মঞ্জরী শব্দের অর্থ হল অঙ্কুর। আর সারস্য শব্দের অর্থ হল স্থিরাংশের বা উৎকৃষ্টাংশের মঞ্জরী-অঙ্কুর উদ্গত হয়। তারপর সেটি বৃক্ষের আকার ধারণ করে। তেমনি এই গ্রন্থের পাঠ ব্যুৎপত্তিবিশেষ লাভে উপযোগিতা দান করবে।

শব্দার্থসারমঞ্জরী বা *সারমঞ্জরী* ব্যাকরণশাস্ত্রের একটি অতি ক্ষুদ্রাকার সহচর গ্রন্থ হলেও বিষয় গাম্ভীর্যে এক বিশাল গ্রন্থসমৃদ্ধির সমকক্ষ। এর বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, ব্যাকরণের প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে ন্যায়ের আলোকে বিচার করে সঙ্গতিস্থাপন করেছেন। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের *কারকচক্র* গ্রন্থখানিও ন্যায়সম্মতভাবে রচিত, কিন্তু তিনি কেবল কারক সম্পর্কেই বিশ্লেষণ করেছেন এবং বহুস্থলে বৈয়াকরণদের অভিমতকে নস্যাৎ করেছেন। সেদিক থেকে *সারমঞ্জরীর* পরিক্রমা অনেক বিস্তৃত। *সারমঞ্জরীতে* অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ নামে কোনরূপ বিভাজন না থাকলেও বিষয়বস্তুর বিন্যাস অনুসারে এর মধ্যে ১৬৬টি বৃত্তির দ্বারা ৪৯টি বিষয় ভিত্তিক বিভাগ উল্লেখহীনভাবে নিহিত আছে। যেমন প্রথম আলোচ্য কালনিরূপণ। আর শেষ বিষয় একাদি সংখ্যাবিচার। *সারমঞ্জরী* গ্রন্থে আর একটি লক্ষ্যণীয় তত্ত্ব হল – এখানে বিষয়গুলিকে ন্যায়সম্মত বিচারের সাহায্যে বৈয়াকরণের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রন্থটিতে কাল থেকে আরম্ভ করে লকারার্থ, কৃৎ প্রত্যয়,

কারক সমাস, সর্বনাম, অব্যয়, শক্তিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের অবান্তর ভাগ নিয়ে (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) ৪৯টি আলোচ্য বিষয় আছে।

৮.৩ *সারদীপিকা* টীকাগ্রন্থ প্রকাশকাল ও প্রকাশস্থান :-

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক মহামহোপাধ্যায় তর্কাচার্যের গ্রন্থের উপর রচিত বিংশ শতাব্দীর আর এক মহামহোপাধ্যায় তর্কাচার্যের টীকাখানি এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং 'মণিকাঞ্চনযোগের' সৃষ্টি হয়েছে। ন্যায় ও ব্যাকরণে সমান দক্ষতা থাকলেই এই জাতীয় গ্রন্থের উপর টীকা প্রণয়ন করা যায়।

১৯৯৭ সালে পরবর্তিকালে প্রকাশিত *সারমঞ্জরী* গ্রন্থের ভূমিকা অংশে এই গ্রন্থের প্রশংসা করতে গিয়ে আচার্য পদ্মশ্রী রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেছেন –

'ব্যাকরণের ক্ষেত্রে *সারমঞ্জরী* টীকাগ্রন্থ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গ্রন্থকার গ্রন্থে প্রতিটি তত্ত্বের যথাযথ লক্ষণ প্রদর্শন করেছেন। তর্কের জটিল পথ অবলম্বন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন্যায়দর্শন ও ব্যাকরণকে একই বৃন্তে বিস্ময়করভাবে বিকশিত করেছেন। এ গ্রন্থের অনুবাদ ও বিশ্লেষণ তিনিই করতে পারেন যাঁর ন্যায় ও ব্যাকরণে স্বচ্ছন্দ পদসঞ্চরণ'।[৭৫]

শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের সাথে তর্কাচার্য মহাশয় ১৯৩৫ সালে ছাত্র পুস্তকালয় থেকে গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তবে এই গ্রন্থের আলোচনায় ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যা পদ্ধতি স্পষ্ট। মূল গ্রন্থটি অষ্টম শতকের শেষে রচিত হয়েছিল। কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থের উপর *সারদীপিকা* নামে একটি টীকা রচনা করেন। টীকাগ্রন্থের প্রারম্ভে তর্কাচার্য মহাশয় মঙ্গলাচরণ করে বলেছেন –

নানাযোগবিধানতো মুনিগণৈরারাধিতামন্বহং

সবার্থপ্রতিদানকল্পলতিকাং সংগ্রামলীলাবতীম্।।

কৈলাসেশ্বরবিভ্রমপ্রণয়িনীং ব্যামোহবিধ্বংসিনীং

শক্তিং কামপি ভক্তিযুক্তমনসা নিত্যং ভজে শাশ্বতীম্।।

নত্বা শক্তিপদদ্বন্দ্বমপ্রতিদ্বন্দ্বি সুন্দরম্।।

অজ্ঞানতিমিরধ্বংসি কংসসূদনবন্দিতম্।।

তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীহরিদাসহিজাত্মজঃ।

কোটালিপার-নগরপ্রভবঃ কাশ্যপান্বয়ঃ।।

শ্রীকালীপদশর্মায়ং তর্কাচার্য্যোপনামকঃ।

ব্যাখ্যাং প্রতনুতে সারমঞ্জর্য্যাঃ সারদীপিকাম্।।

হে সন্তঃ করুণাধীনা দীনস্য বচনেষ্বমী।

পদে পদে দোষান্ কৃপয়া জ্ঞাপযন্তু নঃ।।[৭৬]

৮.৪ *সারদীপিকা* টীকাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য :-

তর্কাচার্য রচিত এই টীকাগ্রন্থে প্রতি শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য মহাশয় গ্রন্থের প্রথমেই মঙ্গলাচরণ করে বলেছেন-

হেরম্বচরণদ্বন্দ্বং বিঘ্ননাশকরং পরম।

প্রণম্য জয়কৃষ্ণেন ক্রিয়তে *সারমঞ্জরী*।।[৭৭]

অতএব বিঘ্নবিনাশকারী গণেশের উৎকৃষ্ট চরণযুগল প্রণাম করে (গ্রন্থকার) জয়কৃষ্ণ *সারমঞ্জরী* রচনা করছেন। তর্কাচার্য মহাশয় এই শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রথমেই বলেছেন-

‘প্রারিপ্সিতবস্তুসমাপ্তিপ্রতিবন্ধকীভূতবিঘ্নবিধ্বংসনকারণীভূতাং গণপত্যাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য প্রণতিং শিষ্যাণামবধানায় প্রতিজ্ঞারূপাং গ্রন্থকৃত্ নিবধ্নাতি – হেরম্বেত্যাদি।

বিঘ্নেতি — বিঘ্নঃ অভীষ্টবস্তুসিদ্ধিপ্রত্যূহভূতদুরিতরূপঃ, তস্য নাশকরং ধ্বংসকারণম্ এতেন প্রণামে হেতুর্দ্দর্শিতঃ, অভীষ্টবস্তুসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকীভূতবিঘ্ননাশস্যাপি ইষ্টত্বাত্ তত্সাধকতয়া হেরম্বচরণদ্বন্দ্বস্য তত্প্রণামেঽপি প্রবৃত্তিঃ সফলা প্রণামবিষয়তয়া এব হেরম্বচরণদ্বন্দ্বস্য অভীষ্টসাধকত্বাত্ ন স্বরূপত এবেতি'।[৭৮]

অতঃপর আচার্য মহাশয় প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, সকল দেবতা থাকতে গণেশের স্তুতি এখানে করার কারণ কি, সেই প্রশ্নের উত্তর *সারদীপিকা* টীকাতে দিয়েছেন- 'ননু কথমন্যান্ দেবান্ পরিত্যজ্য হেরম্বচরণস্তুতিঃ প্রস্তুতেত্যাকাঙক্ষায়ামাহ - পরমিতি, পরম্ উৎকৃষ্টং তথাহি বিঘ্ননাশং প্রতি দেবতান্তরাপেক্ষয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিঘ্নরাজ হেরম্বস্যৈব সমুত্কর্ষাত্ তত্প্রণাম এব স প্রয়োজন ইতি'।[৭৯]

প্রণম্য এই শব্দের টীকায় তর্কাচার্য মহাশয়ের অভিমত -

'প্রণম্য স্বাবধিকোত্কর্ষবত্তয়া জ্ঞাপয়িতা, প্রপূর্ব্বনমধাত্বর্থস্য স্বাবধিকোত্কর্ষবত্তয়া জ্ঞাপনরূপত্বাত্, দ্বিতীয়ায়া বিষয়ত্বং বিষয়িত্বং বা অর্থঃ, স চ নিরূপকত্বসম্বন্ধেন স্বরূপেণ বা প্রণামপদার্থৈকদেশে জ্ঞানে অন্বয়ঃ। যপ্-প্রত্যয়স্য আনন্তর্য্যমর্থঃ, তথাচ উক্তবিশেষণ-দ্বয়বিশিষ্টহেরম্বচরণদ্বন্দ্ববিষয়ক- স্বাবধিকোত্কর্ষপ্রকারকজ্ঞানানুকূলব্যাপারানন্তরমিত্যর্থঃ'।[৮০]

তিনি আবার পরিশেষে মঙ্গলাচরণ শ্লোকের শাব্দবোধ প্রতিপাদন করে বলেছেন-

'নমস্কারশ্লোকস্য নিকৃষ্টশাব্দবোধো যথা — উত্কর্ষবিশিষ্ট-বিঘ্নধ্বংসহেতুভূত-হেরম্বচরণ- দ্বন্দ্ববিষয়কস্বাবধিকোত্কর্ষ-প্রকারক- বোধানুকূল –ব্যাপারনন্তরত্ব বিশিষ্ট-জয়কৃষ্ণবৃত্তি কৃতিপ্রযোজ্য-শিষ্যসমবেত-বোধানুকূলব্যাপারবিষয়তবতী সারমঞ্জরীতি'।[৮১]

৯. তর্কাচার্যকৃত *অক্ষপাদদর্শন* গ্রন্থাশ্রয়ে *পাদপ্রদীপ* ব্যাখ্যাসহ সম্পাদনা :-

১৯৭৫ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটি আসলে সায়ণমাধবকৃত সর্বদর্শনসংগ্রহের *অক্ষপাদদর্শন*। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন – 'অক্ষপাদ শব্দটি মহর্ষি গৌতমের নামান্তর। অতএব মহর্ষি গৌতম প্রণীত *ন্যায়দর্শন* হল *অক্ষপাদ দর্শন* পদের অর্থ'।

পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তারানাথ তর্কবাচস্পতির পৌরাণিক মত উল্লেখ করে বলেছেন- 'গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গৌতমের শিষ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস একসময় গৌতমের মতের নিন্দা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর এ চক্ষুর দ্বারা উহার মুখ দর্শন করব না। শেষে বেদব্যাস স্তুতির দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করে যোগবলে নিজচরণে চক্ষু সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদব্যাসকে দর্শন করে। তখন বেদব্যাস অক্ষপাদ নামোল্লেখে তাঁহার স্তুতি করায় তিনি তখন হইতে অক্ষপাদ নামে অভিহিত হন'।[৮২]

মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব অভ্যঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত সর্বদর্শনসংগ্রহের *দর্শনাঙ্কুর* টীকায় অক্ষপাদ প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন-

'গৌতমো হি স্বমতদূষকস্য ব্যাসস্য মুখদর্শনং চক্ষুষা ন কর্তব্যমিতি প্রতিজ্ঞায় পশ্চাদ্ ব্যাসেন প্রসাদিতঃ পাদে নেত্রং প্রকাশ্য তং দৃষ্টবান্। ততঃপ্রভৃত্যস্যাক্ষপাদনাম্না প্রসিদ্ধিরভূত্'।[৮৩]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় তার সম্পাদিত গ্রন্থের অনুরূপ স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে এই গ্রন্থের একটি *পাদপ্রদীপ* ব্যাখ্যা রচনা করেন বঙ্গভাষায়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থের প্রাককথন অংশে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন –

‘পরমপূজ্যপাদ আচার্যপ্রবর স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের তিরোধানের (১৯৭২ সাল) কিছুকাল পূর্বে মাধবাচার্য প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধ *সর্বদর্শনসংগ্রহের* অন্তর্গত *অক্ষপাদদর্শন* বিষয়ক পরিচ্ছেদের বঙ্গভাষায় অনুবাদ এবং বিস্তৃত বিবৃতি প্রণয়নের জন্য তাঁহার নিকট নিবেদন করি। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্নতা ও ঔদার্য্যের সহিত মদীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে উক্ত পরিচ্ছেদের সটীক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করিয়া মুদ্রণের জন্য আমার হস্তে সমর্পণ করে। বঙ্গদেশের সংস্কৃতসেবিসম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যবশত ইহার অল্পকাল পরে তর্কাচার্য মহাশয়ের তিরোধান ঘটায় তাঁহার জীবদ্দশায় অক্ষপাদ দর্শনের সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নাই’।[৮৪]

তবে এই গ্রন্থটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় পূর্বে *Our Heritage* সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের মুখপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তিকালে এই নিবন্ধগুলিকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় বলেছেন- ‘সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের মুখপত্র *Our Heritage* এ (Vol. XVIII, P.II & VOL. XIX, P.I) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর এক্ষণে উক্ত অনুবাদ একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল’।

যাইহোক কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের এই *পাদপ্রদীপ* ব্যাখ্যাগ্রন্থে অক্ষপাদ দর্শনের বঙ্গভাষায় যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা অত্যন্ত সাবলীল ও যথার্থ বলে মনে হয়। মাধবাচার্যের পঙ্‌ক্তি ধরে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

অক্ষপাদ দর্শন আরম্ভ হচ্ছে 'তত্ত্বজ্ঞানাদ্ দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদলক্ষণং নিঃশ্রেয়সং ভবতীতি সমানতন্ত্রেঽপি প্রতিপাদিতম্' এই বলে। এই অংশের তর্কাচার্য মহাশয়ের অনুবাদে বলা হয়েছে –'তত্ত্বজ্ঞানরূপ কারণের বলে দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ অর্থাত্ দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংসরূপ নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ উৎপন্ন হয় ইহা অক্ষপাদদর্শনের সমানতন্ত্র ঔলূক্য দর্শনেও প্রতিপাদিত হয়েছে।

এখানে তর্কাচার্য মহাশয় প্রতি পদের একটি ব্যাখ্যা করেছেন, প্রথমেই যে তত্ত্বজ্ঞানাদ্.... দিয়ে গ্রন্থ শুরু হয়েছে সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন-

'মূলে যে তত্ত্বজ্ঞান গৃহীত হয়েছে, উহার ঘটকীভূত 'তত্ত্ব' এই শব্দটি 'তস্য ভাবঃ' এই অর্থে তদ্ শব্দের পর ভাবার্থে 'ত্ব' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। 'তদ্' শব্দের অর্থ প্রকৃত বুদ্ধিগোচর বস্তু। তাহার ভাব অর্থ তদ্ গত যথার্থরূপ। অতএব প্রকৃত বিষয়ীভূত বস্তুগত যথার্থ রূপই উহার তত্ত্ব, অন্যবিধ অর্থ উহার তত্ত্ব নয়'।[৮৫]

এরপর 'দুঃখের অত্যন্তোচ্ছেদ' এই অংশের ব্যাখ্যায় নব্যমতের ব্যাখ্যা দেখতে পাই, যেমন আচার্য মহাশয় বলেছেন- 'দুঃখের অত্যন্তোচ্ছেদ' এই অংশের অর্থ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ বা নিবৃত্তি। ঐ দুঃখের বিনাশগত আত্যন্তিকত্ব 'স্বসমানাধিকরণ-দুঃখপ্রাগভাবাসমানকালীনত্ব' অর্থাত্ দুঃখ বিনাশের পরবর্তিকালে তদধিকরণ আত্মায় আর দুঃখের উৎপত্তি হয় না, সেই দুঃখবিনাশের উক্তরূপ আত্যন্তিকত্ব থাকিবে'।[৮৬]

এইভাবে গ্রন্থের সকল অংশে তর্কাচার্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রতিপাদিত হয়েছে।

১০. *জাতিবাধকবিচার :-*

এই বিষয়ে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কলকাতার *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায়* ক্রমান্বয়ে এই *জাতিবাধকবিচার* গবেষণামূলক লেখাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ৫ নং খণ্ডে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনাটি পাওয়া যায়। পত্রিকার ৫ সংখ্যক খণ্ডের ২৯৯, ৩২৩, ৩৭১, ৪১৫ পৃষ্ঠাগুলিতে এই আলোচনা পাওয়া যায়। এই গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম দিয়েছেন 'ন্যায়শাস্ত্রীয়জাতিবাধকবিচারঃ'। এটি পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করা হয়, এটি জানা যায় এই নিবন্ধের পাদটীকা অংশে 'অয়ং পরিষদধিবেশনে পঠিতঃ'। এই শোধ নিবন্ধের মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'তর্কার্কসম্পর্কবিভাসিতান্তরং, সদা ভবানীপতিভাবনাপরম্।
তথাপি লোকে হরিদাসসংজ্ঞিতং, সমাশ্রয়ে তাতমলৌকিকশ্রিয়ম্।।
শিষ্যেষু পুত্রেষ্বিব যস্য ভাবনা, তর্কেষু সম্যক্ প্রতিভা জনাতিগা।।
জয়ত্যসৌ কোঽপি স মে গুরুঃ,স্বয়ম্ শশাঙ্কমৌলেরিব মূর্ত্তিরুত্তমা।
পূর্বালোচিতবস্তুতত্ত্ববিষয়া ভূয়ো বৃথালোচনা,
পূর্বোপেক্ষিতবস্তুতত্ত্ববিষয়া তদ্বত্ ফলৈর্বঞ্চিতা।
পূর্বৈঃ সৃষ্টমবিস্তৃতং যদুচিতং তদ্-বিস্তৃতং বক্ষ্যতে,
কালেনাদ্যমতিপ্রভা প্রশিথিলা জাতা জনানাং যতঃ।।
জাতিবাধকবিধাং বিশেষতো নৈব পূর্ববিবুধা ব্যজিজ্ঞপন্।
তেন তাং কলয়িতুং সুবিস্তারাদেষ কশ্চন গতঃ সমুদ্যমম্।।
অল্পমাত্রবিষয়ং বিজানতো ধৃষ্টতৈব গুরুতত্ত্বশোধনম্।
তাময়ং যদধুনা সমাশ্রিতস্তত্র তাতকরূণৈব সম্বলম্।।

দোষরাশিমপহায় সূরয়ো লেশমাত্রমপি সঙ্গতং গুণম্।

মানসে কুরুত হংসবৃত্তয়ঃ প্রার্থনীয়মিহ কিং মমাপরম্।[৮৭]

এইভাবে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে আচার্য মহাশয় স্বীয় ইষ্টদেবতা, নিজ পিতৃদেব ও বিদ্যাগুরুকে প্রণাম জানিয়ে বিষয়বস্তুর কথা প্রতিপাদন করেছেন। পরিশেষে সুধীবৃন্দের কাছে সবিনয় নিবেদন করেছেন দোষ পরিহারের অভিপ্রায়ে।

আলোচনার প্রারম্ভেই *জাতিবাধকের* প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন-

'অথ দ্রব্যমিত্যাদ্যনুগতপ্রতীত্যা সংযোগসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকত্বাদিনা চ সিদ্ধা দ্রব্যত্বাদয় ইব গগনমিতি প্রতীত্যা শব্দসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকত্বাদিনা চ সিদ্ধো গগনত্বাদিরপি জাতির্ন বা ইত্যাশঙ্কয়াং প্রাচীনানুমতা জাতিবাধকা নিরূপ্যন্তে'।[৮৮]

এই প্রবন্ধটি নব্য ন্যায়দর্শনের উপর রচিত। মূলত সামান্য বা জাতির আলোচনা প্রসঙ্গে এই *জাতিবাধকের* অবতারণা। বলা যায় যে যে কারণে কোন কোন ধর্মকে জাতি স্বীকার করা হয় না এই বিষয়কে কেন্দ্র করে *জাতিবাধক* আলোচিত হয়েছে।

১১. *ন্যায়পরিভাষা* :-

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই *ন্যায়-পরিভাষা* শোধ নিবন্ধটি **১৯৬১** সাল থেকে **১৯৬৮** সাল পর্যন্ত(*OUR HERITAGE:Bulletin of the Department of Postgraduate Training and Research,* Sanskrit College, Culcutta) ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করে সংস্কৃত কলেজ থেকে। এই সময় আচার্য মহাশয় সংস্কৃত কলেজের মহাচার্য বিভাগের বরিষ্ঠ গবেষক(Senior Research Fellow) ছিলেন (সময়কাল **১৯৫৪-১৯৭২**)। এটি নব্যন্যায়ের পরিভাষিক আলোচনা। নব্যন্যায়দর্শনে প্রবেশার্থী বিদ্যার্থিদের এই ন্যায়

পরিভাষার সাথে পরিচয় একান্ত প্রয়োজন মনে করে তর্কাচার্য মহাশয় এই আলোচনা করেন।

সর্বমোট চারটি দীর্ঘ নিবন্ধে এই *ন্যায়-পরিভাষা* আলোচনাটি উপস্থাপিত হয়। প্রথম নিবন্ধটি ১৯৬১ সালে (January to June, Vol. IX,Part-1, Ed. Prof. Gaurinath Sastri, *Nyāyaparibhāṣā*, Page:1-16) অধ্যক্ষ স্বনামধন্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় নিবন্ধটি ১৯৬২ (July to December, Vol. X,Part-2, Ed. Prof. Gaurinath Sastri, *Nyāyaparibhāṣā,* Page:16-32) সালে অধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশ করেন এবং তৃতীয় নিবন্ধটি ১৯৬৪ সালে (January to June, Vol.XII,Part-1, Ed. Prof. Gaurinath Sastri, *Nyāyaparibhāṣā,* Page:33-62) একইভাবে প্রকাশিত হয়। পরিশেষে চতুর্থ নিবন্ধটি ১৯৬৮ সালে (July to December, Vol. XVI,Part-2, Ed. Prof. Kali charan Sastri, *Nyāyaparibhāṣā,* Page:63-91) অধ্যক্ষ কালী চরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়।

সমগ্র নিবন্ধে আচার্য মহাশয় 'পরিভাষাতত্ত্বপ্রকরণ','প্রতিযোগিত্ব-পরিভাষা(সাংসর্গিক প্রতিযোগিত্ব),'অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব-প্রকরণ,' অধিকরণত্বপ্রকরণ','অবচ্ছেদকতাপ্রকরণ' এই সকল শিরোনাম দিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

'পরিভাষাতত্ত্বপ্রকরণ' অংশে প্রথমেই শব্দের অপরিহার্যতার কথা বলতে গিয়ে মহাকবি দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ* গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন-

ইদমন্ধং তমঃ কৃত্স্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।

যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।।[৮৯]

অতএব শব্দই সকল ব্যবহারের আধার। শব্দই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও আধ্যাত্মিক জীবনে অপরিহার্য। তর্কাচার্য মহাশয় এ বিষয়ে বলেছেন-

'শব্দ যদি জগতে না থাকিত, শব্দ যদি সৌরাদি জ্যোতির মত বস্তুসমূহের জ্ঞানজননে সহায়তা না করিত, তাহা হইলে জগতের পক্ষে নানাবিধ কল্যাণলাভ একান্ত অসম্ভব হইত।

সুতরাং আলোক যেমন বস্তু প্রকাশের সামর্থবশত বস্তুর জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ শব্দও নিজ নিজ নির্দিষ্ট অর্থ প্রতিপাদনের সামর্থবশত বস্তু জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, ঐ শব্দ যদি জগতে প্রচলিত না থাকিত তবে সমগ্র জগত্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত।

এরপর আজানিক ও আধুনিকভেদে পদবৃত্তির বিভাগ করা হয়েছে, আজানিক বলতে ঈশ্বরকল্পিত বা অনাদিকালসিদ্ধ। আধুনিক বলতে ঈশ্বরভিন্ন অপর কোনও ব্যক্তির প্রাগুক্ত ইচ্ছাবিষয়ত্বরূপ সংঙ্কেতকে বোঝানো হয়েছে, তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'শাস্ত্রকারগণ সঙ্কেতনামক পদবৃত্তিকে 'আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো মতঃ' এই বলিয়া আজানিক ও আধুনিকভেদে দুইভাগে ভাগ করেছেন। জনি শব্দের অর্থ হল উৎপত্তি, আর অজনি শব্দের অর্থ হল উৎপত্তির অভাব। এখানে অজনি শব্দের পর 'ষ্ণিক্' বা 'ইকণ্' প্রত্যয়ে আজানিক পদ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ হবে নিত্য বা অনাদিকালসিদ্ধ'।[৯০]

এখানে শব্দের শক্তি আলোচনা করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে গদাধরমত, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* থেকে জগদীশের মত নানান বিচার দেখা যায়। তর্কাচার্য মহাশয় অন্যান্য সকল প্রকরণে নানান নব্যন্যায়পরিভাষা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন নৈয়ায়িকগণের

মতামতকে পর্যালোচনা করে। যেমন নানান দর্শনে পারিভাষিকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ, উদয়নাচার্যের গ্রন্থেই সর্বপ্রথম নব্যন্যায় পরিভাষার উল্লেখ, সাংসর্গিক প্রতিযোগিত্ব, প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা কাকে বলে, অন্যান্য অর্থে প্রতিযোগিতা শব্দের ব্যবহার, প্রতিযোগিতার বিভাগ, অধিকরণত্ব শব্দের অর্থ, অধিকরণত্ব প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের আলোচনা, অধিকরণতার বিভাগ, ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি আলোচনা, অবচ্ছেদকতা শব্দের অর্থ, অবচ্ছেদকতার বিভাগ ইত্যাদি বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে।

১২. বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত *সাংখ্যসার* গ্রন্থের উপর *সারপ্রভা* টীকা সহ গ্রন্থ সম্পাদনা

সাংখ্যসার গ্রন্থটি সাংখ্যমত সংগ্রাহক প্রকরণগ্রন্থ বিশেষ। রচয়িতা হলেন বৈদান্তিক সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে *সাংখ্যদর্শন* প্রাচীনতম। সাংখ্য- এই নামটি নিয়ে বিতর্ক আছে। একটি গোষ্ঠীর মতে সংখ্যা শব্দ থেকে সাংখ্য শব্দ উৎপন্ন। কারণ এই দর্শনে তত্ত্বের সংখ্যা গণনাদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করা হয়েছে। অপর একদল বলেন, সংখ্যা শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান। এই দর্শন 'তত্ত্বজ্ঞান' বা 'সম্যক্-জ্ঞান দান করে বলে একে সাংখ্য বলে। ন্যায় বৈশেষিকের মত সাংখ্য দর্শনের মুখ্য তথা একমাত্র প্রতিপাদ্য হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা বা স্রষ্টা হলেন মহর্ষি কপিল। বেদে পুরাণে একাধিক কপিলের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে সাংখ্য স্রষ্টা কপিল কে? তা নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও, কপিল যে সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা তা সর্বজনস্বীকৃত।

প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সাংখ্য প্রাচীনতম দর্শন। তাই কালের আবর্তে সাংখ্য দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রায় বিলুপ্ত। তার ফলে আচার্য পরম্পরা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। বর্তমানে প্রচলিত ও স্বীকৃত আচার্য পরম্পরা হল। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষু ষোড়শ শতকে সাংখ্যশাস্ত্রের দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১.*সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য* ও ২. *সাংখ্যসার*।

১২.১. বিজ্ঞানভিক্ষু-পরিচয় :-

বিজ্ঞানভিক্ষুর লৌকিক পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। তাঁর জন্মস্থান অজ্ঞাত। অনেকে মনে করেন—তিনি উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেন। অনুমান করা হয়, তিনি খ্রিস্ট্রীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে ভিক্ষু উপাধি যুক্ত থাকায় তাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মনে হলেও তিনি বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি বিশ্বের পরায়ণ, বিশেষ করে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর আলোচ্য গ্রন্থ *সাংখ্যসার* এর প্রারম্ভ শ্লোক-

মহদাখ্যঃ স্বয়ম্ভূর্যো জগদঙ্কুরঃ ঈশ্বরঃ।
সর্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে।।[৯১]

যে মহৎ তত্ত্ব স্বয়ং প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয়ে জগৎরূপ বৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ, অণিমাদি ঐশ্বর্যযুক্ত, সর্বব্যাপক জয়শীল বিষ্ণুকে প্রণাম করি।

১২.২. তর্কাচার্যকৃত *সারপ্রভা* টীকা সহিত *সাংখ্যসার* গ্রন্থ সম্পাদনা :-

সাংখ্যসার—সাংখ্যের প্রকরণ গ্রন্থ। এর একটি সংস্করণ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশ করেন। তারপর মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় বঙ্গানুবাদ সহ একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহোদয় সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রপুস্তকালয়, বাগবাজার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সাংখ্যসার গ্রন্থটি প্রকরণ গ্রন্থ হলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। আবার গঠন প্রকৃতিতেও বৈচিত্র্য আছে। গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত পূর্বভাগ ও উত্তর ভাগ। পূর্বভাগ সম্পূর্ণ গদ্যে লেখা। কেবল মঙ্গলাচরণ থেকে আরম্ভ করে পরপর চারটি শ্লোক আছে। পূর্বভাগটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তিনটি পরিচ্ছেদে মোট ৫২টি অনুচ্ছেদ আছে। যেমন প্রথম পরিচ্ছেদে ১৪টি, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ২০টি ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে ১৮টি অনুচ্ছেদ আছে। এই

অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে যে সমস্ত শ্লোক আছে সেগুলি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ থেকে প্রামাণ্য বচন হিসাবে উদ্ধৃত। পূর্বভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথমেই সাংখ্যদর্শনে মূল প্রতিপাদ্য ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি তথা মুক্তিলাভের ক্রমনির্দেশ।

উত্তরভাগটি পূর্বভাগের থেকে বহু বিস্তৃত এবং সাংখ্যের বর্ণনীয় বিষয় সমৃদ্ধ। উত্তরভাগে মোট সাতটি পরিচ্ছেদ আছে। এই অংশটি সম্পূর্ণ শ্লোকে নিবন্ধ। মোট শ্লোক সংখ্যা ২৭১টি।

পূর্বভাগে বিষয়গুলি প্রকীর্ণ পরিচ্ছেদের মত প্রায় বিক্ষিপ্তভাবে এক একটি অনুচ্ছেদে নিবন্ধ আছে। উত্তরভাগে প্রতিটি পরিচ্ছেদ এক একটি বিষয়ভিত্তিক। যেমন প্রথম পরিচ্ছেদে ছাব্বিশটি ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকৃত্যাদিভেদের অনুযোগী পুরুষ সংজ্ঞক আত্মনিরূপণ করা হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রথম তেরোটি বাক্যে আত্মা ও অনাত্মার ভেদ প্রদর্শন করা হয়েছে। এরপর ১৪ থেকে ২৬ পর্যন্ত তেরোটি শ্লোকে সত্তা ও অসত্তা বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত হয়েছে।

১৩. *সাংখ্যকারিকা* :- ১৯৩০ সালে তর্কাচার্য মহাশয় ছাত্রপুস্তকালয় থেকে *গৌড়পাদভাষ্য ও ভাষ্যপ্রভা* পাদটীকা আলোচনাসহ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি ছাত্রপাঠ্য হবার জন্য অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য তর্কাচার্য মহাশয় প্রথম *গৌড়পাদভাষ্য* গ্রন্থের প্রথম বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি বর্তমানে অনুপলব্ধ।

উল্লেখপঞ্জি

১. *অর্থশাস্ত্র,* ১.১.২

২. *কাব্যসঞ্চয়ন,* আমরা কবিতা, পৃ. ৪০

৩. *তত্ত্বচিন্তামণি, দীধিতি,* উপসংহার

৪. *ব্যাপ্তিপঞ্চকম্,* সম্পা. রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. ৫৫

৫. *তর্কামৃত,* সম্পা. রাজেন্দ্রলাল ঘোষ, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৩

৬. *Mahamahopadhyas Of India,* p. 139

৭. *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ,* গ্রন্থের মুখবন্ধ অংশ, পৃ. ক

৮. তত্রৈব

৯. *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ,* গ্রন্থের প্রাথমিক-ভারতী অংশ, পৃ. ক

১০. *তদেব,* পৃ. খ

১১. *অর্থশাস্ত্র,* সম্পা. রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৫.১৮০

১২. *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ,* গ্রন্থের প্রাথমিক-ভারতী অংশ, পৃ. খ

১৩. *তদেব, সুপ্রভা* ব্যাখ্যা, পৃ. ৪

১৪. *ভাষাপরিচ্ছেদ,* কারিকা ১১

১৫. *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ,* পৃ. ৫৮

১৬. *তদেব,* পৃ. ৮৮

১৭. *Brief Notes on the Modern Nyāya system of Philosophy and Its Technical Terms,* P. 5

১৮. *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা,* পৃ. ১৬৯

১৯. *প্রশস্তপাদভাষ্য, সূক্তিদীপিকা,* পৃ. ২২

২০. তত্রৈব

২১. *প্রশস্তপাদভাষ্য,* Introduction, p. 4

২২. *তদেব,* ভূমিকা অংশ, পৃ. ১-২৩

২৩. *তদেব,* পৃ. ৩

২৪. *তদেব,* পৃ. ৫

২৫. *তদেব,* পৃ. ২৩

২৬. *ভারতীয় দর্শন কোষ,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯২

২৭. *ভাষারত্নম্,* ভাষারত্নানুবন্ধ অংশ, পৃ. ক

২৮. *তদেব,* পৃ. ১

২৯. *তদেব,* ভাষারত্নানুবন্ধ অংশ, পৃ. ক

৩০. *তদেব,* পৃ. খ

৩১. *ভাষারত্নম্,* ভাষারত্নানুবন্ধ, পৃ. ঘ

৩২. তত্রৈব

৩৩. *ভাষারত্নম্,* ভাষারত্নানুবন্ধ, পৃ. চ

৩৪. তত্রৈব

৩৫. *তদেব,* পৃ. ঞ

৩৬. *নবমুক্তিবাদ,* পৃ. ১৭৮

৩৭. *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা,* পৃ. ১৭৯

৩৮. *ভাষারত্নম্,* ভাষারত্নানুবন্ধ, পৃ. ১

৩৯. *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা,* পৃ. ২০৩

৪০. *নবদ্বীপ মহিমা,* পৃ. ১০২

৪১. *মুক্তিবাদ,* ভূমিকা, পৃ. ১

৪২. *প্রস্থানভেদ,* সপ্তমশ্লোক

৪৩. *মুক্তিবাদ,* পৃ. ৩

৪৪. *মুক্তিবাদ,* সম্পা.কালীপদ তর্কাচার্য, ভূমিকাংশ

৪৫. *মুক্তিবাদবিচার,* পূর্বভাষণম্, পৃ. ১৫

৪৬. *নবদ্বীপ-মহিমা,* পৃ. ৭০

৪৭. *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা,* পৃ. ১৮২

৪৮. *মুক্তিবাদবিচার,* পূর্বভাষণম্, পৃ. ১৬

৪৯. *তদেব,* ভূমিকাংশ, পৃ. ৭

৫০. *তদেব,* পৃ. ১

৫১. *তদেব,* পৃ. ১২

৫২. *তদেব,* পূর্বভাষণম্, পৃ. ১৬

৫৩. *ভারতীয় দর্শন কোষ,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৫

৫৪. *তদেব,* পৃ. ১৩৩

৫৫. *তদেব,* পৃ. ১৩৪

৫৬. *তদেব,* পৃ. ৭

৫৭. *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ, শ্রীভবানন্দাদিবৃত্তরেখা,* পৃ. ১

৫৮. *তদেব,* পৃ. ২

৫৯. *তদেব, পৃ.* ৩

৬০. *তদেব,* পৃ. ৫

৬১. *তদেব,* পৃ. ৯

৬২. তর্কাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মরণে রচিত পুস্তিকা, *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য,* পৃ. ৮৫

৬৩. *প্রবচনত্রয়ী,* মঙ্গলশ্লোক, পৃ. ১

৬৪. *তদেব,* পৃ. ৩৬

৬৫. *তদেব,* পৃ. ৩৯

৬৬. *তদেব,* পৃ. ৪০

৬৭. *তদেব,* পৃ. ৪৩

৬৮. *তদেব,* পৃ. ৪৮

৬৯. *তদেব,* পৃ. ৫২

৭০. *তদেব,* পৃ. ৫৩

৭১. *তদেব,* পৃ. ৫৫

৭২. *তদেব,* পৃ. ৫৭

৭৩. *তদেব,* পৃ. ৭২

৭৪. *শব্দার্থসারমঞ্জরী,* সম্পা. কালীপদ-তর্কাচার্য, পৃ. ২

৭৫. *তদেব,* সম্পা. রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভূমিকাংশ

৭৬. *সারমঞ্জরী, সারদীপিকা* টীকা, পৃ. ১

৭৭. *তদেব,* মঙ্গলাচরণ শ্লোক

৭৮. তত্রৈব

৭৯. *সারমঞ্জরী, সারদীপিকা* টীকা, পৃ. ২

৮০. তত্রৈব

৮১. তত্রৈব

৮২. *ন্যায়দর্শন,* ন্যায়দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩৫

৮৩. *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* সম্পা.বাসুদেব অভ্যঙ্কর, পৃ. ২৩৪

৮৪. *অক্ষপাদদর্শন,* ভূমিকাংশ, পৃ. ১

৮৫. *তদেব,* পৃ. ১

৮৬. *তদেব, পাদপ্রদীপ* ব্যাখ্যা, পৃ. ২

৮৭. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* ৫ নং খণ্ড, *জাতিবাধকবিচার,* পৃ. ২৯৯

৮৮. তত্রৈব

৮৯. *কাব্যাদর্শ* ১.৪

৯০. *Our Heritage* journal, Vol. ix, Part 1, ন্যায়পরিভাষা, পৃ. ৩

৯১. *সাংখ্যসার,* মঙ্গলাচরণশ্লোক, পৃ. ১

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যের অবদান

পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সমগ্র সারস্বত সাধনার মধ্যে কাব্য-সাহিত্য শাস্ত্রচর্চা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বলা যায়। মূলত নব্য ন্যায়দর্শনের ছাত্র হলেও তিনি কাব্য চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা অনবদ্য ও বিরল প্রতিভা বলা যেতে পারে। তিনি নৈয়ায়িক হলেও তাঁর কবিত্ব শক্তি প্রবল ছিল তা এই অধ্যায়ের আলোচনাতেই স্পষ্ট হবে। আর এই কবিত্ব শক্তি এ জগতে দুর্লভ তা আলংকারিকেরা বলে গেছেন, সাহিত্যদর্পণাকার বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে *অগ্নিপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন-

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।।[১]

- এই পৃথিবীতে মনুষ্যজন্ম লাভ করা দুর্লভ ব্যাপার, মানুষের মধ্যে আবার বিদ্যা লাভ করেছেন এমন লোক অতি দুর্লভ, বিদ্বানের মধ্যে আবার কবিত্বশক্তি আছে এমন লোক দুর্লভ এবং কবিত্বশক্তিধরদের মধ্যে আবার প্রকৃত প্রতিভার অস্তিত্ব অতি দুর্লভ।

সুতরাং এই প্রকৃত কবিত্বশক্তিমূলক প্রতিভা কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের ছিল, তা না হলে কাব্য সংসারের নানান দিকে এত সৃষ্টি সম্ভব হত না। কাব্যজগতের তিনি যেন প্রজাপতিস্বরূপ। তাই তো তর্কাচার্য মহাশয় ‘কাশ্যপকবি’ নামে সমধিক খ্যাত এবং এই নামেই তিনি অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

তর্কাচার্য মহাশয়ের সমগ্র কাব্য-সাহিত্য চর্চাকে আলোচনার সুবিধার্থে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে,যথা-

১. মৌলিক কাব্যগ্রন্থ রচনাকৃতি

ক. মহাকাব্য (*সত্যানুভাবম্, যোগিভক্তচরিতম্, আশুতোষাবদানম্*)

খ. খণ্ডকাব্য (*মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্, আলোকতিমিরবৈরম্*)

গ. দৃশ্যকাব্য (*প্রশান্তরত্নাকরম্, মাণবকগৌরবম্, নলদময়ন্তীয়ম্, স্যমন্তক-উদ্ধারম্*)

২. অনুবাদগ্রন্থসমূহ

ক. *গীতাঞ্জলিচ্ছায়া* খ.*গীতাপ্রতিচ্ছায়া* গ. *শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া* ঘ. *যুগলাঙ্গুরীয়ম্* ঙ. *দত্তা* উপন্যাস চ. রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য ছ. মৌলিক কাব্যানুবাদ।

৩. স্বকীয় টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

ক. *মেঘদূতম্* খ. *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* গ. *দশকুমারচরিতম্* ঘ. *মহানাটকম্* ঙ. *বিষ্ণুপুরাণম্* চ. *বেণীসংহারম্*।

৪. বিবিধ পত্রিকায় প্রাপ্ত রচনাকৃতি

ক. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা*, খ. *মঞ্জূষা*, গ. *সংস্কৃত-পদ্যবাণী*, ঘ. *সংস্কৃত-প্রতিভা*, ঙ. *ভারতবর্ষ* চ. *প্রণবপারিজাত*, ছ.*দেবযান*, জ.*সুদর্শন*, ঝ. *সারস্বতী-সুষমা* ।

নিম্নে কালীপদ তর্কচার্য মহাশয়ের সমস্ত কাব্যরচনাকৃতিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হল-

১. মৌলিক কাব্যগ্রন্থ রচনাকৃতি

কালীপদ তর্কাচার্যকৃত মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলি আবার ত্রিবিধ বলা যায় – ক.মহাকাব্য, খ.খণ্ডকাব্য, গ. দৃশ্যকাব্য।

ক.মহাকাব্য :- কাশ্যপকবি সর্বমোট তিনটি মহাকাব্য রচনা করেন - *সত্যানুভাবম্, যোগিভক্তচরিতম্, আশুতোষাবদানম্*। তাঁর রচিত মহাকাব্যগুলির ছন্দমাধুর্য্য ও সুন্দর সুন্দর শব্দচয়ন অসামান্য বলা যায়।

সত্যানুভাবম্

গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল :- ১৯৬৭ সালে কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে এই মহাকাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পূর্বে তর্কাচার্য মহাশয় *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায়* এই গ্রন্থটি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করেন, তা তিনি এই *সত্যানুভাবম্* মহাকাব্যের আরম্ভে ‘সত্যানুভাব-ভূমিকা’ অংশে বলেছেন – ‘যদা তাবমিদং কাব্যং ক্রমেণ *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকায়*াং প্রকাশ্যমানং ....’। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীমধুসূদনচক্রবর্তী বেদান্তশাস্ত্রী সংকলিত ও অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস সম্পাদিত ‘সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকায়াং বিষয়াদিসূচিপত্রম্’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে পরিষদের পত্রিকার ২২, ২৩, ২৪, ২৬ খণ্ডে *সত্যানুভাবম্* মহাকাব্যটি প্রকাশিত হয়।

মহাকাব্যের উৎস :- অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বৃহদাকার পুরাণ হল *স্কন্দপুরাণ,* এর শ্লোক সংখ্যা ৮১,১০০ এবং ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ডগুলি হল- মাহেশ্বরখণ্ড, বিষ্ণুখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, আবন্ত্যখণ্ড এবং নাগরখণ্ড। এই আবন্ত্যখণ্ডের অন্তর্গত রেবাখণ্ড নামক অংশে প্রসিদ্ধ সত্যনারায়ণের বৃত্তান্ত নিয়ে এই মহাকাব্য রচনা করেন তর্কাচার্য মহাশয়। এই

রেবাখণ্ডের ২৩৬টি অধ্যায়ের মধ্যে ২৩৫ নামক অধ্যায় সাধু বণিকের উপাখ্যান এই অংশ থেকে আচার্য মহাশয় মূল কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন। তবে এই মহাকাব্যে পুরাণের বৃত্তান্তের সাথে কবিকল্পনার মেলবন্ধন ঘটেছে তা আচার্য মহাশয় গ্রন্থ ভূমিকা অংশে বলেছেন-

'অত্র কিল কাব্যে স্কন্দপুরাণান্তর্গতরেবাখণ্ডপ্রোক্তলক্ষপতিবণিকবৃত্তমেব সূত্ররূপেণ সমুপাদায় কল্পনাসাহায়কেন প্রভূতনবীনবস্তুনি সন্নিবেশ্য চতুর্বিংশতিঃ সর্গাঃ স্থাপিতাঃ'।[২]

বিষয়বিন্যাস:- *স্কন্দপুরাণের* অন্তর্গত ভগবান শ্রীসত্যনারায়ণের বৃত্তান্ত এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। মহাকাব্যের আঙ্গিকে সত্যনারায়ণ দেবতার আধ্যাত্মিক অলৌকিক জীবন এখানে বর্ণিত হয়েছে। মহাকাব্যটিতে ২৪ টি সর্গ আছে। মহাকাব্যের নিয়মানুসারে এখানে প্রতি সর্গের নামকরণ করা হয়েছে। প্রথমসর্গ – 'কলিপ্রভাববর্ণনম্', দ্বিতীয়সর্গ- 'রমোপদেশঃ', তৃতীয়সর্গ- 'নারদবৈকুণ্ঠপ্রবেশম্', চতুর্থসর্গ- 'নারদপ্রেরণম্', পঞ্চমসর্গ- 'দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ভিক্ষাটনম্', ষষ্ঠসর্গ- 'নারদোপদেশঃ', সপ্তমসর্গ- 'প্রদোষবর্ণনম্', অষ্টমসর্গ- 'সত্য-পূজোত্সবঃ', নবমসর্গ- 'ব্রাহ্মণ-বণিকসংবাদঃ', দশমসর্গ-'বৈশ্যকৃতসত্যপূজামহোত্সবঃ' একাদশসর্গ-'লক্ষপতি-বাণিজ্যব্যবসায়ঃ', দ্বাদশসর্গ-'বণিকভবণদাহঃ', ত্রয়োদশসর্গ-'বণিগ্-দুর্গতি-সমারম্ভঃ', চতুর্দশসর্গ-'সত্যস্য রাজ্ঞীহারাপহরণম্', পঞ্চদশসর্গ-'বণিক্-সংযমনম্', ষোড়শসর্গ-'বণিকতমোগৃহবাসঃ', সপ্তদশসর্গ-'সত্যপ্রসাদঃ', অষ্টাদশসর্গ-'বণিগ্-বন্ধমোক্ষঃ', ঊনবিংশসর্গ-'বণিকপ্রস্থানম্', বিংশসর্গ-'সত্যব্যজঃ', একবিংশসর্গ-'বিরূপসত্যসংবাদঃ', দ্বাবিংশসর্গ-'সত্যসংবাদঃ', ত্রয়োবিংশসর্গ-'বণিকস্বদেশলাভঃ', এইভাবে চর্তুবিংশসর্গের নামকরণ করেছেন তর্কাচার্য মহাশয় 'বণিজঃ সর্ববিপত্পরিমোক্ষঃ'।

এই মহাকাব্যের সর্বমোট শ্লোকসংখ্যা হল-২১৫০ টি। এই মহাকাব্যের মূল কাহিনী বণিকের উপাখ্যান থেকে নেওয়া হলেও কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক রুচিকর

মহাকাব্য নির্মাণ করেছেন। প্রথমসর্গের প্রথমেই কলিকালের করাল গ্রাসের বর্ণনা করেছেন কবি। বৈকুণ্ঠপুরে শ্রীমাধব কলিকালের পরিবর্তিত জগত্ থেকে ব্যথিত হয়ে নিজের মনবেদনা আপন প্রিয়ার কাছে নিবেদন করেছেন। এখানে প্রথমে ভারতীয় শাস্ত্রপরম্পরা সম্মত মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে-

বৈকুণ্ঠসদ্মনি সমুজ্জলরত্নমঞ্চে
পদ্মালয়াকরসরোজগতাঙ্ঘি পদ্মঃ।
শ্রীমাধবঃ করতলোন্নমিতোত্তমাঙ্গঃ
প্রোবাচ চারুবচনানি নিগূহ্য ভাবম্।।[৩]

কলিকালের এক ভয়াবহ বর্ণনা এই সর্গের মূলত বিষয়, কবি মহাকাব্যের প্রথমেই বলছেন-

কান্তে! কলিঃ কলয়তি প্রচিতপ্রভাবং
পুণ্যাঃ ক্রিয়া জগতি সম্প্রতি নামশেষাঃ।
পাপস্য বশ্যমতি বিশ্বমিদং সমীক্ষে
সদ্যঃ সমুদ্ধতমহো! তিমিরং সমৃদ্ধ্যা।।
সত্কর্ম নো দধতি পূতকুলেঽপি জাতা
ভূতানি ভব্যপদবীমভিতস্ত্যজন্তি।
হিংসাদিদোষবিনিবর্ত্তিতসাধুবৃত্তা
হা হন্ত! শান্তিসরণিং ভুবি লোপয়ন্তি।[৪]

এইভাবে কলির প্রভাবে অনিষ্ট বৃত্তান্ত এখানে নানানভাবে বর্ণিত হয়েছে, এই সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে, কোথাও অনাবৃষ্টি আবার কোথাও অতিবৃষ্টি। ফলে মাঠে বীজবপন করা অসম্ভব হচ্ছে, সেইজন্য দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ। কাশ্যপকবি বলেছেন-

ক্ষেত্রেষু বীজমুচিতং বিনিকীর্য্য দক্ষাঃ

শ্রান্তিং মুধৈব রচয়ন্তি নিরন্তরালাম্।

কুত্রাপি হন্ত জলহানিবশাদ্ বিশুষ্কং

কুত্রাপি ভূরি সলিলৈঃ ক্ষয়মেতি শস্যম্।।[৫]

সমগ্র সর্গে কলিকালের করাল গ্রাসের প্রভাবে রোগশোকাকুলা প্রজানাশের কথা, ব্রাহ্মণাদির আপন ধর্ম আচরণে বিঘ্নের কথা, প্রজাদের দহন দেখে পশু পতঙ্গের আত্মহত্যা, আবার গৃহস্থের আপন স্বধর্ম পরিত্যাগ করে কামাচারী কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

রমোপদেশ নামক দ্বিতীয়সর্গে কবি নারায়ণের মনোব্যাথা দূর করার জন্য মহালক্ষ্মীর উপদেশের বর্ণনাগুলির সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন-

ইত্থং সর্বজগদ্গুরুং স্থিতিপরং দৃষ্টা বিকারং গতং

পদ্মাচ্ছদ্মবিভেদনস্থিরমতিঃ কৃত্বা স্মিতং প্রাবদত্।

হে নারায়ণ! শক্তিমানপি পরস্ত্বং তত্ত্বসিদ্ধিক্রমে

যন্মাং পৃচ্ছসি তদ্ধি গৌরবপদং ত্বত্-পাদপদ্মোদ্ভবম্।।

ইন্দ্রাদ্যা বিপদাগমে তব পদং শান্তেঃ কৃতে বৃণ্বতে

ত্বন্নামস্মরণেন সর্ববিপদো দূরং ব্রজন্তি ধ্রুবম্।

তত্ কেয়ং বদ চাতুরী সুচতুর!প্রাপ্তা ত্বয়া নূতনা

তৃষ্ণাপীড়নতো জলাধিপপুরী হন্তাধুনা দুর্গতা।।[৬]

তৃতীয়সর্গ ও চতুর্থসর্গে নারদের বৈকুণ্ঠপ্রবেশ ও বার্তাবহ নারদকে মর্ত্যে প্রেরণ করা বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়সর্গ আরম্ভ হচ্ছে দেবর্ষি নারদের আগমনে-

ততঃ প্রসন্নেন হৃদা রমাপতিস্তদৈব বশ্যং স্মরতি স্ম নারদম্।

অকালহীনং গগনাঙ্গনে চরন্নদৃশ্যতাসৌ হরিভক্তিসারথিঃ।।

কর্ণাবলম্বি-স্ফটিকাক্ষমালয়া করে মহত্যা সুরবং দধানয়া

পবিত্রসূত্রোজ্জ্বলকোমলশ্রিয়া যোগী স দৃশ্যস্তুলসীদলস্রজা।।[৭]

'দরিদ্রব্রাহ্মণভিক্ষাটনম্' নামক পঞ্চম সর্গে নিদারুণ দরিদ্রে পত্নী পুত্র সমবেত এক ব্রাহ্মণের কাহিনী, 'নারদোপদেশ' নামক ষষ্ঠসর্গে বৃদ্ধদরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি নারদের উপদেশ ও সত্যনারায়ণ পূজার উপদেশ এবং সপ্তমসর্গে প্রদোষবর্ণনা অংশে এক মনোরম প্রাকৃতিক বর্ণনা কাশ্যপকবি পরিবেশন করেছেন-

সরিতি সলিলধারা শোণবর্ণৈঃ খরাংশোঃ

ক্ষয়িতকিরণজালৈঃ শোণবর্ণা ভবন্তী।

সময়নিয়মযোগাত্ পাদভেদপ্রসূতং

রুধিরমিব সমন্তাত্ প্রস্রুতং ভাসতে স্ম।।[৮]

অষ্টমসর্গে ব্রাহ্মণের দ্বারা সত্যনারায়ণের পূজার প্রচলন, নবমসর্গে ব্রাহ্মণের সাথে বণিকের কথোপকথন, দশমসর্গে বণিকের দ্বারা পূজার প্রচলন ও মহিমা বর্ণনা এবং বণিক পুত্রগণের দ্বারা সত্যনারায়ণের পূজার বিস্মরণ, একাদশসর্গ থেকে ষোড়শ সর্গ পর্যন্ত সত্যনারায়ণের অভিশাপের ফলে বণিকের রাজ্যে নানান দুরবস্থা, বণিকের ভবনদাহ, বাণিজ্যে ক্ষতি, বণিকের সর্বকার্যে দুর্গতি, রাজ্ঞী অপহরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে সপ্তদশসর্গ থেকে চতুর্বিংশতিসর্গে সত্যনারায়ণের পূজার প্রচলন, সত্যনারায়ণের প্রসন্নতা, বাণিজ্যে উন্নতি, স্বরাজ্যলাভ ও শান্তিতে বণিক পরিবারের কালযাপন। দ্বাবিংশতি সর্গে সকলে মিলে সত্যনারায়ণের স্তুতিকথা গীত হয়েছে-

নমোঽস্তু তুভ্যং পদপঙ্কজায় তে নমঃ পদাঙ্কায় তথাঙ্ঘ্রিপাংশবে।

নমোঽস্তু শঙ্খায় গদাযুধায় তে চক্রায় পদ্মায় নমঃ সদা নমঃ।।[৯]

পরিশেষে চর্তুবিংশ সর্গে এই মহাকাব্যের অন্তিম শ্লোক বর্ণিত হয়েছে সত্যনারায়ণের মঙ্গলশ্লোক দিয়ে-

জগতি গতিবিহীনে ভাতু সত্যানুকম্পা
শিবমশিববিরোধং তত্প্রভাবাত্ বিধত্তাম্।
লয়ময়তু বিষাদঃ সত্যভক্তেষু নিত্যং
জয়তি জয়তি দেবঃ সত্যনারায়ণাত্মা।।[১০]

পল্লীছবি:- কাশ্যপকবি এই মহাকাব্যের সপ্তমসর্গে 'প্রদোষবর্ণনা' অংশে প্রাকৃতিক মনোরম সৌন্দর্য্যের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতির বর্ণনায় সুরসিক পল্লী প্রকৃতির রমণীয় চিত্রাঙ্কন করেছেন তর্কাচার্য মহাশয়। তিনি বলেছেন-

পথিকনয়নভীতেঃ কাপি পল্লীকুমারী
নিজপরিজনসঙ্গং সেবমানা সলজ্জা।
অলসনয়নরশ্মিং ন্যস্য পাদাগ্রভাগে
মৃদুগতিরতিমুগ্ধা স্নিগ্ধমানর্চ্ছ রথ্যাম্।।[১১]

মহাকাব্যত্ব বিচার :- কাব্যশাস্ত্রীয় বিচারে *সত্যানুভাবম্* মহাকাব্যটি মহাকাব্যের ধারায় উত্তীর্ণ। সাহিত্যদর্পণাকার বিশ্বনাথ যে মহাকাব্যের লক্ষণ করেছেন যে সর্গবন্ধ পদ্যসমূহ, ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন নায়ক, অষ্টাধিক সর্গবিশিষ্ট, নানাবৃত্তময় ও প্রাকৃতিক ঘটনাসমৃদ্ধ কাব্যই হল মহাকাব্য। *সত্যানুভাবম্* মহাকাব্যটি ২৪ টি সর্গবিশিষ্ট, বিবিধ বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ, শঙ্খপতি নামক ধীরোদাত্ত নায়ক, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত-প্রত্যুষ-প্রদোষ প্রভৃতি বর্ণনায় সমন্বিত দেখা গেছে সুতরাং এটি মহাকাব্যের লক্ষণে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মহাকাব্যের নামকরণ বিষয়ে বলা হয়েছে সাহিত্যদর্পণে-

বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ

কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।

নামাস্য সর্গোপাদেয়-কথয়া সর্গনাম তু।।[১২]

অর্থাত্ কবির বা বর্ণনীয় বিষয়ের নামানুসারে কিংবা নায়ক বা অন্য কারও নামানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ হয়। প্রতিটি সর্গের বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে যেটি সর্বপ্রেক্ষা উপাদেয় বা প্রধান সেটিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি সর্গের নামকরণ করতে হবে।

উক্ত মহাকাব্যেও *সত্যানুভাবম্* নামটি বৃত্তান্তের বা বর্ণনীয় বিষয়ের নামানুসারে সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাত্ সত্য বলতে সত্যনারায়ণের অনুভব বোঝানো হয়েছে। সমগ্র মহাকাব্যের সর্গগুলির নামকরণ মহাকাব্যের লক্ষণ অনুসারি, যেমন সপ্তমসর্গ ‘প্রদোষ বর্ণনা’, দ্বিতীয়সর্গ ‘রমোপদেশ’, ইত্যাদি।

ছন্দ:- কাশ্যপকবি বিরচিত এই *সত্যানুভাবম্* মহাকাব্যে বিবিধ ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। সমগ্র সর্গ একই ছন্দের ব্যবহার হলেও সর্গের পরিসমাপ্তিতে অন্য ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কারণ মহাকাব্যের লক্ষণে বলা হয়েছে-

একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ।[১৩]

অর্থাত্ সমস্ত সর্গে এক ছন্দ হলেও সর্গান্তে অন্য ছন্দের ব্যবহার করতে হবে। তাই কাশ্যপকবি প্রথম সর্গের ৭৩ টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম ৭২ টি শ্লোক বসন্ততিলক ছন্দ এবং অন্তিম শ্লোকটি অনুষ্টুপ ছন্দে রচনা করেছেন। বসন্ততিলক ছন্দের লক্ষণ হল-

‘জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ’।

অর্থাৎ এটি চতুর্দশ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ, যার গণগুলি হল ত ভ জ জ গ গ । *সত্যানুভাবম্* এই মহাকাব্যে উক্ত শ্লোকে এই ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে-

সত্কর্ম নো দধতি পূতকুলেঽপি জাতা
ভূতানি ভব্যপদবীমভিস্ত্যজন্তি।
হিংসাদিদোষবিনিবর্ত্তিতসাধুবৃত্তা
হা হন্ত! শান্তিসরণিং ভুবি লোপয়ন্তি।[১৪]

উক্ত মহাকাব্যের ‘কলিপ্রভাববর্ণনা’ নামক প্রথম সর্গের অন্তিম শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত হয়েছে-

লোকবৃত্তানুবৃত্তাত্মা পদ্মাং স্নিগ্ধেন চেতসা।
বোধয়িত্বা ব্যথাবীজং বিররাম জনার্দনঃ।।[১৫]

অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ হল –

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ পাদানাং শেষেষ্বনিয়মো মতঃ।।

এই ছন্দে প্রতি পাদে আটটি অক্ষর থাকে। সমস্ত পাদের পঞ্চমবর্ণ লঘু এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে সপ্তমবর্ণ লঘু, তথা সমস্ত পাদেরই ষষ্ঠবর্ণ গুরু হবে, এর প্রতিপাদে অপরাপর বর্ণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নেই।

এইভাবে উক্ত মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে শার্দূলবিক্রীড়িত, অন্তিম শ্লোক মালিনী, তৃতীয়সর্গে বংশস্থবিল অন্তিমে বসন্ততিলক প্রভৃতি ছন্দের সার্থক ব্যবহার করেছেন কাশ্যপকবি।

যোগিভক্তচরিতম্

গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল:- যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের চরিত নিয়ে মহামহোপাধ্যায় তর্কাচার্য মহাশয় বিংশসর্গাত্মক দ্বিতীয় মহাকাব্য *যোগিভক্তচরিতম্* রচনা করেন। শ্রীনগেন্দ্রমঠ থেকে ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

মহাকাব্যের উৎস:- ১৮৪৬ সালে হাওড়া জেলার ধারসা, মাকড়দহ গ্রামে শ্রীপার্বতীচরণ ভাদুড়ী এবং ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সন্তানরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে সমাজসেবা, জনশিক্ষাপ্রসার ও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা ও কলেজশিক্ষা শেষ করার পর তিনি নিজগ্রামে ফিরে এসে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যেখানে গ্রামের দরিদ্র ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। পরবর্তিকালে তিনি নিজ উদ্যোগে শ্যামবাজার অঞ্চলে 'টাউন স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক চর্চা করে গেছেন। হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। পরিশেষে যুগাবতার শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে মহাসমাধি লাভ করেন।

এই মহাজীবনের চরিত অবলম্বনে কালীপদ তর্কাচার্য মহাকাব্য রচনা করে গুরুচরণে অঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এই মহাকাব্যটিতে নগেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন, কর্মকাণ্ড, অধ্যাত্মচর্চা ও সনাতন ধর্মরক্ষায় প্রচেষ্টা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে তিনি মহাকাব্যের লক্ষণ অনুসারেই এটি রচনা করলেও প্রতি সর্গের নামকরণ করেন নি। মহাকাব্যের প্রথমেই শাস্ত্রপরম্পরা নিয়মানুসারে মঙ্গলাচরণ দিয়ে আরম্ভ করেছেন –

তস্মৈ নমঃ পাতকশাতনায় ক্ষেমায় ধর্মস্থিতিকারণায়।

লীলাশরীরেণ ভুবং শ্রিতায় মহামহিম্নে পুরুষোত্তমায়।

যদা যদা গ্লানিরিহ প্রভূতা ধর্মস্য পাপাভ্যুদয়েন লোকে।

সতামসদ্ভিশ্চ নয়া নিরস্তাস্তদা শরীরং বৃণুতে পরেশঃ।।

স তেন লীলাবপুষা মহীয়ানং দৃপ্তং দুরাচারগণং বিনাশ্য।

পাপপ্রভাবং পরিভূয় ভূয়ঃ করোতি ধর্মস্য ভুবি প্রতিষ্ঠাম্।[১৬]

বিষয়বিন্যাস:- বিংশসর্গাত্মক এই কাব্যে কাশ্যপকবি অজস্র তথ্যসংবলিত শ্রীনগেন্দ্রনাথের জীবন, কর্মকাণ্ড ও অধ্যাত্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, ধর্মবিষয়ে ব্রিট্রিশ হস্তক্ষেপ, সনাতন ধর্মরক্ষার প্রচেষ্টা, দরিদ্র ও আর্তের সেবা, অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, নিজধর্মবিষয়ে সামাজিক সচেতনতা, সনাতন ধর্মের শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি বিষয়ে এই মহাকাব্যে সম্যক্ আলোকপাত করা হয়েছে।

এই মহাকাব্যে ২০ টি সর্গে সর্বমোট ১১৪৬টি শ্লোক আছে। সর্গানুসারে ক্রমান্বয়ে শ্লোকসংখ্যাগুলিহল-৫০+৫৫+৫৭+৬৭+৫৯+৪১+৪৬+৫০+৫৯+৫৯+৪৪+৪৯+৫৪+৫৪+৫৭+৫৮+ ১১৭+৬২+৫১+৫৭=১১৪৬। প্রথমসর্গে মঙ্গলাচরণশ্লোক দিয়ে শুরু করে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের অবতারতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে-

এবং স্থিতায়াং জগতো দশায়াং ভক্তানুরক্তঃ সদয়ঃ পরেশঃ।

ধৃত্বা বিচিত্রং নরসিংহরূপং জঘান তং দৈত্যমপত্যশত্রুম্।।

নিশাচরাধীরশ্বররাবণাদ্যাস্তথা যদাকুর্বত ধর্মবৈরম্।

শ্রীরামরূপেণ তদাবতীর্ণো ধর্মস্থিতিং সাধয়তি স্ম দেবঃ।।

তথা তৃতীয়েহপি যুগে ধরায়াং কংসাদিভির্যাবদহিংসি ধর্মঃ।

তাবত্ স জাতো বসুদেবগেহে ধর্মং দধৌ দুষ্টগণস্য হন্তা।।[১৭]

তারপর আচার্য মহাশয় কলিকালের অনাচার, দুর্বৃত্তদের দ্বারা সমাজ পরিচালনা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, বিধর্মীকরণ, সনাতন ধর্মের আচার হ্রাস, ধর্মাচরণে সামাজিক বাধা, একথায় ধর্মীয় ও সামাজিক অবনমন এই সর্গে স্পষ্ট। খ্রিস্টানধর্মের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা, ইংরেজদের প্রভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টধর্মগ্রহণের প্রবণতা সনাতন হিন্দুধর্মের অধোগতি ও বিনষ্টির এক অস্থির পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে কাশ্যপকবি বলেছেন-

তত্রাপি কালে ভুবি বেদধর্মস্তথা ন লেভে সুতরাং বিলোপম্।

সনাতনাখ্যাং সফলাং দধানস্তদাপি রেজে স নৃণাং সমাজে।।

অতঃ পরং ম্লেচ্ছনৃপাধিকারে সৌভাগ্যযোগেন যুরোপভূমেঃ।

প্রাপ্তপ্রচারঃ কিল খৃষ্টধর্মো ধর্মান্তরস্যাতিরিপুর্বভুব।।[১৮]

এছাড়াও সনাতন ধর্মের মানুষেরা বৈদিকাচার পরম্পরায় বিরোধি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই ধর্ম আচরণ করে, যার ফলে সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা হ্রাস পেতে থাকে এবং সনাতন ধর্ম অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলে। এই সময় ভারতমায়ের কিছু বীর সন্তানের আবির্ভাব হয় এই সনাতন ধর্ম রক্ষা করার জন্য, এই দেশাত্মবোধের প্রসঙ্গ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়সর্গে নগেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন, পিতা মাতার পরিচয়, শিক্ষাগ্রহণ, বাল্যে বিদ্যাগ্রহণের সাথে যোগাভ্যাস, শৈশব থেকেই ধর্মচর্চা ও দরিদ্র আর্তের সেবা এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

এইভাবে তৃতীয় সর্গ থেকে বিংশ সর্গ পর্যন্ত এই মহাকাব্যে নগেন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ড, ধর্মপ্রচার, শিষ্যত্বগ্রহণ, গুরুসেবা, যুগাবতারের গুরুভক্তির পরিচয়ক, সমাজকল্যাণমূলক

বিভিন্ন কাজের সাথে সাথে আধ্যাত্মিকচর্চা, বিভিন্ন সভা ও সমিতি প্রতিষ্ঠা, পরিশেষে যোগিরাজের মহাপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

মহাকাব্যত্ব বিচার:- তর্কাচার্য মহাশয় মহাকাব্যের প্রথাগত লক্ষণগুলির অনুসরণেই এটি রচনা করেছেন। বিষয়বস্তু, নামকরণ, সর্গসংখ্যা, সর্গের আয়তন, ছন্দব্যবহার, বিষয়ান্তরের যাবতীয় বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি কাব্যতাত্ত্বিক নিয়ম মান্য করেছেন, তবে তিনি দুটি সর্গ ব্যতীত সমস্ত সর্গের নামকরণ করেননি, অষ্টাদশ সর্গের নামকরণ করেছেন 'যোগিরাজ-মহাপ্রয়াণাভিধানম্' একোনবিংশ সর্গের নাম দিয়েছেন- 'নবনেতৃসমাগমো'। মহাকাব্যের নিয়মানুসারে সমস্ত সর্গের নামকরণ করার বিধান থাকলেও তর্কাচার্য মহাশয় কি কারণে এমন দুটি সর্গের নামকরণ করেছেন তা অজ্ঞাত।

ছন্দ:- উক্ত মহাকাব্যে কাশ্যপকবি বিবিধ ছন্দের ব্যবহার করেছেন। প্রথম সর্গেই তিনি ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের সমন্বয়ে উপজাতি ছন্দের সুনিপুণ প্রয়োগ করেছেন। প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকটি হল-

তস্মৈ নমঃ পাতকশাতনায় | ক্ষেমায় ধর্মস্থিতিকারণায়।
লীলাশরীরেণ ভুবং শ্রিতায় | মহামহিম্নে পুরুষোত্তমায়।।[১৯]

এই শ্লোকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে ইন্দ্রবজ্রা ও চতুর্থচরণে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের ব্যবহার করেছেন। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা এই দুই ছন্দ যখন শ্লোকের পাদে থাকে অর্থাত্ বিভিন্ন পাদগুলি যখন ঐ দুই ছন্দের লক্ষণদ্বারা চিহ্নিত হয়, তখন তাকে উপজাতি বলে। এই ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌ
পাদৌ যদীয়াবুপজাতয়স্তাঃ।

ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা এই সমবৃত্ত ছন্দগুলি একাদশাক্ষরাবৃত্তি। 'তস্মৈ নমঃ পাতকশাতনায়' (একাদশাক্ষর) ক্ষেমায় ধর্মস্থিতিকারণায় (একাদশাক্ষর)। লীলাশরীরেণ ভুবং শ্রিতায় (একাদশাক্ষর) এখানে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে। এইছন্দের গণগুলি হল ত ত জ গ গ । *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করা হয়েছে- 'স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ'। চতুর্থ চরণে 'মহামহিম্নে পুরুষোত্তমায়' (একাদশাক্ষর) এখানে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে, এই ছন্দের গণগুলি হল- জ ত জ গ গ। লক্ষণটি হল- 'উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা'।

কাব্যশাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মহাকাব্যের সর্গের প্রথমে যে ছন্দের ব্যবহার থাকবে, সর্গের পরিসমাপ্তিতে ভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ থাকবে। কাশ্যপকবিও এই প্রথম সর্গের অন্তিমে মালিনী ছন্দের ব্যবহার করেছেন। শ্লোকটি হল-

ইতি ভগবদনুজ্ঞাং শ্রদ্ধযাধায় শীর্ষং | হরিচরণরজোভিঃ পাবয়িত্বা স্বদেহান্।

সমবতরিতুমেতে মর্ত্ত্যভূমৌ তদৈব | দ্রুতপরিকরমাপুঃ কৃত্যসারং স্মরন্তঃ।।[২০]

উক্ত শ্লোকে প্রতিটি পাদে পঞ্চদশাক্ষর থাকার কারণে এখানে ছন্দের নিয়মে মালিনী ছন্দ হয়েছে। লক্ষণটি হল- 'ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ', গণগুলি হল-ন ন ম য য।

এইভাবে আচার্য মহাশয় ২০টি সর্গে শার্দূলবিক্রীড়িত, বংশস্থবিল ইত্যাদি বিবিধ ছন্দমাধুর্যে সুশোভিত করেছেন মহাকাব্যটিকে।

আশুতোষাবদানম্

বাংলার বাঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে তর্কাচার্য মহাশয় সুললিত ছন্দে *আশুতোষাবদানম্* কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মহাকাব্যটি নামেমাত্র পাওয়া যায়, অধুনা অনুপলব্ধ।

খ.খণ্ডকাব্য:- কালীপদ তর্কাচার্যের যে দুটি খণ্ডকাব্য পাওয়া যায় –একটি হল *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* ও অপরটি হল *আলোকতিমিরবৈরম্*। এছাড়াও *শৈশবসাধনম্* নামে আর একটি খণ্ডকাব্যের নাম শোনা যায়।

মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্

গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল:- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* নামে এই অসাধারণ খণ্ডকাব্যটি প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডকাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে তর্কাচার্য মহাশয় *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকার* ৫০ তম খণ্ডে খণ্ডকাব্যটি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করেন।

খণ্ডকাব্যের নামকরণ:- এই 'মন্দাক্রান্তা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তর্কাচার্য মহাশয় স্বয়ং বলেছেন –

'মন্দেন শনিনা আক্রান্তায়া বৃত্তং বৃত্তান্তঃ, অথ চ মন্দাক্রান্তা বৃত্তং ছন্দঃ, তদধিকৃত্য কৃতমিতি প্রকৃতনামার্থনিরুক্তিঃ'।[২১]

অথাত্ মন্দ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার পত্নীর পরলোকগমনের যে বৃত্তান্ত তাই হল *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* খণ্ডকাব্যের বিষয়বস্তু।

খণ্ডকাব্যের উৎস:- তর্কাচার্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী এই খণ্ডকাব্যের মূল আকর। মূলত অকালপ্রয়াত প্রথমা পত্নীর জীবনকাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের কবিনিবেদনম্ অংশে বলা হয়েছে-

অকালে স্বর্গমাপ্তায়াঃ পত্ন্যাঃ সংস্মৃতয়ে চিরম্।

রাধালক্ষ্মী- সমাখ্যায়াঃ কৃতং কাব্যমিদং ময়া।।[২২]

বিষয়বিন্যাস:- গ্রন্থটি ষষ্ঠ বিলাসে বিন্যস্ত। খণ্ডকাব্যটিতে ৬২৯ টি শ্লোক মন্দাক্রান্তা ছন্দে নির্মিত হয়েছে। প্রথম বিলাস থেকে ষষ্ঠ বিলাস পর্যন্ত যথাক্রমে **১১১, ১১২, ১১৭, ১১২,** ৬৮, ৯৯=৬২৯টি শ্লোক আছে। প্রথমবিলাসের নাম 'কোট্টলপত্তনবর্ণনম্'-যেখানে বাংলাদেশের কোট্টলপল্লীর বা পরবর্তিকালে কোটালিপাড়ার সমাজ-সংস্কৃতি, পরিচ্ছিন্ন ও রমণীয় চিত্র বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বিলাসের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে-

বঙ্গপ্রান্তে বহুলবিদিতং পত্তনং কোট্টলাখ্যং,
মুখ্যা যস্মিন্ কৃতবসতয়ো ব্রাহ্মণা লক্ষসংখ্যাঃ।
সর্বে মুগ্ধা ইব গুণগুণা যত্র নিত্যং বসন্তো,
দেশৈঃ কাম্যং ত্রিদশনগরীসাম্যমুদ্ভাসয়ন্তি।[২৩]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিলাসে শনির কুটিল দৃষ্টিপাতে বিষ্ণুদাসের পত্নী পদ্মার সন্তানলাভে বিলম্ব, দেবতাদের প্রতি অবিশ্বাস, বিষ্ণুর স্বপ্নাদেশ, শ্রীচণ্ডীর তুষ্টির বিধানার্থে চণ্ডীর শতাবৃত্তিপাঠ, পূজা-হোমাদি এবং পুত্র শ্যামাদাসের বালসুলভ আচরণ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে-

ইত্থং বঙ্গেষ্বপি পরিচিতে পত্তনে কোট্টলাখ্যে,
পুণ্যাচারঃ সুবিমলমতিঃ কাশ্যপো বিষ্ণুদাসঃ।
স্বর্গাবাসে গুরুরিব গুরুস্তর্কবিদ্যাধনানা-
মাসাঞ্চক্রে কিল ধবলয়ন্ জ্ঞানকীর্ত্ত্যা দিগন্তান্।।[২৪]

চতুর্থ বিলাসে **১১২** টি মন্দাক্রান্তা ছন্দের এক অপূর্ব মণিহার। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশে গুরুর কাছে কালীপদ তর্কাচার্যের বিদ্যাভ্যাস বর্ণিত হয়েছে। কবির অনবদ্য বর্ণনাশৈলীর মাধুর্যে চতুর্থ বিলাসটি যেমন তথ্যনিষ্ঠ তেমনি রসোত্তীর্ণ। কালীপদ

প্রকৃতিপ্রেমী, সূক্ষ্মদর্শীতা, বাক্যে বাচস্পতির মত এবং তর্কশাস্ত্রে অসাধারণ নিপুণতা লাভ করেছিলেন। বলা হয়েছে-

নত্বা পাদৌ শিবসমগুরোরাজ্ঞয়া তস্য হৃষ্টঃ,
শ্যামাদাসোঽধ্যয়ননিরতো যাবদাসীত্ সুবুদ্ধিঃ।
তাবত্তস্যানুপমধিষণাযোগমন্বীক্ষমাণো,
বাণীনাথস্তমভি হৃদয়েঽধত্ত নানাবিচারান্।।[২৫]

এই খণ্ডকাব্যে গুরু বাণীনাথ নিজ পুত্রসম শিষ্যের গুণে গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু গুরু দক্ষিণারূপে স্বকন্যা রাধার সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি গুরুর কন্যাকে বিবাহ করলেন। গুরুর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হলেও বিবাহের পর রূপে কৃষ্ণবর্ণীয়া রাধাকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারলেন না। স্বামীর কাছে তিনি অপ্রিয় থেকে গেলেন। চতুর্থ বিলাসে বলা হয়েছে-

বাণীনাথোঽবদদথ বচঃ সস্মিতং স্নেহপূর্বং,
জানাম্যেবং কিল সুচরিতং বত্স! তে সর্বকালম্।
তদ্ বাচং মে শৃণু কথয়তো নাহমন্যত্ প্রযাচে,
ত্বামেবাহং বহুগুণময়ং প্রার্থয়ে দক্ষিণার্থম্।।[২৬]

পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিলাসে রাধালক্ষ্মীর রোগাক্রান্ত জীবনের নিদারূণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ক্রমে পতির অবজ্ঞায় দুঃখে জর্জরিত হয়ে রাধা নিজ জীবনের মূল্যহীনতার কথা ভেবে নিদ্রা আহারাদি নিত্যকর্ম ত্যাগ করলেন। চিকিৎসকের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মৃত্যুর দিন গুনতে লাগলেন এবং মারা গেলেন।

সকল বিলাসগুলির নামকরণ করা হয়নি, বৃত্তান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রথম বিলাসের কেবলমাত্র নামকরণ করা হয়েছে – 'কোট্টলপত্তনবর্ণনম্'। অর্থাত্ এখানে অধ্যায়গুলি বিলাস নামে অভিহিত হয়েছে।

এই খণ্ডকাব্যটিতে অকালপ্রয়াত স্বর্গগতা পত্নীর জন্য গভীর মর্মবেদনা কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। বাস্তবজীবনের এক গভীর শোক এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে করুণরস হল এই খণ্ডকাব্যটির অঙ্গীরস। কবি কালীপদের বিরহী হৃদয়ের আর্তি প্রকাশিত হয়েছে স্বকীয় প্রতিভার নৈপুণ্যে।

শব্দচয়ন ও ছন্দের নির্বাচন:- যেহেতু বিরহকাব্যের প্রকাশে মহাকবি কালিদাস তাঁর *মেঘদূতম্* খণ্ডকাব্যে এই ছন্দের নির্বাচন করেছেন তাই মনে হয় তর্কাচার্য মহাশয়ের এই মন্দাক্রান্তা ছন্দের নির্বাচন বিরহ অভিব্যক্ত করার জন্য। কারণ এই ছন্দের গতি অত্যন্ত ধীর ও মন্দগতি তাই কাশ্যপকবি হৃদয়ের বেদনা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে উক্ত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও কালীপদের শোকাতুর প্রাণের বেদনা সুনিপুণ শব্দচয়নে আরও সার্থক হয়ে উঠেছে খণ্ডকাব্যটি।

কাব্যশাস্ত্রীয় বিচার:- কাব্যশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* কাব্যটি একটি খণ্ডকাব্য। কবি সচেতনভাবে এই খণ্ডকাব্যটি নির্মাণ করেছেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ তার *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন-

'খণ্ডকাব্যং ভবেত্ কাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ'।[২৭]

অর্থাত্ মহাকাব্যের লক্ষণের কোন অংশ অনুসরণ করে ছন্দোবদ্ধ যে কাব্য রচিত হয় তাকেই 'খণ্ডকাব্য' বলা হয়। কারিকায় 'চ' শব্দের দ্বারা মহাকাব্যকে বোঝানো হয়েছে।

খণ্ডকাব্যে একটি বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে। মহাকাব্যের মত এখানে প্রকৃতি ও নগরাদির বর্ণনা থাকে। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর *কুসুমপ্রতিমা* টীকাতে বলেছেন-

'খণ্ডেতি। তত্র চাকারোপাদানাত্ কাব্যস্য পূর্বনিরুক্তস্য মহাকাব্যস্যেত্যর্থঃ একদেশানুসারি একাংশানুরূপং কাব্যং খণ্ডকাব্যং ভবেত্'।[২৮]

আলোচ্য *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* কাব্যটি প্রথম বিলাসেই কোট্টালনগরীর বর্ণনা ও প্রকৃতির শোভা কাব্যোচিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া অকাল প্রয়াত পত্নীর এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই খণ্ডকাব্যটির বিস্তার, এটি একটি সার্থক খণ্ডকাব্য বলে বিবেচিত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আলোকতিমিরবৈরম্

গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল:- ১৯৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর *সংস্কৃতপ্রতিভা* পত্রিকায় অক্টোবর ও এপ্রিলমাসে মহাকবি কালীপদ তর্কাচার্যের আর একটি অন্যতম খণ্ডকাব্য *আলোকতিমিরবৈরম্* নতুন দিল্লী সাহিত্য একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়।

আনন্দের বিষয় হল- সংস্কৃত ভাষায় এই পত্রিকাটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৫৯ সালে প্রখ্যাত পণ্ডিত ভি. রাঘবন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তিকালে এটি সবথেকে পুরাতন পত্রিকা, যা কিনা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি তিনমাস অন্তর সংস্কৃত প্রতিভার প্রকাশকাল। বর্তমান সময়ে (২০২৪ সাল) অধ্যাপক কবি অভিরাজ রাজেন্দ্র পত্রিকাটির বর্তমান সম্পাদক। পত্রিকাটিতে সৃজনশীল ও মৌলিক লেখা দেখা যায়।

খণ্ডকাব্যের উৎস:- এখানে আলোক ও তিমিরের বৈরতা প্রতিপাদিত হয়েছে। এই খণ্ডকাব্যটি বিষয়নির্যাস হল ন্যায়দর্শনের অন্ধকারের দশম দ্রব্যত্ব খণ্ডন।

খণ্ডকাব্যের নামকরণ:- প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই খণ্ডকাব্যের নামকরণ হয়েছে-*আলোকতিমিরবৈরম্*। কাব্যশাস্ত্রীয় রীতিকে মান্যতা দিয়ে এই নামকরণ হওয়ায় *আলোকতিমিরবৈরম্* নামকরণটি সার্থক। কারণ বলা হয়েছে কবির বা বর্ণনীয় বিষয়ের নামানুসারে কাব্যের নামকরণ হবে-'কবেবৃর্ত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা'।[২৯]

বিষয়বিন্যাস:- এখানে মূলত দর্শনের বিষয় কাব্যোচিত ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের দুটি পর্ব – 'পূর্ববৈরম্' ও 'মধ্যমবৈরম্'। প্রথম পর্বটি 'আলোকপ্রথমলপিতং নাম পূর্ববৈরম্' এবং দ্বিতীয় পর্বটি 'তিমিরলপিতং নাম মধ্যমবৈরম্'। কাব্যটিতে প্রথম পর্বে আলোকের মুখে প্রথমে নব্যনৈয়ায়িকের শৈলী ও যুক্তির দ্বারা আলোক নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার পর, দ্বিতীয় পর্বে তিমির কর্তৃক আলোকের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিপূর্বক খণ্ডন করে স্বমাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। প্রথমপর্বটি আরম্ভ হচ্ছে এমনভাবে-

> তিমির, ক্ষিতিদুঃখহেতবে জননন্তে জনপাতকোদ্ভবম্।
> ত্বয়ি ভূমিতলে সুবিস্তৃতে পথিসন্দর্শনমপ্যসম্ভবম্।।
> অসিতাবরণা দিগঙ্গনা শুচি মগ্নেব তদা বিভাব্যতে।
> সরসীহ্রদসাগরাদ্রুমা দধতে হর্ম্যগণাশ্চ তুল্যতাম্।।[৩০]

জগতে আলোক ও তিমিরের বৈরতা আবহমানকাল ধরে প্রসিদ্ধ- 'ভুবনে প্রথিতা পরস্পরং তিমিরালোকযুগে বিরোধিতা'। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলে স্বীকার করা হয়নি, অন্ধকারকে আলোকের অভাব বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে –

'ননু দশমং দ্রব্যং তমঃ কুতো নোক্তম্ ?....... ন, আবশ্যক-তেজোঽভাবেনৈবোপপত্তৌ দ্রব্যান্তর-কল্পনায়া অন্যায্যত্বাত্'।[৩১]

অপরদিকে মীমাংসকরা অন্ধকারকে দশমদ্রব্য বলে স্বীকার করেছেন। জৈন, ভাট্টমীমাংসক ও বেদান্তসম্প্রদায়ের মতে, অন্ধকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অন্ধকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই, তবে উহা দ্রব্য কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

মধ্যমবৈরম্ নামক দ্বিতীয় পর্বে ৮৬টি শ্লোকে তিমির আলোকের যুক্তি খণ্ডনপূর্বক নিজ মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

'তিমিরং বহু নিন্দিতং ততো মলিনং মানসবিপ্লবাদিব।
খরশান্তসযুক্তিকোক্তিভিঃ কিয়দালোকযশো ব্যনাশয়ত্' ।।[৩২]

এই নিয়ে ন্যায়দর্শনে যে আলোচনা রয়েছে সেই বিষয়টিকে আকর করে পণ্ডিত তর্কাচার্য মহাশয় কাব্যনির্মাণ করেছেন, এইখানেই পণ্ডিত মহাশয়ের অনন্যতা।

গ. দৃশ্যকাব্য:- কাশ্যপকবি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অন্যতম কৃতি হল তার দৃশ্যকাব্যের রচনা। এখানে যেমন *মহাভারত* ও পুরাণের বিষয় আলোচিত হয়েছে, তেমনি তৎকালীন সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে দৃশ্যকাব্যের আঙ্গিকে। তাঁর প্রতিটি নাটকে একটি বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান ঘটনার সাথে নাটকগুলিকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য মঞ্চে নৃত্য ও সঙ্গীতের সার্থক প্রয়োগ করা হয়েছে। নাটকের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলি হল – *প্রশান্তরত্নাকরম্, নলদময়ন্তীয়ম্, মাণবকগৌরবম্, স্যমন্তকোদ্ধারম্*।

প্রশান্তরত্নাকরম্

গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল:- ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্ থেকে কালীপদ তর্কাচার্য প্রণীত *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটকটি প্রকাশিত হয়। এর পরবর্তিকালে *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায়* ১৯৮৮ সালে ২০, ২১ ও ২২ তম খণ্ডে নাটকটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। উক্তপত্রিকার ১, ৩৩, ৬৫, ১১৩, ১৩৭, ২০১, ২২৯ পৃষ্ঠায় সমগ্র নাটকটি প্রকাশ করা হয়।

এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক অমরেশ্বর ঠাকুর ও অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই নাট্যগ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন। তর্কাচার্য মহাশয় এই নাটকটি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর দর্শনাচার্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে উৎসর্গ করেন। এই নাটকের 'উত্সর্গপত্রম্' অংশে বলেছেন –

ভক্তৈর্ভক্তিবশাত্ কৃতা দিবিষদা পত্রেণ পুষ্পেণ বা
পূজা প্রীতিভর করোতি নিযত দিব্যোপচারৈর্যথা।
তস্মাত্ সংস্কৃতবাক্-পলাশনিচিত পত্রোপহারো ময়া
ক্ষুদ্রোঽপ্যদ্য সুরেন্দ্রনাথ ভবতে শ্রদ্ধাবতা দীয়তে।।[৩৩]

ভবদগুণমুগ্ধ-শ্রীকালীপদ-দেবশর্মণা

নাট্যগ্রন্থের উৎসানুসন্ধান:- এই নাটকটি অতিপরিচিত দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তরের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হয়েছে। *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটকের মূল কাহিনী বঙ্গভাষায় রচিত কৃত্তিবাস রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা

গিয়েছে অধ্যাত্ম রামায়ণ ও স্কন্দপুরাণে যে কাহিনী আছে তাতে দস্যু রত্নাকরের কাহিনী নেই। তর্কাচার্য মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অনুবন্ধিকা অংশে বলেছেন-

'অধ্যাত্মরামায়ণগ্রন্থে মহর্ষিবাল্মীকিনা স্বমুখেনৈব শ্রীরামসমীপে যদাত্মবৃত্তমুপবর্ণিতম-যোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠসর্গে, তত্র রত্নাকর ইতি নাম্নো গন্ধোঽপি নাসাদ্যতে' ।[৩৪]

কৃত্তিবাস রামায়ণ থেকে মূল উদ্ধৃত হয়েছে সেই বিষয়ে কাশ্যপকবি বলেছেন-

'বঙ্গভাষাময়পদ্যরামায়ণপ্রজাপতিকৃত্তিবাসাদিপরিকল্পিত বাল্মীকে রত্নাকরেতি পূর্বনাম তত্পিতুশ্চ চ্যবনেতি নামৈব সমবলম্বিতবন্ত। বঙ্গভাষাময়রামায়ণকবি কৃত্তিবাসঃ পুনঃ কুতো মূলগ্রন্থাদেতন্নামদ্বয়ম্ আসাদিতবানিতি নব নির্ণেতুমর্হামঃ'।[৩৫]

কৃত্তিবাস রামায়ণে রামায়ণ উৎপত্তি প্রকরণে বলা হয়েছে দস্যু রত্নাকরের নাম-

চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর
দস্যুবৃত্তি করে সেথা বনের ভিতর।
ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল
আজি হইতে তব নাম বাল্মীকি হইল।[৩৬]

বিষয়বিন্যাস:- তর্কাচার্য বিরচিত নয় অঙ্কের একটি অত্যন্ত রসোত্তীর্ণ নাটক হল *প্রশান্তরত্নাকরম্*। এই নাটকের প্রারম্ভে নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে নান্দীশ্লোক উচ্চারিত হয়েছে সীতাপতি রামকে স্মরণ করে-

নীলনলিনমঞ্জুলতনুরতনুচাপধারী
কর্বরকুলধূমকেতুরনুগতহিতকারী।
হিত্বা নৃপপদমতিঘনভীষণবনচারী

জয়তি জয়তি সীতাপতিরখিলদুরিতহারী।[৩৭]

প্রথমাঙ্কে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথনের পর ভিক্ষুকবেশে রত্নাকরের প্রবেশ। নায়ক রত্নাকর দরিদ্র পরিবারের সন্তান, যার পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার জোগানোর ক্ষমতা নেই। এই অঙ্কে দারিদ্রের নিদারুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কাশ্যপকবি-

মৈত্রীং ছিনত্তি সুচিরন্তনবান্ধবোঽপি
যাচ্ঞাভয়েন পরিধাবতি দূরমার্গে।
মূঢ়োঽপি বিত্তসহিতো বিদুষা বরেণ্যো
দীনো বিচিত্রমতিরপ্যবমানপাত্রম্।।[৩৮]

এরপর দরিদ্র রত্নাকর একদিন দুঃসাহসের পরিচয় দেয়, একদল ডাকাতের হাত থেকে এক নারীকে রক্ষা করেন। তার সাহসে মুগ্ধ হয়ে ডাকাতসর্দার তাকে বন্ধুত্ব হিসেবে বরণ করে। তাদের উভয়ের পরিকল্পনা সেই রাজ্যের অত্যাচারী রাজা কামেশ্বরের অপসারণ। যাইহোক রত্নাকর এখন নামকরা দস্যু, পথিকদের সর্বস্ব অপহরণ করে নিয়ে পরিবারের সদস্যদের ক্ষুধানিবৃত্তি করা তার পেশা। এমনভাবে কাহিনীর অগ্রসর হতে থাকে, একদিন ব্রহ্মা ও নারদের সর্বস্ব রত্নাকরকর্তৃক অপহৃত হয়। ব্রহ্মা ও নারদের নির্দেশে পিতা চ্যবন, মাতা এবং স্ত্রী স্বস্তির কাছে জানতে চায় তার এই নরহত্যা ও লুণ্ঠনজনিত পাপের অংশীদার কে হবেন? তিনজনই পাপের ভাগীদার হতে নারাজ। এরপর রত্নাকরের আত্মচেতনা ফিরে আসে, ব্রহ্মার নির্দেশে রামনাম জপ করে এবং তপস্যায় ব্রতী হয়। তপস্যার প্রভাবে রত্নাকর প্রশান্ত হয়ে বাল্মীকিতে পরিণত হয়। নাটকটির অন্তিমে ধ্বনিত হয়েছে নায়ক রত্নাকরের দ্বারা উচ্চারিত ভরতবাক্য-

ত্বত্-সম্পর্কাদ্ গুরুরূপগতো বিশ্বদৃশ্বা দয়াবান্
মন্ত্র প্রাপ্তো হৃদি সমুদিতো যত্-প্রভাবাত্ স্বদেব।

অন্তস্তাপ প্রশমমগতমচ্চিত্তমেতত্ প্রশান্ত

কিং বা দেবী দিশতু যদিত কাম্যমন্যন্মমাস্তে।।[৩৯]

***প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটকের নামকরণ বিচার**:- ব্রহ্মা এবং নারদ বল্মীকের স্তূপের ভিতর থেকে আবিষ্কার করে তপস্যামগ্ন রত্নাকরকে, যে রত্নাকর এখন মহামুনি বাল্মীকিতে পরিণত। অর্থাত্ সেই প্রতাপবান দুর্দম দস্যু রত্নাকর আজ 'প্রশান্ত' রত্নাকরে রূপান্তরিত। সুতরাং তর্কাচার্য প্রদত্ত *প্রশান্তরত্নাকরম্* নামটি যথার্থ বলে মনে হয়। আচার্য মহাশয় বলেছেন-

'যদিদং প্রশান্তরত্নাকর নাম নবীন রূপক বাল্মীকে কবিকুলগুরোঃ পূর্বরূপস্য রত্নাকরস্য দস্যুবৃত্তিমাস্থিতস্য সুকঠোরকলুষবৃত্তিপ্রশান্তিমধিকৃত্য সন্নিবদ্ধমাস্তে'।[৪০]

নাট্যশাস্ত্রীয় বিচার:- সাহিত্যদর্পণাকার বিশ্বনাথ নাটকের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হল-

নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাত্ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতং।

বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবদ্-যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ।।

..... গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রন্তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্।।[৪১]

এই বৈশিষ্ট্যানুসারে তর্কাচার্য মহাশয়ের *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটকটি একটি সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর। কারণ এই নাটকের বিষয় রামায়ণ থেকে নেওয়া, নাটকের নায়কের সুখ দুঃখের বর্ণনা আছে, (যেমন রামায়ণে রামচরিত্র ও মহাভারতে যুধিষ্ঠির), নায়ক দিব্যব্যক্তি রত্নাকর(বাল্মীকি), নাটকের ভাষা সাবলীলগতিসম্পন্ন, বীররস নাটকের অঙ্গীরস (করুণরস ও শান্তরস অঙ্গরসরূপে সার্থকভাবে বিন্যস্ত), নয়টি অঙ্কবিশিষ্ট (পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ

পরিকীর্ত্তিতাঃ)। অনুষ্টুপ, উপজাতি, বসন্ততিলক, শালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দপ্রয়োগে সমুজ্জ্বল নাটকটি পাঠক ও দর্শকের কাছে উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।

রচনাশৈলী:- পরিচিত কাহিনী হলেও তর্কাচার্য মহাশয়ের নাট্যপ্রতিভা ও কবিপ্রতিভা এখানে অসামান্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দস্যু রত্নাকর তার দস্যুবৃত্তি থেকে কীভাবে তপস্যা করে মহামুনি বাল্মীকিতে পরিণত হয়ে 'প্রশান্ত' রত্নাকরে রূপান্তরিত হয়েছে সেই চরিত্রচিত্রণ অসামান্য কালীপদের লেখনীস্পর্শে। যেমন রত্নাকরের দস্যুসত্তা, পরবর্তিকালে মহামুনিসত্তা, রত্নাকরপিতা চ্যবন ও স্ত্রী স্বস্তির আদর্শনিষ্ঠা এক উজ্বল দৃষ্টান্ত।

নলদময়ন্তীয়ম্

গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল:- ১৯২০ সালে এই নাটকটি রচিত হয়ে প্রথমদিকে *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। তর্কাচার্য মহাশয় এই নাটকটি তার মূলাজোড় মহাবিদ্যালয়ে অভিনয়ের জন্য রচনা করেন বলে জানা যায়। উক্ত নাটকটির সমাপ্তিতে এই সময়কাল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়-

'সমুদ্রযুগ্মানলচন্দ্রমানে বঙ্গীয়বর্ষে মিথুনস্থসূরে।
গুরোর্দিনে সপ্তদশে সমাপ্তিম্ প্রাপ্তং নবীনং নলবৃত্তনাট্যম্।।[৪২]

অর্থাত্ সমুদ্রযুগ্মানলচন্দ্রমানে =৭২৩১=১৩২৭ (অঙ্কস্য বামা গতিঃ), বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৩ যোগ করলে ইংরাজি খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়, তাই সালটি হবে ১৯২০।

পরবর্তিকালে **১৯২৫** খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে এই নাটকটি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পায়। এইসময় তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় ও সাহিত্যাদির অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। এই নাট্যগ্রন্থের প্রারম্ভে ভূমিকা অংশ রচনা করেছেন

এই পরিষদের সম্পাদকদ্বয় পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী ও পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। গ্রন্থের 'নিবেদনম্' অংশে কাশ্যপকবি বলেছেন-

'অয়ি ভো নবরসপ্রিয়াঃ শ্রীমন্তঃ সহৃদয়াঃ! সুবিদিতমেবেদং ভবতাং যথা নলদময়ন্তীয়ং নাম কিমপি নবীনং নাটকং সংস্কৃতসাহিত্যপরিষত্পত্রিকায়াং যথাক্রমং প্রকাশিতমাস্তে'।[৪৩]

নাট্যগ্রন্থের উৎসানুসন্ধান:- মহাভারতের বনপর্বের নল-দময়ন্তী কাহিনী উক্ত নাটকের মূল আকর। বিদর্ভকুমারী দময়ন্তী ও নিষাদদেশের রাজা নলের প্রেমকথা এই নাটকের বিষয়বস্তু। অপেক্ষাকৃত নবীনবয়সে এই নাটকটি তর্কাচার্য মহাশয় রচনা করলেও এখানে নাট্যশাস্ত্রের রীতি যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে।

বিষয়বিন্যাস:- এটি সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট নাটক। প্রথমাঙ্কে ত্রিবিধ নান্দী শ্লোকে শৃঙ্গার দেবতা শ্রীহরি, দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সংহতি, তৃতীয় শ্লোকে গোপবধূদের বাঞ্ছিত শৃঙ্গার রসের স্তুতি করা হয়েছে। প্রথম শ্লোকটি এরূপ-

কালিন্দীকলগানসঙ্গতবিয়ত্সঞ্চারিবেণুস্বরো
রাধাকুঞ্জলতান্তসৌরভহরঃ শ্যামাপ্রভাসুন্দরঃ।
নন্দানন্দকরক্রিয়ামহচরো গোপোহৃদাং তস্করো
গোবিন্দো বিতনোতু বঃ শিবপদং শৃঙ্গারদেবো হরিঃ।।[৪৪]

সংক্ষিপ্ত নাটকের বিষয় হল- মহাভারতে পাশাখেলায় পরাজয়ের পর পাণ্ডবরা বনবাসী হলে, তাদের পাশাখেলায় নিদারুণ পরিণাম বোঝাতে গিয়ে আর এক হতভাগ্য রাজার কথা উল্লেখ করা হয়। তিনি হলেন নিষধরাজের অধিপতি নল, তিনি বীরসেনের পুত্র। বিদর্ভদেশের রাজা ভীমের অসামান্য রূপগুণসম্পন্না কন্যা দময়ন্তীর কথা শুনে নল তার

প্রণয়প্রার্থী হন, একটি হংসের মাধ্যমে তার এই মনোভাব দময়ন্তীর কানে গেলে তিনিও নলের প্রণয়প্রার্থী হয়ে পড়েন। এরপর রাজা ভীম স্বয়ংম্বর সভার ডাক দিলে বহু রাজা ও মহারাজার সাথে ও কয়েকজন দেবতা সেখানে উপস্থিত হন। নলের বিরূদ্ধে দেবতাগণ নানা বিবাদ দময়ন্তীর কর্ণগোচর করলেও সে নলকে মন থেকে মেনে নেয়, এবং পরিশেষে নলকে বরমাল্য প্রদান করেন। নল যথানিয়মে রাজ্যশাসন করতে থাকে।

তারপর নলের দুর্ভাগ্য শুরু হয়, কলি নলের দেহে প্রবেশ করে তাকে পাশাখেলায় প্রবুদ্ধ করে এবং ভাই পুস্করের সাথে পাশা খেলতে বসে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় ও দময়ন্তীকে নিয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করেন। তবে উভয়ের জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট নেমে আসলেও পরিশেষে নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন ঘটে এবং নলের রাজ্য ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার হয়।

নাট্যশাস্ত্রীয় বিচার:- নাটকের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাব্যশাস্ত্রীয় মতে এই নাটকের বৃত্তান্ত নির্বাচন (নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাত্), নান্দীশ্লোক, ভরতবাক্য, নাট্যকাহিনীর বন্ধন, নায়ক নির্বাচন, নাট্যরস, চতুর্থাঙ্কে বিষ্কম্ভকের ব্যবহার ও অন্যান্য ক্ষেত্র যথাযথ হওয়ায় এটি সার্থক নাটক হিসাবে পণ্ডিতসমাজে মান্যতা পেয়েছে।

রচনাশৈলী:- সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকটি প্রচলিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত হলেও উক্ত নাটকের শৈলী বাস্তবসমাজের উপর ভিত্তি করে যেন নির্মিত হয়েছে। কালের অনুরূপ এই নাটকটির সংলাপ, তাই কাশ্যপকবি নাটকের প্রস্তাবনা অংশে বলেছেন-

কালানুরূপরচনাপ্রচিতং যদি স্যাত্
কাব্যং তদা কবয়িতুঃ কবিতা চকাস্তি।
বীরস্য ভূষণমরাতিবধে কৃপাণং,
শৃঙ্গাররঙ্গসময়ে তদযোগ্যমেব।।[৪৫]

বস্তুত শৈল্পিক ভাষা ও কল্পলোকের সৃষ্টিতে কাশ্যপকবির কৃতিত্ব অসাধারণ, সেই সঙ্গে কাশ্যপকবি বাস্তবজগতকে অস্বীকার করেননি। তাই তো প্রেমের বিরহ, কপটতা, সমাজে মানবীয় ভাবনা, জীবনধারণ, কন্যাপিতার কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় কালীপদের লেখনীস্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আধুনিক নাট্য শৈলীতে প্রাকৃতভাষার ব্যবহার দেখা যায়, তাই তর্কাচার্য মহাশয় নাট্যচরিত্র কিরাতরাজের মুখে প্রাকৃতভাষার সংযোজন করেছেন।

এই নাটকের অনেকাংশে কাশ্যপকবি যেন মহাকবি কালিদাসের রচনাশৈলীকে অনুসরণ করেছেন- যেমন দুর্বাসার মত কলির চরিত্রের ব্যবহার, চতুর্থাঙ্কে বিষ্কম্ভকের ব্যবহার, ইত্যাদি। ভরতবাক্য প্রণয়ণে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের ছাপ স্পষ্ট-

পর্জন্যঃ কালবর্ষাহরণিমনুদিতং শস্যপূর্ণাং বিধেয়াত্
রাজানঃ সন্তু নিত্যং প্রকৃতিহিতকৃতে পুণ্যকৃত্যে নিমগ্নাঃ।
পাপং বিধ্বংসমাগং ব্রজতু কবিকুলং কাম্যলাভং বিধত্তাং
প্রেমণাং শুদ্ধিঃ সমৃদ্ধা ভবতু বিলসতাদ্ ভারতে স্বর্গশোভা।।[৪৬]

মাণবকগৌরবম্

গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল:- ১৯৫৮ সালে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে *মাণবকগৌরবম্* নাটকটি প্রকাশিত হয়। তবে প্রথমে এই নাটকটি *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা*তে ৩৮ থেকে ৪০ খণ্ডে নাটকটি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়।

নাট্যগ্রন্থের উৎসানুসন্ধান:- মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য বিরচিত সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট নাটক এটি। মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত আয়োধধৌম্য এবং তার কয়েকজন শিষ্য উপমুন্য, আরুণি, কাত্যায়ন, হারীত, বৈশম্পায়ন এবং কৌশিক প্রমুখের উপাখ্যান রয়েছে। সেই

উপাখ্যানকে প্রধান করে স্বকীয় নাট্যপ্রতিভা মিশ্রণ করে *মাণবকগৌরবম্* নামে এক অপূর্ব নাটক সৃষ্টি করেছেন। *মাণবক-গৌরবম্* ভূমিকা অংশে বলা হয়েছে-

...মহাভারতীয়াদিপর্বান্তর্গতং স্বল্পমাত্রমেকমুপাখ্যানমুপজীব্য নিজ-প্রতিভা-কল্পিতা-নল্পশিল্প-প্রভাবান্নানারসোদ্বোধক-বহুবিধপাত্র-দৃশ্যাদ্যুপন্যাসেন বিরচিতমেকং সহৃদয়-হৃদয়রোচকং মাণবক-গৌরবমিতি যথার্থনামধেয়ং রূপকম্'।[৪৭]

বিষয়বিন্যাস:- প্রথমাঙ্কে ত্রৈলোক্যনাথ মহাদেবের নান্দীশ্লোকের সাথে নাটকের শুভারম্ভ হয়েছে। নাট্যকার কালীপদের নান্দীশ্লোকের বর্ণনায় অপূর্ব বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়-

ভালে যস্য সুধাকরঃ সুরধুনী শীর্ষে জটামণ্ডিতে
কণ্ঠে কীকসমালিকা তনুগতা ভূতিঃ সিতা সর্বতঃ।
শার্দ্দূলাজিনমম্বরং ফণিময়ী বদ্ধা কটীমেখলা
সোঽয়ং বঃ শিবমাতনোতু সততং ত্রৈলোক্যনাথঃ শিবঃ।।[৪৮]

নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী হল গুরু ধৌম্যের সব শিষ্যেরা গুরুর আদেশ পালন করলেও ব্যতিক্রম ছিল শিষ্য হারীত। গুরু আদেশ তার আদপেই পছন্দ নয়। অন্য শিষ্যেরা গুরুর নির্দেশের নীরব পালনকারী হলেও হারীত কিন্তু প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। পরে হারীত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হলে আশ্রম থেকে বহিষ্কৃত এবং গুরুর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে নাটকের সপ্তমাঙ্কে উপমন্যু অন্যমনস্ক হয়ে অরণ্যে একটি কূপে পতিত হয় এবং দৃষ্টিশক্তি হারায়। তার ঐকান্তিক প্রার্থনায় অশ্বিনীদেবগণ সেখানে উপস্থিত হয় ও তাকে রোগমুক্তি করেন। গুরুভক্তিই উপমন্যুর একমাত্র অবলম্বন। পরবর্তিকালে হারীত মারণরোগ থেকে অব্যাহতি পায় গুরুর প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তির মাধ্যমে। পরিশেষে শিষ্যগণকর্তৃক

গুরুভক্তির গৌরবগানের মাধ্যমে ভরতবাক্যের উপস্থাপনা এবং নাটকের পরিসমাপ্তি। তাই এই নাটকের ভরতবাক্য উপস্থাপিত হয়েছে গুরুবন্দনার মাধ্যমে –

দীনা দৈবতভারতী গুণবতী সালঙ্কৃতিঃ সত্পদা
সৌভাগ্যাত্ সরসা রসায় জগতামাস্তাং বিশিষ্টক্রমা।
নিঃসঙ্গা বিহরন্তু শাস্ত্রবলয়ে ধীরাশ্চিরং যোগিনঃ
সর্বেষাং নয়শিক্ষণে গুরুপদং যাযাত সদা ভারতম্।।[৪৯]

নাটকের প্রতি পদে গুরুভক্তির নানান শ্লোক আমরা পাই, যা কিনা কালীপদ বিভিন্ন শিষ্যের মুখে সংলাপ তৈরী করেছেন। *মাণবকগৌরবম্* অর্থাত্ শিষ্যের গৌরব বা গুরুভক্তি। অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা ও কাব্যপ্রতিভার এক সমন্বয় ঘটেছে এই নাটকে। নাট্যকারের মূল বক্তব্য হল শিষ্যদের কাছে গুরুভক্তি একমাত্র আশ্রয়, এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

নাট্যশাস্ত্রীয় বিচার:- মহাভারতের আদিপর্বস্থ উপাখ্যানকে আপন মনীষাবলে অনেক পরিবর্তন সহযোগে সাত অঙ্কের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক উপহার দিলেন কাশ্যপকবি। নাটকের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ অনুসারে নান্দী, নাটকের বিষয় নির্বাচন, ভরতবাক্য, সন্ধি, প্রাকৃতভাষার ব্যবহার, নাট্য অঙ্কের আয়তন, নাট্য চরিত্র ও রস প্রভৃতি যথাযথ হওয়ায় এটি যথার্থ ও সার্থক নাটক নামে অভিহিত করা যায়।

এখানে নাট্যকারের বক্তব্য শিষ্যের কাছে গুরুভক্তিই একমাত্র আশ্রয়-‘নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়’- অবলম্বনের আর কোন রাস্তা নেই। গুরুভক্তিকে একটি নারী চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেছেন কাশ্যপকবি, তার মুখে নাট্যসংলাপ স্থাপন করা হয়েছে।

স্যমন্তকোদ্ধারম্

গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল:- তর্কাচার্য বিরচিত পাঁচটি দৃশ্যসমন্বিত নাটক হল 'স্যমন্তক-উদ্ধার-ব্যায়োগ'। এটি ব্যায়োগ শ্রেণীর। নাটকটি *প্রণবপারিজাত* নামক পত্রিকায় প্রথম বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়।

নাট্যগ্রন্থের আকর:- *পদ্মপুরাণ, ভাগবৎপুরাণ, স্কন্দপুরাণ* বা হরিবংশে উল্লিখিত কাহিনী নিয়ে এই নাটক নির্মিত। এই নাটকের নামের অর্থ হল স্যমন্তক মণির কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধার।

বিষয়বিন্যাস:- প্রারম্ভিক নান্দী-শ্লোকত্রয়ে রয়েছে বিষ্ণুর দশাবতারের বর্ণনা। প্রস্তাবনায় কৃষ্ণ ও সাত্যকির কথোপকথন থেকে এই ব্যায়োগের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে পাঠক অবহিত হন। স্যমন্তক হল একটি মহামূল্য এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্ দিব্যমণি, যেটি সূর্য দান করেন যাদবরাজ সত্রাজিত্‌কে। একবার এই মণিটি নিয়ে সত্রাজিত্ দ্বারকায় আসেন এবং মণিটি অনুজ প্রসেনকে দেন এবং প্রসেনও মণিটি নিয়েছে বলে প্রবেশ করে যা কৃষ্ণের নাগালের বাইরে চলে যায়। এরপর প্রসেন নিহত হলে জাম্ববান এই স্যমন্তকের মালিক হন।

এরপর অকালবসন্তের আবির্ভাব, বিষ্ণুশক্তি নামে বনদেবীর আগমন, কৃষ্ণ ও বনদেবীর কথোপকথন, জাম্ববানের বিরুদ্ধে বনদেবীর অভিযোগ, বিষ্ণুর বরে বিষ্ণুভক্ত জাম্ববানের ক্ষমতাবৃদ্ধি আখ্যান সবই কৃষ্ণের গোচরে আসে। শেষে জাম্ববানের সাথে কৃষ্ণের সংঘর্ষ, জাম্ববানের পুত্রের কাছে স্যমন্তক মণির দর্শন, কৃষ্ণকর্তৃক তনয় শিশু সুকুমারের কাছ থেকে স্যমন্তক লাভ। অন্তিমে জাম্ববান তনয়া জাম্ববতীর সাথে কৃষ্ণের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া- এখানে নাটকের পরিসমাপ্তি।

রচনাশৈলী:- বিষ্ণুভক্ত কর্তৃক বিষ্ণুর জয়গানই নাটকের মূল আকর্ষণ। নাট্যকার এবং কবি কালীপদ তাঁর নাট্যপ্রতিভা এবং কাব্যপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন এই নাটকটিতে। এই নাটকের অন্যতম শৈলী হল নাট্যমধ্যে বিবিধ প্রকার গীতের সমাবেশ। বনদেবী, জাম্ববতী আবার কখনও হরিভক্ত ভক্তগণের গীত পরিবেশিত হয়েছে। মৃদঙ্গসহযোগে এমন একটি হরিভক্তদের গীত হল-

জয়তি মধুসূদনো নন্দনৃপনন্দনো
নীলমণিরুচিরতনুধারী
তপনতনয়াতটে নীপতরুসঙ্গটে
মধুমধুরবেণুরবকারী।।[৫০]

এখানে সকলে যেন বিষ্ণুভক্তি পাবার জন্য অভিলাষী, তাই তো বনদেবী ও জাম্ববতীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে হরি স্তুতি। বিষ্ণুশক্তি নামে বনদেবী গীত রচনা করেছেন-

হে মধুসূদন ! সরসিলোচন ! কুরু করুণাং বনকুঞ্জে
প্রকৃতিং স্থাপয় বিকৃতিং নাশয় বনজশ্বাপদপুঞ্জে।[৫১]

অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, দৃষ্টান্ত অলংকারের সুন্দর বিন্যাস, ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রসম্মত বীররসের প্রয়োগ তর্কাচার্য মহাশয়ের অন্যান্য নাটকের মত এটি সহৃদয়ের মনে একটি স্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণকথিত একটি প্রচলিত কাহিনী এক অভিনব নাট্য আঙ্গিকে প্রস্তুত করে এই একাঙ্কবিশিষ্ট ব্যায়োগশ্রেণীর নাট্য উপস্থাপনা এক বিরল দৃষ্টান্ত বলা যায়, কাশ্যপকবির এ এক অভিনব প্রতিভা যা পণ্ডিতসমাজে মান্যতা পেয়েছে।

২. অনুবাদগ্রন্থসমূহ

কেবলমাত্র মৌলিক গ্রন্থরচনাতেই নয় অনুবাদ সাহিত্যে পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্যের অবাধ বিচরণ। অনুবাদ কর্মে বঙ্গীয় মনীষাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য বলা যায়। তাঁর অনুবাদের দক্ষতা ছিল উচ্চস্তরের। কালীপদ যে গ্রন্থসমূহের অনুবাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন সেগুলি হল-

ক. *গীতাঞ্জলিচ্ছায়া*

খ. *গীতাপ্রতিচ্ছায়া*

গ. *শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া*

ঘ. *যুগলাঙ্গুরীয়ম্*

ঙ. *দত্তা* উপন্যাস

চ. রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য

ছ. মৌলিক কাব্যানুবাদ

ক. *গীতাঞ্জলিচ্ছায়া* :- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ গ্রন্থ হল *গীতাঞ্জলিপ্রতিচ্ছায়া*। *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায়* ১৯৬০-১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই অনুবাদগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার খণ্ড ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮ অংশে অনুদিত কবিতাগুলি পাওয়া যায়। পরবর্তিকালে ১৯৬৯ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ এগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ২০১৫ সালে এই গ্রন্থের বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে ১৫৭টি কবিতার সংস্কৃত অনুবাদ রয়েছে। এটি *গীতাঞ্জলিঃ* নামক শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এর পূর্বে পণ্ডিত অমরেন্দ্রমোহন-তর্কতীর্থ ১৯২৯ সালে কবিগুরুর ভূমিকা সম্বলিত একটি সংস্কৃত *গীতাঞ্জলিঃ* গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তবে তা সম্পূর্ণ গ্রন্থ নয়। তর্কাচার্য মহাশয়ের এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ। অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকা সমন্বিত এবং তর্কাচার্যের 'অনুবাদকস্য নিবেদনম্' অংশ গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থ ভূমিকা অংশে বলেছেন-

'মহামহোপাধ্যায়পদলাঞ্ছনস্য শ্রীকালীপদতর্কাচার্যস্য কবিত্বশক্তিঃ সহৃদয়গোষ্ঠীষু সুবিদিতা। অনেন বিপশ্চিদগ্রেসরেণ বহবঃ সংস্কৃতকাব্যগ্রন্থা বিরচিতা যে নাম বিবুধচেতাংসি সুতরামাবর্জয়ন্তি। স কবিসার্বভৌমস্য রবীন্দ্রনাথস্য বঙ্গভাষাময়ানামনেকেষাং পদ্যানাং সংস্কৃতভাষয়ানুবাদে সন্নদ্ধো ভবতি। সাম্প্রতং তেন রবীন্দ্রনাথনির্মিতস্য গীতাঞ্জলিরিতি পদ্যাত্মকস্য গ্রন্থবিশেষস্যানুবাদো বিহিতঃ' ।[৫২]

এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ অংশে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

কাব্যানি গীতানি চ নন্দনানি
যস্যাংশভূতানি মহাবিভূতেঃ।
শব্দাত্মনে তামসভাস্করায়
নমোঽস্তু তস্মৈ পরমেশ্বরায়।[৫৩]

উক্ত গ্রন্থের অনুবাদকস্য নিবেদনম্ অংশে আচার্য মহাশয় আত্মপরিচয় বর্ণনা করেছেন।

প্রবীণ বয়সে তর্কাচার্য মহাশয়ের অনুবাদ অত্যন্ত সাবলীল ও ব্যাকরণসম্মত। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তর্কাচার্য

মহাশয় পরিষদ পত্রিকার থেকে বেশ কিছু সংশোধন করেছেন, সেইগুলি নিয়ে আলোচনার দিকদর্শন করা হচ্ছে। প্রথম কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে –

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।[৫৪]

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় তার সার্থক অনুবাদে যা করলেন-

(বিশ্বভারতী প্রকাশনা)	(*সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা*)
‘মম,-শীর্ষং নয় নতিময়ি ! তব	(মম)
চরণরেণুতলে।	
সকলমহংকারং মম	
মজ্জয়াশ্রুজলে।	(মজ্জয়াক্ষিজলে)
সাধয়িতুং স্বগৌরবম্,	
সদা দধে স্বপরিভবম্,	(দধে সদা)
বৃথা,-কেবলমাবেষ্ট্য নিজং	(ছিল না)

ভ্রমামি প্রতিপলে।

সকলমহংকারং মম

মজ্জয়াশ্রুজলে।[৫৫]

বিশ্বভারতী প্রকাশনায় এই অনুবাদ করা হলেও এর পূর্বে *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্ পত্রিকা*তে কিছু শব্দের ভিন্ন অনুবাদ পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতে 'অশ্রু' মানে হল 'চোখের জল', রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থে বহুবার এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটা শব্দব্যবহারের একটি বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু প্রথমে তর্কাচার্য মহাশয় 'অক্ষিজলে' এমন ব্যবহার করলেও পরে অনুবাদে গীতাঞ্জলির শব্দকে ধরে রাখার প্রয়াস করেছেন। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত এই যে যেখানে বাংলাতে অন্ত্যমিল আছে, সেখানে সংস্কৃতে অন্ত্যমিল দেবার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় (তব, মম) এবং (চরণরেণুতলে, মজ্জয়াশ্রুজলে) আবার (স্বগৌরবম্, স্বপরিভবম্)।

অন্য অনুবাদে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না, যেমন পণ্ডিত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ *গীতাঞ্জলিঃ* কাব্যগ্রন্থে এই একই কবিতার অনুবাদ করেছেন-

অবনময় শিরো মে নাথ তে পাদধূলৌ

নিখিলমদভিমানং মজ্জয়াশ্রুপ্রবাহে।

গরয়িতুমবমন্যে যোঽহমাত্মানমেব

ভ্রমিভিরভিত এবং মামজস্রং হতোঽস্মি।।

মম নময় শিরস্তন্নাথ কারুণ্য-সিন্ধো

নিরবধিমভিমানং মজ্জয়াশ্রুপ্রভাবে।।[৫৬]

খ.*গীতাপ্রতিচ্ছায়া* :- কেবলমাত্র সংস্কৃতভাষার অনুবাদে নয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদেও তর্কাচার্য মহাশয়ের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনুবাদ গ্রন্থের শিরোনাম দিয়েছেন

গীতাপ্রতিচ্ছায়া। এটি প্রথমে দেবযান পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ১৪১৫ বঙ্গাব্দে এই অনুবাদকর্মটি সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে প্রকাশিত হয়।

গ. *শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া* :- কালীপদ তর্কাচার্যের ভক্তি ছিল প্রবল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নেবার পর তিনি ভগ্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দে *শ্রীশ্রীচণ্ডীর* পদ্যানুবাদে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। কালীপদ বিরচিত *শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া* গ্রন্থটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ। ১৯৯৯ সালে আদ্যাপীঠ থেকে বেলাদেবীর ভূমিকা সহ *শ্রীশ্রীচণ্ডী* নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে উপলব্ধ। গ্রন্থটিতে আছে তিনটি চরিত ও ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গ্রন্থভূমিকা অংশ থেকে জানা যায় ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের নিকট থেকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন-

'আরম্ভ হল ন্যায়শাস্ত্র পড়া। সংস্কৃত কলেজের মহাচার্যের ক্লাসে গিয়ে পড়তাম। অনেক অধ্যাপকেরা ওনার কাছে পড়তে আসতেন....... পণ্ডিতমশাই এর সান্নিধ্য যত পাচ্ছি, শাস্ত্রের গভীরে যত ডুবছি ততই একটা দুরহ অনাস্বাদিত রাজ্যের মধ্যে যেন প্রবেশ করছি'।[৫৭]

ভূমিকাংশে এই বেলাদেবীর কথা থেকে জানা যায় যে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে প্রায় আসতেন এবং এখানে তিনি নাট্যাভিনয় মঞ্চস্থ করেন আদ্যাপীঠের বালিকাশ্রমের বালিকাদের নিয়ে। তিনি আরও বলেন আদ্যামায়ের ধ্যান মন্ত্রটি তর্কাচার্য মহাশয় রচনা করেন। মন্ত্রটির প্রথম দুটি শ্লোক এরূপ-

নিকষ-প্রস্তরশ্যামাং শীর্ষে মুকুটমণ্ডিতাম্‌।

ললাটে নেত্রচিহ্নেন ত্রিনেত্রীকৃতবিগ্রহাম্।।

অঘোরাং পদ্মপত্রাভবিশালস্মিতলোচনাম্।

সুকৃষ্ণপ্রজ্জ্বলদ্রূপনেত্রদ্বয়কনীনিকাম্।।[৫৮]

এই গ্রন্থে তর্কাচার্যপুত্র অধ্যাপক সোমেশ চক্রবর্তীর 'পিতৃতর্পণ' অংশে পণ্ডিত মহাশয়ের অনেক কথা জানতে পারা যায়। তর্কাচার্য পুত্র অধ্যাপক চক্রবর্তী গ্রন্থের 'পিতৃতর্পণ' অংশে বলেছেন-

'গ্রন্থকার পিতৃদেব অদ্বিতীয় তর্কশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। তা হলেও ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের গভীর অরণ্য অতিক্রম করেছেন সমগ্র জীবনে।... এ ছাড়া জ্ঞানোদয় অবধি প্রত্যক্ষ করেছি প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালীন জপাদির পরে তিনি *শ্রীশ্রীচণ্ডী*র অন্তর্গত 'দেবীস্তুতি' আবৃত্তি করতেন। তাঁর সেই আবেগমথিত কণ্ঠে হৃদয়ের গভীর থেকে তা উচ্চারিত হত-

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা

রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং

ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি'।[৫৯]

তখন নিজ জন্মের সার্থকতা অনুভব করে সেই জগন্মাতৃকার চরণে প্রণাম নিবেদন করেছি।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের তিনটি চরিত (প্রথম চরিত, দ্বিতীয় চরিত ও তৃতীয় চরিত) ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ত্রয়োদশ অধ্যায় তর্কাচার্য মহাশয় ভগ্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ্যানুবাদ করেছেন। প্রথম অধ্যায়- 'মধুকৈটভবধ' এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়-'দেবীর বরদান'।

মধুকৈটভ বধ নামক প্রথম অধ্যায়ের আচার্য মহাশয়ের পদ্যানুবাদটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, অনুবাদটি এরূপ-

ওঁ নমস্কার করি চণ্ডিকায়

ভাগুরিরে মার্কণ্ডেয় লাগিলা কহিতে।

সবর্ণা সূর্যের পত্নী।

তাঁর গর্ভে সূর্যের ঔরসে

সাবর্ণির হইল জনম।

চতুর্দশ মনুর মাঝারে

কথিত অষ্টম মনু সেই মহাজন।

শুন তাঁর উৎপত্তির কথা

যাহা আমি সবিস্তারে বলিতেছি তোমা।[৬০]

মার্কণ্ডেয় মুনির এই কথা দিয়ে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী আরম্ভ হচ্ছে। তর্কাচার্য মহাশয় এইভাবে সমগ্র চণ্ডীর পদ্যানুবাদ করেছেন সরল শব্দচয়ন করে। মূল সংস্কৃত শ্লোকটি হল-

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।

নিশাময় তদুত্পত্তিং বিস্তরাদ্-গদতো মম।।

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।

স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ।।[৬১]

ঘ. *যুগলাঙ্গুরীয়ম্* :- সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ উপন্যাস হল এই *যুগলাঙ্গুরীয়ম্*। সাহিত্যসম্রাটের সমগ্র *যুগলাঙ্গুরীয়* উপন্যাসটি তর্কাচার্য মহাশয় অনুবাদ করেন সংস্কৃত ভাষায় *যুগলাঙ্গুরীয়ম্* নামে। এটি আকারে ও পরিসরে অল্প আয়তনের

উপন্যাস, সাহিত্য সম্রাটের ভাষার গাম্ভীর্য বজায় রেখে এই উপন্যাসটির অনুবাদ করেছেন কাশ্যপকবি।

অনুবাদকর্মটি ১৯৬৬ সালে কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় 'বঙ্গকবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-যুগলাঙ্গুরীয়স্য সংস্কৃতানুবাদঃ, নিবন্ধকঃ-কাশ্যপকবিঃ' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

দশম পরিচ্ছেদে অনুবাদটি সম্পূর্ণ হয়, এই পত্রিকার ৪৮ নং খণ্ডে ক্রমান্বয়ে এই রচনাটি প্রকাশ পায়। হিরন্ময়ী ও পুরন্দরের ঐতিহাসিক প্রেমের উপাখ্যান এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। এই দুজনের প্রথমে সখ্যতা ও বিচ্ছেদ পরবর্তিকালে দৈবভাবে উভয়ের মিলন এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এক অসাধারণ উপন্যাস এটি। কাশ্যপকবি প্রথম পরিচ্ছেদে অনুবাদকর্মটি শুরু হচ্ছে এমনভাবে-

'উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে পাদনিষ্ঠকয়া সমবতিষ্ঠমানে জনযুগলে প্রাচীন-তাম্রলিপ্তনগর্য্যাঃ পাদং প্রক্ষালয়ন্ননন্তো নীলঃ সমুদ্রো মৃদুমৃদুনাদব্যাপারে ব্যাবৃত আসীত্। তাম্রলিপ্তনগর্য্যাঃ প্রান্তে সমুদ্রতীরে স্মিতো বিচিত্রঃ কশ্চিত্ প্রাসাদঃ। তত্সন্নিধানে কাচিত্ সুঘটিতা বৃক্ষবাটিকা। তস্যাঃ স্বামী ধনদাসো নাম কশ্চিত্ শ্রেষ্ঠী। তস্য দুহিতা হিরণ্যময়ী নাম লতামণ্ডপে তিষ্ঠন্তী, কেনাপি যূনা পুরুষেণ সমং বচনব্যাপৃতা সমবর্ত্তত'।[৬২]

ঙ. *দত্তা* উপন্যাস :- দরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত *দত্তা* উপন্যাসের সরল সংস্কৃত অনুবাদ করেছেন কাশ্যপ মহাকবি তর্কাচার্য মহাশয়। পারিবারিক সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে এটি একটি প্রেমের উপন্যাস। তর্কাচার্য মহাশয়ের এই অনুবাদটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সাবলীল। মূলকে বিকৃত না করে কথাসাহিত্যিকের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখে উক্ত অনুবাদ করেছেন কাশ্যপকবি। আলোচ্য উপন্যাসটি তিনটি প্রধান চরিত্র দিয়ে শুরু

হয়েছে বনমালী, রাসবিহারী ও জগদীশ। তাঁরা অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু ছিলেন। এই তিন বন্ধু গ্রামের বিদ্যালয়ে একসাথে পড়াশুনা করত। পরবর্তিকালে জীবিকানির্বাহের কারণে তারা অন্যত্র চলে যায় এবং একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এই চরিত্রের সাথে তিনবন্ধুর সন্তানাদির চরিত্র এই ঘটনাপ্রবাহে যুক্ত হয়। নানান ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই *দত্তা* উপন্যাসের বিস্তার। এই উপন্যাসে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এই *দত্তা* উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তার নাম দেন *বিজয়া*। উল্লেখ্য এই উপন্যাস অবলম্বনে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত একটি সিনেমা নির্মাণ করা হয়। কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সার্থক অনুবাদটির কিছু অংশ এরূপ-

'পুরা হুগলিশাখাবিদ্যালয়স্য প্রধানাধ্যাপকমহোদয়েন যে যাবত্ ত্রয়শ্ছাত্রাঃ বিদ্যালয়স্য রত্নত্বেন বিনির্দিষ্টাস্তে প্রতিদিনমেব ভিন্নেভ্যঃ স্ত্রিভ্যোঃ গ্রামেভ্যঃ ক্রোশসম্মিতং পন্থানং পাদচারেণাতিক্রম্যাধ্যায়নাযাগচ্ছন্তি স্ম। অহো! কিযদ্বা নাসীত্ ত্রয়াণাং পরস্পরং প্রেম....... ত্রয়াণামেব গৃহাণি হুগল্যাঃ পশ্চিমতোঽবস্থিতানি। জগদীশস্তাবত্ সরস্যত্যাঃ সঙ্কমং সপ্ততিক্রম্য দিঘড়াগ্রামাদাগচ্ছতি স্ম, বনমালিরাসবিহারৌ চান্তরবর্তিভ্যাং গ্রামাভ্যাং কৃষ্ণপুররাঘাপুরাভ্যাম্'।[৬৩]

চ. রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য:- উল্লিখিত অনুবাদ গ্রন্থগুলি ছাড়াও তর্কাচার্য মহাশয় অনেক রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করেন। যেমন ১৯৬০ সালে *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায়* পরিশোধকবিতা, প্রস্থান অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন (গান্ধার্য্যাবেদনম্),

মেঘদূতম্, কুমারসম্ভবং শাকুন্তলঞ্চ (কবিরবীন্দ্রকৃতে প্রাচীনসাহিত্যে) কাব্যগ্রন্থের সুললিত সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করেন।

ছ. মৌলিক কাব্যানুবাদ :- পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কাব্যানুবাদ ব্যতীত তিনি মৌলিক কাব্যানুবাদ করেছেন যার সংখ্যা কম নয়। *সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায়* (প্রকাশকাল-অক্টোবর ২০০৯-মার্চ ২০১০ (১-২), খণ্ড-৯২) অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস মহাশয়ের সম্পাদনায় তার মৌলিক কাব্যানুবাদগুলি উক্ত নামে প্রকাশিত হয়েছে।

মহামহোপাধ্যায়-কালীপদতর্কাচার্যরচনাকণাঃ- উক্ত শিরোনামে তর্কাচার্য মহাশয়ের রচনাগুলি পাওয়া যায়। আচার্য মহাশয়ের বেশ কিছু রচনা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে, রচনাগুলি পত্রিকার নানা সংখ্যা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে তর্কাচার্য মহাশয়ের দুটি প্রবন্ধ, তিনটি রবীন্দ্রকাব্যের সংস্কৃত অনুবাদ এবং স্বরচিত কাব্যকৃতি স্থান পেয়েছে। রচনাগুলি নিম্নরূপ-

i. সারস্বত-কাব্যপুরুষঃ
ii. পারিভাষিকপদার্থবিবৃতিঃ
iii. ঈশাভিবন্দনম্
iv. শুভাশংসনম্
v. মাধবী-প্রকৃতিঃ
vi. বিরহিনীবিলাপঃ
vii. মধুরপ্রয়াণপঞ্চকম্
viii. নিদাঘপ্রকৃতিচ্ছায়া

ix. বর্ষা-প্রথমবিভ্রমঃ

x. ভগবদন্বীক্ষা

xi. কৌতুককথা

xii. মুরলীরবঃ

xiii. আলোকতিমিরসংবাদঃ

xiv. আলোকং প্রতি তিমিরোত্তরম্

xv. শারদী

xvi. ঘনাগমঃ

xvii. যথার্থ-আত্মীয়ঃ

xviii. বসন্তপ্রকৃতিঃ

xix. নির্ঝর-স্বপ্নভঙ্গঃ

xx. মিলিন্দ-নাগসেনসংবাদঃ

xxi. হেমন্তসুষমা-গাথা

xxii. শারদযমকম্

xxiii. বসন্তযমকম্

xxiv. শারদমাতৃপুজা

xxv. দেবতাগ্রাসঃ

xxvi. সুভাষিতানি

৩. স্বকীয় টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

কাশ্যপকবি কালীপদ তর্কাচার্যের সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক বলা যায়। তিনি বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় সুললিত টীকা লেখেন পাঠকগণের উপকারার্থে। এ ছাড়াও তিনি মূল গ্রন্থ আরম্ভ হবার পূর্বে সেই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করেছেন গ্রন্থের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করার জন্য। এমনকি তিনি সংস্কৃতের প্রথম পাঠার্থীর জন্য অনুবাদশিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থগুলি হল –

১. *মেঘদূতম্* :- ১৯৩৪ সালে অধ্যাপক গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে কালীপদ তর্কাচার্য *মেঘপ্রভা* টীকা সহিত ছাত্র পুস্তকালয় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি সেইসময় কাব্যোপাধি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১৬ সালে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হলেও ১৯৩৪ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পুনরায় প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য তর্কাচার্য মহাশয় প্রথম জীবনে গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য মহাশয়ের মালিকাধীন ছাত্র পুস্তকালয়ে গ্রন্থ প্রকাশের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাই এই প্রকাশন থেকে তর্কাচার্য মহাশয় অনেক গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। শতবর্ষ পুরাতন এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে।

মূলত মল্লিনাথকৃত *সঞ্জীবনী* টীকা, প্রকাশকদ্বয়কৃত *মেঘপ্রভা* টীকা, বঙ্গভাষানুবাদ, হিন্দী ভাষানুবাদ, উইলসনকৃত ইংরেজি ভাষানুবাদ ও বিস্তৃত ভূমিকাসহ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রথমে ১৮ পৃষ্ঠার সমালোচনা অংশে মেঘদূতের খণ্ডকাব্যত্ব বিষয়ে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা দেখা যায়। এই ‘সমালোচনা’ অংশে সম্পাদকদ্বয় *মেঘদূত* ও কালিদাস সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং এই সুললিত খণ্ডকাব্যের আলোচনায় মল্লিনাথকৃত *সঞ্জীবনী* টীকা যে খুব সহায়ক তা বলেছেন।

২. *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* :- মহাকবি কালিদাসের বিরচিত নাটক হল *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*। রাজা অগ্নিমিত্র ও নর্তকী মালবিকার প্রেমকাহিনী নিয়ে এই নাটকের বিস্তার। ১৯৩৭ সালে *বিজয়া* টীকাসহিত গ্রন্থটি গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাথে তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি সেই সময় কাব্য মধ্য পরীক্ষার জন্য পাঠ্য ছিল। বর্তমানে পণ্ডিতপ্রবর রামশাস্ত্রী মহাশয় দ্বারা পরিশোধিত হয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। গ্রন্থের প্রথম শিরোনাম পৃষ্ঠায় লেখা 'বিজয়াখ্যয়া টীকয়া বঙ্গভাষানুবাদান্বয়-সমালোচনা প্রভৃতিভিশ্চ সমলঙ্কৃতম্'। মঙ্গলাচরণ অংশে টীকার প্রণয়নের কারণ বলতে গিয়ে বলা হয়েছে-

> ব্যাখ্যায়াং গুণদোষাদ্যা যথাস্থানমুদীরিতাঃ।
> অলংকারাদিকাশ্চাপি জ্ঞাতব্যা বিষয়স্তথা।।
> জ্ঞাতব্যো বিষয়ঃ কোঽপি ন তত্র পরিশিষ্যতে।
> তস্মানাম্নাপি বিজয়া বিজয়ৈব ভবিষ্যতি।।[৬৪]

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বর্তমানে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

৩. *দশকুমারচরিতম্* :- কবিবর মহাকবি দণ্ডী প্রণীত *দশকুমারচরিতম্* গ্রন্থটি তর্কাচার্য মহাশয় ১৯৩৭ সালে স্বকৃত *জয়া* টীকাসহিত অধ্যাপক গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাথে সম্পাদনা করে প্রকাশ করে। এই গ্রন্থটিও ছাত্র পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অপহারবর্মাচরিত পর্যন্ত আলোচিত। গ্রন্থ শিরোনামে পৃষ্ঠায় লেখা – 'জয়াখ্যয়া টীকয়া সুবিস্তৃত-বঙ্গানুবাদ-হিন্দিভাষানুবাদ-কবিবৃত্তান্ত-কাব্যসমালোচনা-প্রভৃতিশ্চ সমলঙ্কৃতম্'। গ্রন্থটি সেই সময়ে সরকারি কাব্যের দ্বিতীয় পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত ছিল- 'গভর্ণমেণ্ট-কাব্য-দ্বিতীয়-পরীক্ষাপাঠ্যম্'। সম্পাদিত গ্রন্থের কবিবৃত্তম্ অংশে মহাকবি দণ্ডীর বিষয়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হয়েছে। আলোচনাটি শুরু হয়েছে এই বলে-

‘কবিকুলললামভূতো দণ্ডী ভূমণ্ডলে বিস্তার্য্য কাব্যকলামতিবিখ্যাত জাত ইতি বিদিতমস্তি সর্বেষামেব কাব্যানুশীলনশুদ্ধবুদ্ধীনাং সতাম্। নানাগুণগুম্ফিতানি চাস্য কাব্যানি সন্ততমেব কাব্যেষু প্রাধান্যমস্য প্রখ্যাপয়ন্তি...’ ।[৬৫]

এরপর গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তকথা অংশে বিবৃত করা হয়েছে- ‘আসীত্ মগধেষু পুষ্পপুরী নাম নগরী। তস্য রাজহংসস্য রাজ্ঞী বসুমতী নাম মহিষী। অতপর সোমদত্তচরিত, পুষ্পোদ্ভব-চরিত, অপহারবর্মাচরিতের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তিকালে ‘অথ মঙ্গলাচরণম্’ অংশে দশকুমারচরিতের বিষয়, টীকার প্রয়োজনীয়তা, পাঠকদের কাছে ত্রুটির মার্জনা বিষয়ক ১০টি শ্লোকের অবতারণা করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি শ্লোকে বলা হয়েছে-

কবিনা তেন নিবন্ধং দশকুমারমুত্তমং কাব্যম্।
ব্যাখ্যামস্য বিধাস্তে জয়াভিধানাং নিবেশেন।।
গুণমাধুর্য্যসংজ্ঞোঽচ রীতিঃ পাঞ্চালিকা মতাঃ।
শৃঙ্গারো রস একাঙ্গী কুমারা দশ নায়কাঃ।।
প্রধাননায়কস্তত্র কুমারো রাজবাহনঃ।
অবন্তিসুন্দরী চাপি নায়িকাস্তত্র মহত্তমা।।
অসৌ টীকা জয়ানাম্নী নামব্যুত্পত্তিযোগতঃ।
বিজিত্য সকলাং ব্যাখ্যাং ভূয়াদেব যশস্বিনী।।[৬৬]

এই *জয়া* নামক টীকাতে আচার্যদ্বয় আলংকারিক আলোচনা, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, শব্দকোষ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে প্রায় প্রতি পদের বিশ্লেষণ করে কাব্যটিকে মহিমান্বিত করেছে।

৪. *মহানাটকম্* :- ১৯৫৫ সালে *তত্ত্বদীপিকা* টীকাসহিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় সংস্কৃত বুক ডিপো থেকে এটি প্রকাশ করেন। রামচন্দ্রের রচিত প্রকাশক শ্রীমান হনুমানের রচিত এই *মহানাটক*। তবে এখানে এই নাটকের চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এর গ্রন্থটি টীকাসহিত প্রকাশ করেন। সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদ্ পরিগৃহীত কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় এই গ্রন্থটি সেইসময় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্গত ছিল। কারণ গ্রন্থের উপরে লেখা- 'সংস্কৃত–শিক্ষাপরিষদ-পরিগৃহীত- কাব্যোপাধি-পরীক্ষাপাঠ্যম্'। তর্কাচার্য মহাশয় এই *মহানাটকের* *তত্ত্বদীপিকা* টীকার প্রারম্ভে বলেছেন-

হরিদাসতনুজেন শ্রীকালীপদশর্ম্মণা।
মহানাটকটীকেয়ং ক্রিয়তে তত্ত্বদীপিকা।।[৬৭]

গ্রন্থের প্রথম অঙ্কের অন্তিম শ্লোকের যে অনুবাদ করেছেন তর্কাচার্য মহাশয় তা থেকে এই *মহানাটক* গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা যায়। কাশ্যপকবিকৃত শ্লোকটির অনুবাদটি এরূপ-

'শ্রীমান হনুমানের রচিত বীর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের রচিত প্রকাশক রাজা বিক্রমাদিত্য দ্বারা সমুদ্র হইতে সমুদ্ধৃত মিশ্রোপাধিক শ্রীমধুসূদন কবি দ্বারা পূর্বাপরসমন্বয়ে গ্রন্থরূপে সুসজ্জিত সুন্দর মহানাটকগ্রন্থের বিদেহতনয়ালাভ নামক প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল।[৬৮]

৫.*বিষ্ণুপুরাণম্* :- *বিষ্ণুপুরাণ* হল অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে অন্যতম মহাপুরাণ। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে (১৯৬৬ সাল) শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত *সনাতনশাস্ত্রম্* গ্রন্থে কালীপদ তর্কাচার্যকৃত *বিষ্ণুপ্রভা* পাদটীকাসহ *বিষ্ণুপুরাণ* প্রকাশিত হয়। তবে এই টীকাটি শ্রীধরস্বামীকৃত টীকার আধারে রচিত। এই গ্রন্থের প্রধান সম্পাদকবৃন্দ ছিলেন পণ্ডিত

কালীপদ তর্কাচার্য, অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। টীকার প্রারম্ভেই তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

শ্রীমদ্-বিষ্ণুপুরাণস্য টীকায়াঃ শ্রীধরস্য চ

ক্রীয়তে পাদটীকেয়ং শ্রীকালীপদশর্মণা।।[৬৯]

৬. *বেণীসংহারম্* :- ভট্টনারায়ণ বিরচিত বীররসপ্রধান নাটক হল *বেণীসংহার*। ষষ্ঠাঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকের আখ্যানভাগ মহাভারতের অন্তর্গত মহাসমরে ভীমকর্তৃক দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন হল এর প্রধান বিষয়বস্তু।

তর্কাচার্য মহাশয় *কঙ্কতিকা* টীকাসহিত এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রথমে 'বেণীসংহার-সমালোচনম্' তারপর 'বেণীসংহারস্য সংক্ষিপ্তবিবরণম্' আলোচনা করে গ্রন্থারম্ভ করা হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয় *কঙ্কতিকা* টীকার প্রারম্ভে বলেছেন-

শ্রীনাথং মত্কুলে নাথং গণেশং ভুবনেশ্বরম্।

নিপত্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রণমামি গুহাশয়ম্।।

যচ্ছক্তিবিন্দুসম্বন্ধাচ্ছক্তিমন্তঃ শিবাদয়ঃ

তস্যাঃ সারস্বতীং শক্তির্মানসে রমতাং মম।।

শ্রীকালীপদমানম্য শ্রীকালীপদকাঙ্ক্ষয়া।

শ্রীকালীপদনাম্নেয়ং বিবৃতিঃ ক্রিয়তে ময়া।।

বেণীসংহারবস্তূনাং বিশোধনধিয়াঽধুনা।

নবীনচ্ছত্রহস্তেষু ন্যস্তা কঙ্কতিকা পুনঃ।।[৭০]

রামকৃষ্ণমিশন গোলপার্ক গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আছে।

৪. নানাবিধ পত্রিকায় প্রাপ্ত রচনাকৃতি

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্যদর্শন, পুরাণশাস্ত্র, শ্রব্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য ও প্রকীর্ণবিষয় অবলম্বনে আচার্য মহাশয়ের সৃষ্টির বারিধারা যেন বহিছে ভুবনে বলা যায়। এ সকল সৃষ্টি ছাড়াও নানান পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনাসম্ভার অসংখ্য তা বলা যায়। কর্মজীবনের আরম্ভে এই পত্র-পত্রিকার লেখনীকার্য ও প্রকাশকার্যের সাথে আচার্য মহাশয় নিযুক্ত হন।

এই পত্রিকাগুলিতে শুধু দার্শনিক বা কাব্যিক বিষয়ই নয়, এখানে বাস্তবজীবনের সুখ, দুঃখ, অনুভূতি, আনন্দ ও জীবনবোধের প্রকৃত আদর্শবোধ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সেই রচনাশৈলী মহাকাব্যিক পর্যায়ে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। যে সকল পত্রিকায় আচার্য মহাশয়ের রচনাকৃতি উপলব্ধ হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল- *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্ পত্রিকা, মঞ্জূষা পত্রিকা, ভারতবর্ষ, সংস্কৃত পদ্যবাণী, আর্যশাস্ত্র, সনাতনশাস্ত্র, বিদ্যোদয়, সংস্কৃত প্রতিভা পত্রিকা, দেবযান, প্রেমপুষ্প, সুদর্শন, প্রবাসী, সারস্বতী সুষমা* ইত্যাদি।

১. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা*

কলকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ শ্যামবাজারে রাজা দীনেন্দ্রনাথ স্ট্রীটে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি শতবর্ষ প্রাচীন ও সেকালের সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ের কলকাতার বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত সমাজের প্রচেষ্টায় এই পরিষদটি **১৯১৬** সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্যপকবি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় তার কর্মজীবন আরম্ভ করেন **১৯১৮** সালে, এই পরিষদের টোল বিভাগের স্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করে। এই সময় থেকে পরিষদ পত্রিকার সহকারি সম্পাদক এবং পরবর্তিকালে সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত

হন। খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় অনন্তলাল ঠাকুর তাঁর *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য* প্রবন্ধে বলেছেন –

'এই সময় (১৯১৬-১৭) কলিকাতার বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত সমাজের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা হয়। তর্কাচার্য মহাশয়কে উহার আচার্যপদে বরণ করা হয়। গুরুদেব মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম তথা পিতৃদেব পণ্ডিত হরিদাসের শুভাশীর্বাদে সমৃদ্ধ হইয়া তিনি অধ্যাপক জীবন আরম্ভ করেন'।[৭১]

এই পত্রিকায় একজন সম্পাদক ও একজন সহ সম্পাদক থাকত। পত্রিকাটির নাম ছিল *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদো মাসিকং মুখপত্রম্* (*Monthly Organ Of The Sanskrit Sahitya Parishat*)। অদ্যাবধি এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এই পরিষদ্ পত্রিকায় তর্কাচার্য মহাশয়ের সুধাময়ী রচনাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। তার অধিকাংশ রচনাকৃতি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কেবলমাত্র গবেষণা প্রবন্ধই নয়, সেই সাথে মহাকাব্য, দৃশ্যকাব্য, নানা অনুবাদিত রচনাসমূহ উক্ত পত্রিকার প্রকাশিত হয়। আচার্য মহাশয়ের লেখনীস্পর্শে যেন ধন্য হয়েছে পরিষদের বিদ্যামন্দির। তাই তো সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের স্তুতিবাক্য করে পণ্ডিত বিধুভূষণ সপ্ততীর্থ ভট্টাচার্য মহাশয় সুললিত ভাষায় গীত রচনা করেছেন-

ইয়মিহ বুধজনমানসকন্যা
সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্ ধন্যা
দিশি দিশি বন্দিতা
মহিমসমন্বিতা
পরিষত্ সকলবরেণ্যা।[৭২]

নিম্নে বিবিধ পত্রিকায় অদ্যাবধি প্রাপ্ত তর্কাচার্য মহাশয়ের রচনাগুলি প্রদত্ত হল-

ক. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯২৭, খণ্ড(Vol)-১০, সম্পা. মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য, সহ সম্পা. শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

হরিশ্চন্দ্রকথা:- এখানে নিবন্ধকের নাম আছে শ্রীকালীপদকাব্যতীর্থ সূত্রবিশারদ। পত্রিকার উক্ত খণ্ডের ৩৪, ৯৩, ৪৬১, ৪৬৯ নং পৃষ্ঠায় উক্ত কাহিনীর বর্ণনা আছে। এখানে মূলত দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। *মার্কণ্ডেয়পুরাণ* ও *দেবীভাগবতে* এই কাহিনী পাওয়া যায়। মূল কাহিনী নিয়ে কাশ্যপকবি আপন রচনাশৈলীতে রচনা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কাহিনী আরম্ভ হচ্ছে এমনভাবে-

অথ তাবত্ কথান্তরং হরিশ্চন্দ্রস্য সর্বস্বদানমধিকৃত্য প্রচলিতং প্রস্তূয়তে। কথৈষা মার্কণ্ডেয়ং দৈবীভাগবত চ ইতি পুরাণদ্বয়ে এব প্রাপ্যতে। অন্যত্র কাপি ন লক্ষীকৃতামস্মাভিঃ। অত্র মার্কণ্ডেয়পুরাণীয়া কথা এব মুখ্যত আলম্বিতা, বিশেষাশ্চ তত্র তত্র স্থানে বক্তব্যাঃ।

সাংখ্যকারিকা[৭৩]:- এই পরিষদ্ পত্রিকায় গ্রন্থ্ সমালোচনা নামক একটি অংশ প্রকাশ করা হত, সেখানে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের গঠনমূলক সমালোচনা করা হত। পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটি *গৌড়পাদভাষ্য* সহিত *ভাষ্যপ্রভা* স্বকীয় টীকা দিয়ে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটির সমালোচনা করেন তর্কাচার্য মহাশয়ের ছাত্র পণ্ডিত দুর্গামোহন সাংখ্যতীর্থ মহাশয়। পণ্ডিত দুর্গামোহন মহাশয় এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

খ. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯২৮, খণ্ড-১১, সম্পা. কালীপদ তর্কাচার্য, সহ সম্পা. শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

মতিমঞ্জরী[৭৪]:- পরিষদ্ পত্রিকার সম্পাদক ও সহ সম্পাদক এই মতিমঞ্জরী অংশে নিজস্ব বক্তব্য প্রতিপাদন করতেন। সেখানে সভার কার্যবিবরণী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় এখানে আলোচনা করা হত। যেহেতু তর্কাচার্য মহাশয় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তাই এই পত্রিকার মতিমঞ্জরী অংশ আচার্য মহাশয়ের। এই মতিমঞ্জরীর শীর্ষক নাম *বিজয়াভিভাষণম্*। অর্থাত্ দুর্গাপূজার পর বিজয়াদশমীর উপলক্ষ্যে গুরুজনদের প্রণাম ও কনিষ্ঠদের আশীর্বাদ এখানে বিবৃত হয়েছে।

শোকাশ্রুধারা[৭৫]:- সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পূর্বতন সম্পাদক পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে পরিষদের পক্ষ থেকে একটি সংস্কৃত শোকজ্ঞাপনের কবিতা তর্কাচার্য মহাশয় রচনা করেন। সমস্ত কবিতায় এক শ্রদ্ধাপূর্ণ শোকবার্তা দেওয়া হয়েছে-

শশধরং করধারাং কিং মুধা হন্ত দত্সে
মলয়পবন ! নূনং ব্যর্থ এবাদ্য বাসি।
কুসুমঃ তব বিচিত্রং হাস্যমাস্তা বিদূরে
যত পশুপতিনাথো দেবভূমিং প্রয়াতঃ।।
পশুপতে! ক্ক গতোঽসি মহামতে! পরিষদং পরিহায় চিরপ্রিয়াম্।
সপদি সা বিরহেণ তবাকূলা বিলপতি প্রতিকর্মণি দুর্বলা।।

উল্লেখ্য সম্পাদক পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে অন্যান্য পণ্ডিতগণও শোকজ্ঞাপন করেছেন – যেমন শ্রীকুঞ্জবিহারীতর্কসিদ্ধান্ত, বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীশালগ্রাম শাস্ত্রী, শ্রীসত্যদেব শাস্ত্রী, শ্রীজগদীশ শাস্ত্রী প্রমুখ।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ১৯২৯ সালের ১২ তম বর্ষের পত্রিকা সম্পাদক তর্কাচার্য মহাশয় ছিলেন, তবে এই পত্রিকায় তার কোন রচনাকৃতি পাওয়া যায় নি।

গ. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯৩১, খণ্ড-১৪, সম্পা. শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহ সম্পা. শ্রীউপেন্দ্রমোহন সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

শোকাশ্রুনির্ঝর:- ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত বামাচরণন্যায়াচার্যভট্টাচার্য (১৮৮০-১৯৩১) মহাশয়ের পরলোকগমনের ফলে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে যে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এই নিবন্ধটি পাঠ করা হয়।

পণ্ডিত বামাচরণ ভট্টাচার্য পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের আদিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা শশীভূষণ ও মাতা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি কাশীর সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। এরপর বামাচরণ বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, গদাধরচন্দ্র শিরোমণি প্রমুখ। পরবর্তিকালে তিনি ন্যায়াচার্য উপাধিতে ভূষিত হন।

বামাচরণ ন্যায়াচার্য এরপর কাশীর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। এইসময় ভারতবর্ষের নানাপ্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ নিতে আসত। তাঁর প্রসিদ্ধ বিদ্যার্থিগণ হলেন- পণ্ডিতরাজ রাজেশ্বর শাস্ত্রী, দুণ্ডিরাজশাস্ত্রী ন্যায়াচার্য, রমেশচন্দ্র তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, সতীশচন্দ্র তর্কতীর্থন্যায়াচার্য, আশুতোষ ন্যায়াচার্য প্রমুখ। বামাচরণ ন্যায়াচার্য মহাশয়কে ১৯২২ সালে বিদ্যাচর্চায় অসামান্য অবদানের জন্য মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি* গ্রন্থটি স্বকীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বিবৃতি সমেত সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

কাশ্যপমহাকবি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় বামাচরণ ন্যায়াচার্যের মহাপ্রয়াণে যে শোকজ্ঞাপন করে সুললিত সংস্কৃত কবিতা রচনা করেছেন তা হল এরূপ-

যাতোঽস্তং তপনঃ সুধাংশুকিরণা লুপ্তা নভঃ প্রাবৃতং

জীমূতৈরতিভীষণৈঃ প্রতিদিশং ধ্বান্তং সমুজ্জৃম্ভতে।

সূচীভেদ্যতমোবিভেদনিপুণা বিদ্যুন্ন বিদ্যোততে

দৃষ্টির্নশ্যতি বিশ্বমেব তমসামেকায়নং দৃশ্যতে।।

পূর্বস্যামুদিতঃ পবিত্রসবিতা দিব্যপ্রভামণ্ডলৈঃ

সর্ব্বা এব দিশো বিধায় বিমলা যাতো দিশং পশ্চিমাম্।

হা হা হন্ত চিরং ততোঽপি ন বিধেঃ সহ্যা তদীয়া স্থিতিঃ

কালে সোঽদ্য গতো লয়ং শিবপুরে শ্রীবিশ্বনাথেশ্বরে।।

বিদ্যাদানকুতূহলেন কিল যো বারাণসীপত্তনে

বাসং কল্পিতবাননল্পগরিমা যুক্তঃ স্বকীয়ৈর্গুণৈঃ।

শিষ্যা যস্য পরঃশতাঃ ভুয়সমা দীপ্তা দিশস্তন্বতে

সোঽয়ং হন্ত লয়ং গতঃ শিবপুরে শ্রীবিশ্বনাথেশ্বরে।।

ঘ. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯৩৫-৩৬, খণ্ড-১৮, সম্পা. শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহ সম্পা. শ্রীউপেন্দ্রমোহন সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

মহাকবিমাঘ[৭৬]**:-** মহাকবি মাঘের কাব্যপ্রতিভা এখানে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় আলোচনা করেছেন। এই শোধ নিবন্ধটি শুরু হয়েছে একটি অপূর্ব শ্লোক দিয়ে। শ্লোকটি এরূপ-

যতকারুণ্যসুধারসস্য কণিকাং তাপত্রয়োচ্ছেদিনী

স্বাদং স্বাদমশেষদুঃখজলধি লোকাস্তরন্তি ক্ষণাত্।

নিত্যং কল্পলতেব যা সুতগণয়েষ্টং মহদ্ যচ্ছন্তি

তাং বাণীং করূণামৃতব্ধিনিলয়ং বন্দে জগন্মাতরম্।।

এখানে *কবিনিরূপণম্* অংশে মহাকবি মাঘের কালনিরূপণ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রতিপাদন করা হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয় প্রথমেই খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, আমাদের

দেশের মহাকবিরা আত্মপরিচয় ও নিজেদের সময়নিরূপণ প্রসঙ্গে উদাসীন থেকেছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মহাকবি কালিদাস, তিনি বিপুল কাব্যনাটকাদি রচনা করলেও আত্মপরিচয় সম্বন্ধে নিরব থেকেছেন।

মহাকবি মাঘ তাঁর কাব্যে রচনাকাল ও আত্মপরিচয় প্রদান করেননি। তাই এই প্রসঙ্গে কালনিরূপণ একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ কোন কবির সময় নির্ধারণ না করলে সেই সময়কার বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা যাবে না। তার রচনাশৈলী ও বাগবিন্যাস কালের সময়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এখানে মহাকবি মাঘের সময়নির্ধারণ করতে গিয়ে নানান আলংকারিকদের মতামতের উত্থাপন করেছেন। এই আলংকারিকগণের মধ্যে *ধ্বন্যালোক* রচয়িতা আনন্দবর্ধন, *কাব্যপ্রকাশ*কার মম্মটাচার্য, *কাব্যালংকারসূত্র*বৃত্তিকার বামনাচার্য ইত্যাদি। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'মহাকবিরয়ং জন্মনা কং দেশমলকার্ষীন, কস্মিন্ সময়ে চ প্রার্দুভূবেতি দুরনুমেয়ম্ এব নিয়তমনুসন্ধানপরৈরপ্যাধুনিকৈঃ পণ্ডিতবয়ৈঃ। প্রায়শ এব এতদ্দেশীয় মহাকবয়ঃ স্ববংশগৌরবপ্রখ্যাপনে আত্মনঃ স্থিতিকালনিরূপণে চ উদাসীনা এবাসন। অস্মিন্ বিষয়ে মহাকবিঃ কালিদাস এব প্রকৃষ্টতমুদাহরণম্ প্রথমতৌ মাঘপ্রণিতে শিশুপালবধনাম্নি অস্মত্ সমালোচনীয়ে গ্রন্থে যাদৃশ্যস্তস্য পরিচয়ো লভ্যতে তং বিবৃণোমি।[৭৭]

ঙ.*সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯৪০-৪১, খণ্ড-২৩, সম্পা. মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী, সহ সম্পা. শ্রীউপেন্দ্রমোহন-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

গ্রন্থনিকষঃ[৭৮]:- এটি একটি গ্রন্থ সমালোচনা অংশ যা কিনা গ্রন্থ প্রশংসা বলে বিবেচিত হয়েছে। নিবন্ধটির পরীক্ষকের নাম প্রদত্ত হয়েছে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়। এখানে মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (জন্ম ১৮৭৬-

মৃত্যু ১৯৪২) সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডে *ন্যায়দর্শন* গ্রন্থ সম্বন্ধে তর্কাচার্য মহাশয়ের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এই নিবন্ধ থেকে জানা যায় গ্রন্থটি সর্বপ্রথম কলকাতার প্রসিদ্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ন্যায়দর্শনের এক অসামান্য গ্রন্থ এটি। এখানে মূল *ন্যায়সূত্র, বাৎস্যায়নভাষ্য,* অনুবাদ, টিপ্পণী ও আনুষঙ্গিক বিস্তৃত আলোচনা প্রতিপাদিত হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয় আরও বলেছেন-

মান্যা বাচকমহাভাগাঃ! ন খল্ববিদিতমিদং ভবতাং যত্ সুবিশ্রুতনামভিঃ পণ্ডিতকুলকেশরিভিঃ প্রাচীন-নবীনোভয়-তন্ত্র-স্বতন্ত্র-মতিভির্মহামহোপাধ্যায়-শ্রীযুক্তফণিভূষণ-তর্কবাগীশমহাভাগৈঃ স্বকৃত সমুপাদেয়ভূমিকা সুবিস্তৃতবিচারবহুলভাষ্যবিবরণ-ভাষ্যানুবাদ-টিপ্পন্যাদি-বহুপকরণৈরুপস্কৃতং সুসম্পাদিতং কলিকাতাস্থ-বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষত্প্রযত্নেন বাত্সায়নভাষ্যোপবৃহিতং গৌতমীয়ন্যায়দর্শনং নাম’।

মূলত এই গ্রন্থ প্রকাশের সাথে সাথে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য গ্রন্থ আলোচনা করেছেন তর্কাচার্য মহাশয়। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

‘যদা পূর্ব বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদঃ প্রযত্নেন প্রথমতঃ প্রাকাশ্যমিদমলভত, তদাপি সংস্কৃতসাহিত্যপরিষত্পত্রিকায়াঃ সম্পাদকভূমিকাপ্রধিতিষ্ঠতো মমৈবাভূদে-তদীয়-সংখ্যাতীত-গুণবিচারসৌভাগ্যম্। অদ্য পুনঃ কালান্তরেঽপি সংস্কৃতবিদ্যায়া নিরবদ্য-ভাগধেয়-সপ্রস্তুততদগ্রন্থসংস্করণ প্রকর্ষাতিশয়েনৈব তদীয় প্রথমখণ্ডে নিঃশেষতামাপ্তে পুনর্নবীনোদ্যমেন ভূয়াংস প্রয়াসমঙ্গীকৃত্য মহামহোপাধ্যায়তর্কবাগীশমহাশয়ৈস্তত্তখণ্ডস্য দ্বিতীয়ং সংস্করণং প্রাকাশ্যং নীতমাসাদিতমালোচিত-মালোচিতশ্চাস্মাভিঃ’।

এইভাবে সমস্ত প্রবন্ধে তথ্যনির্ভর ও যথাযথ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

***সত্যানুভাবম্* মহাকাব্য:-** এটি তর্কাচার্য মহাশয় রচিত একটি মৌলিক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যটি প্রথমে পত্রিকাতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়, পরবর্তিকালে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ থেকে এই মহাকাব্যটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। মহাকাব্যটিতে মোট ২৪ টি সর্গ আছে। এর মধ্যে এই সংখ্যায় ৫-১২ সর্গ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সত্যনারায়ণের বৃত্তান্ত এই মহাকাব্যের মূল আলোচ্য বিষয়।

চ. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯৫০, খণ্ড-৩৩, সম্পা.মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য, সহ সম্পা. শ্রীরামধনশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ

যত্-কিঞ্চিদাবেদনম্:- পত্রিকার আরম্ভেই সম্পাদক তর্কাচার্য মহাশয়কৃত একটি সবিনয় অনুরোধ করা হয়েছে সাহিত্য পরিষদের ভবন নির্মাণের জন্য। যেখানে পরিষদের এই মহত্ কার্যে তীব্র অর্থসংকট বাধার কারণ বলা হয়েছে। এই বিষয়ে কলকাতার বিদ্যোৎসাহী সহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে যথাসম্ভব অর্থ সাহায্যের একটি আবেদন জানানো হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রতি আবেগময়ী এক দরদীমনোভাব তর্কাচার্য মহাশয়ের লেখনীতে স্পষ্ট। তর্কাচার্য মহাশয় উক্ত বিষয়ে বলেছেন-

‘প্রিয়পাঠকমহাভাগাঃ প্রাপ্তকালং কিঞ্চিদ্ বিজ্ঞাপ্যতে যুষ্মাসু, যদি সাদরমিদমাকর্ণ্যত, তদৈবাস্য সাফল্যং মংস্যামহে। অপি নাম পরিষদং প্রতি প্রেমবন্তো ভবন্তো ননু ? যদ্যেবং, তদা কথং সমুপহন্যমানাপ্য-কাণ্ডে দুরবস্থারাক্ষস্যা পরিষদমিমাং প্রেয়সী নোত্সহধ্বে জীবয়িতুম্?.......... পরিষদো বাসগৃহং রচয়িতুমারভ্যাপি কিঞ্চিন্মাত্রং নির্মায়ৈব মহাসমরসম্ভূতদৌমূল্যাদিভিঃ কারণৈরর্থাভাবেন চ মহতা নারব্ধং সমাপয়িতুং সমর্থেতি’।

এছাড়াও উক্ত আবেদনের পরেই একটি মঙ্গলশ্লোক দেখা যায় এই নামে *শ্রীভগবন্মঙ্গনম্*, মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি হল-

রাধামাধায় বামে ব্রজপুরদয়িতং দিব্যরূপং ত্রিভঙ্গং
বংশীসঙ্গীতলীলাকলিতসুললিতং মঞ্জুমালং দধানঃ।
আনন্দোন্মত্তগোপীবলয়পরিবৃতো রাসলীলাবিলোলঃ
শ্রীকৃষ্ণো ভাতু নিত্যং মনসি সুমনসাং সচ্চিদানন্দরূপঃ।।
লোকানাং চিত্তমাস্তাং মলপরিরহিতং ভক্তিসঞ্চারপূতং
দুঃখস্পর্শেন শূন্যং ভগবদনুভবে শক্তমারামযুক্তম্।
বিশ্বং পাপেন মুক্তং ভবতু সুচরিতং সত্পথে নিত্যরক্তং
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপূজাপরিচরণগুণোত্কীর্ত্তনাদৌ নিষক্তম্।।

মতিমঞ্জরী:- পত্রিকার নিয়মানুসারে এখানে সম্পাদকের বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে নবীন গবেষণালব্ধ রচনা দেওয়ায় অনুরোধ করা হয়েছে, বলা হয়েছে যা স্বরচিত হওয়া একান্ত কাম্য। সম্পাদক তর্কাচার্য মহাশয়ের এই বিবরণী ১৫, ২৬, ৩৮, ৫০, ৬৩, ৭৫, ৮৯, ৯৯, ১১১, ১২২, ১৩৬ নং পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে।

ছ. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯৩৪, খণ্ড-১৭, সম্পা. ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহ সম্পা. শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সমালোচনম্:- এখানে *সংস্কৃতপদ্যবাণী* (তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদিত সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা) নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতার শ্যামবাজার থেকে তর্কাচার্য মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীকার্ত্তিক চক্রবর্তী এটি প্রকাশ করেন। এই সমালোচনা রচনা থেকে জানা যায় যে এই পত্রিকাতে শুধুমাত্র পদ্যরচনা নয়, গদ্যরচনাও স্থান পেত। তবে পদ্যবাণীর আধিক্যবশত এমন নামকরণ তা বলা হয়েছে-

‘যদ্যপি পত্রিকেয়ং পদ্যকাব্যবহুলা তথাপি ন খলু সর্বথা পরিহীনা গদ্যপ্রবন্ধেন সংস্কৃতপদ্যবাণীতি সংজ্ঞা ‘প্রাধান্যেন ব্যপদেশো ভবন্তি’ ইতি ন্যায়েনেত্যববোদ্ধব্যম্’।

তর্কাচার্য মহাশয়কে এখানে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পণ্ডিত বলে অভিহিত করা হয়েছে-

> ‘কস্য বা ন বিদিতঃ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রধিপণঃ শ্রীমান্ কালীপদ-তর্কাচার্যমহোদয়ঃ পরিষত্পত্রিকাপ্রণয়িনম্’।

তবে তর্কাচার্য মহাশয়ের এই পত্রিকা বেশিদিন প্রকাশ হয়নি, কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশনাকার্য বন্ধ হয়ে যায়।

জ. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯৪৪, খণ্ড-২০, সম্পা. মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী, সহ সম্পা. শ্রীউপেন্দ্রমোহন-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

মহাবারিধি[১৯]:- কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় পুরীতীর্থের সমুদ্র দর্শন করার পর হৃদয়ের আপ্লুত মনোভাব প্রকাশ করতে এই *মহাবারিধি* রচনা করেন। অনবদ্য ছন্দ ও পুরীতীর্থের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এই রচনাটিতে পরিস্ফূট হয়েছে। রচনাপাদটীকায় লেখা ‘শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র-সন্নিহিতসমুদ্রদর্শনানন্তরং। রচনাটি এই পত্রিকার দৃষ্ট হয়। রচনাটি এরূপ-

অসীমরসসম্ভৃতং বিবিধভূতিবিভ্রাজিতং
তরঙ্গশতমণ্ডিতং সততশব্দসম্ভাবিতম্।
সদা পবনবীজিতং শুভপুরীপদান্তং গতং
নমামি জলধীশ্বরং জগতি তীর্থরাজং পরম্।।১।।

নিরন্তরবিচঞ্চলং ধবলফেনমালাকুলং
সুনীলরুচিসঞ্চয়ং কিমপি নীরমায়াময়ম্।
বিকীর্ণশতশুক্তিকং শুভপুরীপদান্তংস্পৃশং

নমামি জলধীশ্বরং জগতি তীর্থরাজং পরম্।।২।।

এইভাবে শ্রুতিমধুর ১১টি শ্লোকে এই *মহাবারিধি* কবিতাটি তর্কাচার্য মহাশয় প্রতিপাদন করেছেন।

প্রাচীনসাহিত্যে বিজ্ঞানপরিচয়[৮০]**:-** এই শোধনিবন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডের উত্তরার্ধে ৮৬ তম অধ্যায়ে বিশ্বকর্মা ও শ্বরলিঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখান থেকে আমরা বিশ্বকর্মার অপূর্ব বিদ্যা জানতে পারি। অট্টালিকা নির্মাণে তার দক্ষতা সর্বদা দেবতাদের প্রশংসা পেয়েছে।

ঝ. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯৩৮, খণ্ড-২১, সম্পা. মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী, সহ সম্পা. শ্রীউপেন্দ্রমোহন-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কাত্যায়নীবৈভবম:- এখানে মূলত দেবী কাত্যায়নীর স্তুতি করা হয়েছে। প্রায় ২৪ টি সুললিত সমধুর শ্লোকে কাত্যায়নী দেবীর বন্দনা করা হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয়ের হৃদয়ের আকুতি ও পরম শ্রদ্ধা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তর্কাচার্যকৃত বন্দনাটি হল-

দুর্গাং সগবিধৌ রজোগুণময়ীং শক্তিং পরাং ব্রহ্মণঃ
সত্যাং সত্ত্বময়ীং স্থিতৌ স্থিতিমতী লোকোত্তরাং বৈষ্ণবীম্।
রৌদ্রী ধ্বংসবিধৌ তমোগুণময়ী রূপত্রয়ং বিভ্রতী
চিদ্রূপাং সুরসেবিতাং ভগবতী কাত্যায়নীমাশ্রয়ে।।১।।

ঞ.*সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,*প্রকাশকাল-১৯৩৯-৪০, খণ্ড-২২, সম্পা. মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী, সহ সম্পা. শ্রীউপেন্দ্রমোহন-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

অনুবন্ধিকা:- উক্ত নিবন্ধে *প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটকের মুখবন্ধ আলোচিত হয়েছে। এই নাটকের মূল বিষয় এই অংশে বর্ণিত হয়েছে।

ট.*সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-১৯৩৯-৪০, খণ্ড-১১, সম্পা. মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য, সহ সম্পা. শ্রী দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

ভাষারত্নম্:- কণাদতর্কবাগীশ রচিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ এটি। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধাকারে প্রথম পঠিত হয়। পরবর্তিকালে এটি গ্রন্থকারে প্রকাশ পায়। এটি বৈশেষিক দর্শনের পদার্থতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। তর্কবাগীশ মহাশয় নবদ্বীপ নিবাসী নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর সময়কাল ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ।

ঠ. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* প্রকাশকাল-অক্টোবর ২০০৯-মার্চ ২০১০(১-২), খণ্ড-৯২, অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস, সহ সম্পা. পার্বতী চক্রবর্তী

২০০৯ সালের এই ৯২তম সংখ্যায় সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য কাব্যের আলোচনা থেকে এবার দর্শনের আলোচনা প্রতিপাদিত হয়েছে। এই সংখ্যায় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ (প্রায় ৬৬ সংখ্যক পৃষ্ঠা) পাওয়া যায় যথা-

i. *তর্কপরিভাষা*
ii. *ন্যায়বৈশেষিকদর্শনবিমর্শ*

আসলে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার এই ৯২তম সংখ্যাটি তর্কাচার্য মহাশয়কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায় আরও বেশ কিছু সংখ্যায় পণ্ডিত তর্কাচার্য মহাশয়ের রচনাকৃতি প্রকাশিত হয়। যেমন খণ্ড ৪৪, ৮, ৪৬-৪৮ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থটি *গীতাঞ্জলিপ্রতিচ্ছায়া* নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ৪৪তম খণ্ডে *গান্ধারীর আবেদন গান্ধার্যাবেদনম্,* ৪৩ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পরিশোধ* কবিতা,

৩৯তম খণ্ডে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের ইতিবৃত্ত, ৫ম খণ্ডে *জাতিবাধকবিচার* প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায় উপরিউক্ত রচনাগুলি থেকে তাঁর উৎকৃষ্ট কাব্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে কাব্য প্রতিভার সাথে সাথে ভাষার গাম্ভীর্য ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয়। স্বকীয় মৌলিক কাব্যগ্রন্থ, অনুবাদরচনাকৃতি ও দর্শনবিষয়ক টীকাসহিত রচনা এই পত্রিকাতে দেখা যায়। তর্কাচার্য মহাশয়ের আলোচনার গভীরতায় নিপুণ পাণ্ডিত্যবোধ সুস্পষ্ট। বিষয়ের বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত আচার্য মহাশয়ের লেখনী তা এই পরিষদ্ পত্রিকার রচনাকৃতিগুলি অবলোকন করলে বোধগম্য হয়। সুতরাং দীর্ঘদিন পরিষদের নানান পদে নিযুক্ত (সময়কাল- ১৯১৮-১৯৭২)পরিষদের সুধাভাণ্ড আরও সমৃদ্ধ ও কালোত্তীর্ণ হয়েছে তর্কাচার্য মহাশয়ের সৃষ্টিধারায় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২. *মঞ্জূষা* পত্রিকা

বিশিষ্ট অধ্যাপক বৈদিক সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ও বৈয়াকরণ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৬১) সম্পাদিত পত্রিকা হল *মঞ্জূষা*। যে সংস্কৃত ভাষা আমাদের দেশের সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারের জন্য যারা নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এটি একটি মাসিক পত্রিকা। তবে এই পত্রিকার প্রকাশবর্ষ হল ১৯৩৫-১৯৩৭, ১৯৪৯-১৯৬২। এ ছাড়া তিনি *সুরভারতী* নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। যাইহোক বয়সে কনিষ্ঠ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কালীপদ তর্কাচার্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে পঞ্চদশ বর্ষের পঞ্চমী সংখ্যায় যে *মঞ্জূষা* পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাতে তর্কাচার্য

মহাশয় একটি মর্মস্পর্শী *শোকাশ্রুপ্রস্রবণম্* নামে সংস্কৃত কবিতা রচনা করে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন-

যদীয়-বৈদুষ্যযশঃকরোতকরৈ-
র্বসুন্ধরাসীমসিতপ্রভাং দধৌ।
স কোবিদানন্দকরো গুণাকরঃ
ক্ষিতীশচন্দ্রো বত হা গতো দিবম্।।১।।
মঞ্জূষয়া মংজুলবাগ্-বিভূষয়া
যস্তর্পয়ামাস সদা বিদাং গণম্।
গীর্বাণবাণীবিদুষাং মহত্তমঃ
ক্ষিতীশচন্দ্রঃ স গতোঽদ্য হা দিবম্।।২।।
যদীয়বিশ্বোত্তরবুদ্ধিচাতুরী
ভাষারহস্যং তরণিস্তিতীর্ষতাম্।
স দেববাণীবরপুত্র উজ্জলঃ
ক্ষিতীশচন্দ্রোঽস্তগিরিং সমাশ্রিতঃ।।৩।।

৩. *সংস্কৃত প্রতিভা*

এটি সাহিত্য একাডেমী নতুন দিল্লী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। এখানে খণ্ডকাব্য, গদ্যবন্ধ, রূপক, অনুবাদগ্রন্থ, রবীন্দ্রসাহিত্য এবং অন্তিমে পুস্তকবিমর্শ এই ক্রমে আলোচিত।

১৯৫৯-৬০ সালের অক্টোবর ও এপ্রিল মাসে তর্কাচার্য মহাশয়ের কারয়িত্রী প্রতিভার ফসল হল *আলোকতিমিরবৈরম্*। এটি একটি খণ্ডকাব্য। এই কাব্যে আলোক ও তিমিরের বৈরতা কাব্যোচিত ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে।

৪. *ভারতবর্ষ* পত্রিকা[৮১]

বিখ্যাত নাট্যকার ও গীতিকার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা হল *ভারতবর্ষ* পত্রিকা। তবে এই পত্রিকার সম্পাদক পদে পরবর্তিকালে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই পত্রিকায় তাদের প্রবন্ধ রচনা করেন।

কাশ্যপ মহাকবি কালীপদ তর্কাচার্য এই পত্রিকার ২৬তম বর্ষে প্রথম ষষ্ঠ সংখ্যায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে একটি শোধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন *নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা* এই শীর্ষক নামকরণ করে। এই সময় তর্কাচার্য মহাশয় সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ন্যায়সম্প্রদায়ের মতে ইষ্টদেবতার কথা বলতে গিয়ে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের রচনাকারগণের মতামতের পর্যালোচনা করে তর্কাচার্য মহাশয় নিজ সিদ্ধান্ত প্রবন্ধের পরিশেষে ব্যক্ত করেছেন। তিনি প্রথমেই বৌদ্ধমত, সাংখ্যমত, জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, *ন্যায়সূত্র, ভাষ্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ভাষাপরিচ্ছেদ, তত্ত্বচিন্তামণি, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা* প্রভৃতি মতের উল্লেখ করেছেন।

৫. *সনাতনশাস্ত্র*

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ (১৮৯২-১৯৮২) প্রবর্তিত *সনাতনশাস্ত্র* হল শাস্ত্রগ্রন্থসম্বন্ধীয় সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা। এটি মূলত সনাতনশাস্ত্রগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশের একটি পত্রিকা। যার উদ্দেশ্য ছিল সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসার। এই পত্রিকাতে *রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা* প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ হত। সনাতনশাস্ত্রস্য নিয়মাবলী অংশে বলা হয়েছে- *অস্মিন্ সনাতনশাস্ত্রে বিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমদ্-বাল্মীকিয়রামায়ণ-মহাভারতাদি সকল-শাস্ত্রগ্রন্থাঃ ক্রমশঃ প্রকাশিতা ভবন্তি।*

পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই উভয় পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এই সনাতন শাস্ত্রে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের (১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রথমবর্ষে বৈশাখমাসে রামনবমী সংখ্যায় *বিষ্ণুপুরাণ* গ্রন্থটি টীকাসমেত প্রকাশ করা হয়। শ্রীধরস্বামী টীকার সহিত তর্কাচার্য মহাশয়ের *বিষ্ণুপ্রভা* নামে পাদটীকা সংযুক্ত করা হয়। এই মুখপত্রে সনাতনশাস্ত্রপ্রশস্তি, গৌরীনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা, শ্রীবিষ্ণুবন্দনা, সূচীপত্র, মূল অংশ এই ক্রমে আলোচিত হয়েছে।

৬. *প্রণবপারিজাত*

এই পত্রিকাটিও সীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত একটি পত্রিকা। এই পত্রিকায় ১ম-২য় সংখ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য রচিত *স্যমন্তকোদ্ধারব্যায়োগ* পাঁচটি দৃশ্যসমন্বিত ব্যায়োগশ্রেণীর নাটকটি প্রকাশিত হয়।

৭. *দেবযান* পত্রিকা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত এই *দেবযান* পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে নবম বর্ষে তর্কাচার্য মহাশয় ওঙ্কারনাথ পঞ্চদশী ও শ্রীওঙ্কারনাথ প্রণতি ষোড়শী নামক দুটি সংস্কৃত পদ্য রচনা করে ঠাকুর সীতারামদাসের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এখানে তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পদ্য রচনা করেছেন। ওঙ্কারনাথ পঞ্চদশী পদ্যাংশের প্রথমে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

প্রঃ- শ্রৌতে স্মার্ত্তে ধর্মকৃত্যে বিপন্নে
পাপাচারে প্রাপ্তভূরি প্রচারে।
ধর্মং পাতং কোঽদ্য লোকে সযত্নঃ?
উঃ- সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।

৮. *সুদর্শন* পত্রিকা

তর্কাচার্য মহাশয় সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নেবার পর *শ্রীশ্রীচণ্ডীর* বাংলা পদ্যানুবাদ আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থটি সাতশো শ্লোকের অমৃতাক্ষর ছন্দে নিবন্ধ। রচনাকর্মটি উক্ত পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হলেও পরবর্তিতে আদ্যাপীঠের মুদ্রণালয় থেকে *শ্রীশ্রীচণ্ডী* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বর্তমানে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে উপলব্ধ।

৯. *সংস্কৃত পদ্যবাণী*

কলকাতা সংস্কৃত কলেজে *সংস্কৃত পদ্যবাণী* নামে পত্রিকা তর্কাচার্য মহাশয়ের ভাবনায় প্রকাশিত হয়। নানা মৌলিক রচনা এই পত্রিকাতে প্রকাশ করা হত সংস্কৃত প্রচার ও প্রসারের জন্য। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

> প্রদিষ্টচিত্রাদিবিশিষ্টপুষ্টিঃ প্রতীষ্টলোকেষ্টরসাভিবৃষ্টিঃ।
> প্রমোদয়ন্তি কবিমানসানি প্রবর্ধতাং সংস্কৃতপদ্যবাণী।।[৮২]

১০. *সারস্বতী সুষমা*[৮৩]

কাশীর সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের এটি একটি ত্রৈমাসিক সংস্কৃত পত্রিকা। এই পত্রিকাটি সম্পাদক ছিলেন শ্রীসুরতিনারায়ণমণিত্রিপাঠী। এক বছরে এই পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ সালে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যক্ষীয় তিনটি প্রবচন বা বক্তৃতার সমাহার।

এইভাবে পণ্ডিত তর্কাচার্য মহাশয়ের নানান পত্র পত্রিকায় প্রাপ্ত রচনাকৃতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। তবে এই আলোচনা বিশাল সমুদ্ররাশির এক বিন্দু বারিমাত্র।

তর্কাচার্য মহাশয়ের পত্রিকাকৃত রচনাসমূহ এখানের শেষ নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের ভাষায় এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে -

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।

এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।।[৮৪]

কিংবা *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের ভাষায়-

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।[৮৫]

আচার্য মহাশয়ের বিশাল রচনাভাণ্ডারে এই পত্র-পত্রিকায় প্রাপ্ত রচনার সাহিত্যমূল্য বহুমূল্য রত্নরাজী সদৃশ।

উল্লেখপঞ্জি

১. *সাহিত্যদর্পণ* ১.৬

২. *সত্যানুভাবম্,* গ্রন্থভূমিকা, পৃ. ৩

৩. *তদেব,* প্রথম সর্গ, শ্লোক নং ১

৪. *তদেব,* শ্লোক নং ৩-৪

৫. *তদেব,* শ্লোক নং ১১

৬. *তদেব,* শ্লোক নং ১,৬

৭. *তদেব,* তৃতীয়সর্গ, শ্লোক নং ১-২

৮. *তদেব,* ষষ্ঠসর্গ, শ্লোক নং ৫

৯. *তদেব,* দ্বাবিংশতিসর্গ, শ্লোক নং ৭৪

১০. *তদেব,* পৃ. ২২

১১. *তদেব,* সপ্তমসর্গ, শ্লোক নং ২০

১২. *সাহিত্যদর্পণ,* ষষ্ঠপরিচ্ছেদ, পৃ. ১৬৮

১৩. তত্রৈব

১৪. *সত্যানুভাবম্, ১.৩*

১৫. *তদেব,* প্রথমসর্গ, শ্লোক নং ৭৩

১৬. *যোগিভক্তচরিতম্,* প্রথমসর্গ, শ্লোক নং ১-৩

১৭. *তদেব,* শ্লোক নং ১০-১২

১৮. *তদেব,* শ্লোক নং ২১-২২

১৯. *তদেব,* ১.১

২০. *তদেব,* ১.৫০

২১. *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্,* পৃ. ১

২২. *তদেব,* কবিনিবেদন অংশ

২৩. *তদেব,* ১.১

২৪. *তদেব,* ২.১

২৫. *তদেব,* ৪.৩৩

২৬. *তদেব,* ৪.৮৬

২৭. *সাহিত্যদর্পণম্,* পংক্তি ৩০৭

২৮. *তদেব, কুসুমপ্রতিমা* টীকা, খণ্ডকাব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে

২৯. *তদেব,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, মহাকাব্যের লক্ষণ

৩০. *আলোকতিমিরবৈরম্,* পূর্ববৈরম্, শ্লোক নং ১-২

৩১. *ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* কারিকা ৩ প্রসঙ্গে

৩২. *আলোকতিমিরবৈরম্,* দ্বিতীয়পর্ব-মধ্যমবৈরম্, শ্লোক নং ১

৩৩. *প্রশান্তরত্নাকরম্,* উৎসর্গপত্রম্ অংশ

৩৪. *তদেব,* অনুবন্ধিকা অংশ, পৃ. খ

৩৫. *তদেব,* পৃ. ঝ

৩৬. *কৃত্তিবাসী রামায়ণ,* রামায়ণোত্পত্তিপ্রকরণ, আদিকাণ্ড

৩৭. *প্রশান্তরত্নাকরম্,* নান্দী শ্লোক

৩৮. *তদেব,* প্রথমাঙ্ক, পৃ. ৪

৩৯. *তদেব,* ভরতবাক্য, পৃ. ১৬২

৪০. *তদেব,* অনুবন্ধিকা অংশ, পৃ. গ

৪১. *সাহিত্যদর্পণম্,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, নাটকলক্ষণ

৪২. *নলদময়ন্তীয়ম্,* পৃ. ১৪৬

৪৩. *তদেব,* গ্রন্থনিবেদন অংশে

৪৪. *তদেব,* প্রথম নান্দী শ্লোক

৪৫. *তদেব,* পৃ. ২

৪৬. *তদেব,* ভরতবাক্য

৪৭. *মাণবকগৌরবম্*-ভূমিকাংশ, পৃ. ১

৪৮. *তদেব,* নান্দীশ্লোক

৪৯. *তদেব,* ভরতবাক্য

৫০. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খণ্ড-৪৯, পৃ. ৫১

৫১. তত্রৈব

৫২. *গীতাঞ্জলিঃ,* অনুবাদক কালীপদ তর্কাচার্য, ভূমিকাংশ

৫৩. *তদেব,* মঙ্গলাচরণ, শ্লোক নং ১

৫৪. *তদেব,* প্রথম কবিতা

৫৫. *তদেব,* প্রথম কবিতার সংস্কৃত অনুবাদ

৫৬. *তদেব,* সম্পা. অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, প্রথম কবিতা

৫৭. *শ্রীশ্রীচণ্ডী,* গ্রন্থভূমিকা,

৫৮. *তদেব,* গ্রন্থভূমিকা, ধ্যানমন্ত্র ১-২

৫৯. *তদেব,* ১১.২৯

৬০. *তদেব,* প্রথমচরিত, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১

৬১. *তদেব,* প্রথম অধ্যায়, শ্লোক নং ১-২

৬২. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খণ্ড-৪৮, পৃ. ৩৪

৬৩. *তদেব,* খণ্ড ১১, পৃ. ১৭৭, ৩২৬, ২৭০

৬৪. *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* মঙ্গলাচরণ শ্লোক নং ১০-১১

৬৫. *তদেব,* কবিবৃত্তম্, পৃ. ১

৬৬. *তদেব,* মঙ্গলাচরণ, শ্লোক নং ৫-৮

৬৭. *মহানাটকম্,* প্রারম্ভিক শ্লোক

৬৮. *তদেব,* প্রথম অঙ্ক, অন্তিমশ্লোকের অনুবাদ

৬৯. *বিষ্ণুপুরাণম্, বিষ্ণুপ্রভা* টীকা, প্রারম্ভিক শ্লোক

৭০. *বেণীসংহারম্,* পৃ. ২

৭১. তর্কাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মরণে রচিত পুস্তিকা, *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য* প্রবন্ধ, পৃ. ৮৫

৭২. সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্, ওয়েবসাইট

৭৩. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খণ্ড. ১০, পৃ. ২৩৭

৭৪. *তদেব,* খণ্ড ১১, পৃ. ২৪১

৭৫. তত্রৈব

৭৬. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খণ্ড. ১৮, পৃ. ১০৪

৭৭. *তদেব,* খণ্ড ১৮, পৃ. ১০৫

৭৮. *তদেব,* খণ্ড ২৩, পৃ. ১৩২

৭৯. *তদেব,* খণ্ড ২০, পৃ. ১০৪

৮০. *তদেব,* খণ্ড ২০, পৃ. ৩৩৫

৮১. *ভারতবর্ষ* পত্রিকা, ১৯৩৮, ২৬তম সংখ্যা, পৃ. ৮১৭

৮২. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খণ্ড ৯২, পৃ. ১০৫

৮৩. *সারস্বতী সুষমা,* ১৯তম বর্ষ, চতুর্থ অঙ্ক, সংবত ২০২১, পৃ. ২৬৩-৩৩৪

৮৪. *গীতবিতান,* পূজাপর্যায়, ৭৫ সংখ্যক গান

৮৫. *গীতাঞ্জলি,* ১৩৩ নং কবিতা

চতুর্থ অধ্যায়

সাহিত্য ও দর্শন: একে অন্যের পরিপূরক

সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি :- 'সহিত' এর সাথে 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় করে 'সাহিত্য' শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। 'সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্'[১] দুটি বস্তুর পরস্পর সংযোগের ভাব হল 'সাহিত্য'। আবার 'সহিতস্য ভাবঃ এরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় করে 'সাহিত্য' হতে পারে। 'সাহিত্য' শব্দটি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। এই ক্লীবলিঙ্গান্ত সাহিত্য শব্দের অর্থগুলি হল- ১. সহিতভাব, মেলন ২.পরস্পরসাপেক্ষ তুল্যরূপ পদসমূহের একক্রিয়ান্বয়িত্ব, ৩.সহভাববিশিষ্ট ইত্যাদি।[২] এর মূল অর্থ করলে হয় একসাথে বা একত্র থাকা। অতি প্রাচীনকালে 'সাহিত্য' বলতে সহ, মেলনভাব বা কাব্য অর্থে প্রযুক্ত হলেও পরবর্তিকালে সাহিত্য শব্দটি কেবলমাত্র কাব্য অর্থেই প্রয়োগ হয়, সেইজন্য সাহিত্য শব্দের অর্থ করা হয়েছে- Combination, poetical Composition[৩]। প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর *সাহিত্য পরিচয়* গ্রন্থে বলেছেন-

'সাহিত্য শব্দটি সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিয়াছে। সহ বা সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার মূল অর্থ হল- 'একসাথে বা একত্র থাকা'। দুটি জিনিস একত্র আছে এই ভাবনা বোঝাতে এ কথা বলা চলে যে তাদের মধ্যে সাহিত্য আছে'।[৪]

সহিত থেকে সাহিত্য হয়েছে এ বিষয়ে কোন মতভেদ দেখা যায় না, কিন্তু তর্ক হল কেউ বলেছেন শব্দের সাথে অর্থ মিলেছে, কেউ বললেন কবির হৃদয়ের সাথে রসিক

পাঠকের হৃদয় মিলেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *সাহিত্য* গ্রন্থের *বাংলা জাতীয় সাহিত্য* প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

'সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে, ভাষায়-ভাষায়, গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নয়, মানুষের সহিত মানুষ, অতীতের সহিত বর্তমান, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই দ্বারা সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন। পূর্বপুরুষদের সহিতও তাহাদের জীবন্ত যোগ নাই। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্বপুরুষদের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনও রক্ষিত হইতে পারে না'।[৫]

সাহিত্যের লক্ষণ:- সাহিত্যের লক্ষণ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে আচার্যদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়, কেউ বলেন শব্দই কি সাহিত্য আবার কেউ বলেন অর্থ, কিংবা শব্দ ও অর্থের সংহতি। জগতে কোন জ্ঞানই শব্দের সাথে অনুসৃত না হয়ে প্রকাশিত হতে পারে না, কারণ শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য তাঁর *সাহিত্য মীমাংসা* গ্রন্থে বলেছেন-

'এই মতবাদ কতদূর সত্য তা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। যখন আমরা কোন অর্থ চিন্তা করি, তখন আমাদের সেই অর্থের বাচক শব্দের জ্ঞানও হইয়া থাকে। ইহা অনুভবসিদ্ধ, সেইজন্য মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন-

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ'।।[৬]

'শব্দ জ্ঞানমাত্রের প্রকাশক। বাক্য ও অর্থের সম্বন্ধ যেমন নিত্য, তেমনি অর্দ্ধনারীশ্বর হরপার্বতীর সম্বন্ধ নিত্য'।[৭]

কালিদাসের সমকালীন বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরি তাঁর *বাক্যপদীয়* গ্রন্থে বলেছেন- ব্রহ্ম যেমন নিজে কূটস্থ থেকে, আপনাকে জগত্ রূপে প্রকাশ করেন, শব্দও সেরূপ ব্রহ্মের ন্যায় কূটস্থ থেকে নানান অর্থের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন-

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।[৮]

সাহিত্য বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- শব্দ ও অর্থের যে এক অপূর্ব অবস্থান, যেখানে মনোহারিত্বে কেউ কারও কম বা বেশি নয়, তা যখন (সহৃদয়াহ্লাদকারী) সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, তখন তাকে সাহিত্য বলে। বলা হয়েছে-

সাহিত্যমনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ।

অন্যূনানতিরিক্তত্ব-মনোহারিণ্যবস্থিতিঃ।।[৯]

এই কারিকার বৃত্তিতে বলা হয়েছে-

'সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্। অনয়ো শব্দার্থয়োর্যা কাপ্যলৌকিকী চেতনচমত্কারিতায়াঃ কারণম্ অবস্থিতির্বিচিত্রৈব বিন্যাসভঙ্গী। কীদৃশী-অন্যূনানতিরিক্তমনোহারিণী,পরস্পরস্পর্ধিত্ব-রমণীয়া'।[১০]

এখানে বৃত্তিতে বলা হল দুটি বস্তুর পরস্পর সহিতের ভাব হল সাহিত্য। এই শব্দ ও অর্থের যে এক অলৌকিক চিত্তচমৎকারজনকতার কারণরূপে অবস্থান, বচনবিন্যাসভঙ্গী। কীরূপ সেই ভঙ্গী? শব্দ ও অর্থ কেউ কারও অতিরিক্ত না হওয়ায় চিত্তাকর্ষক, পরস্পরের সমতুলত্বে রমণীয়।

তবে *বক্রোক্তিজীবিত*কার রাজানক কুন্তক সাহিত্যের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন-

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্র-কবি-ব্যাপারশালিনি।

বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্-বিদাহ্লাদকারিণি।।[১১]

অর্থাত্ কবিকৌশল কল্পিত রচনা বৈচিত্র্যে চমৎকারী শব্দ ও অর্থের সুমধুর বিন্যাসকে সাহিত্য বা কাব্য বলা হয়, কেবল শব্দকে কাব্য বলা যায় না, কিংবা কেবল অর্থকে কাব্য বলা যায় না।

সাহিত্যের সৃষ্টি ও শব্দ-অর্থের সম্মেলন প্রসঙ্গে দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন- 'কেবল রমণীয় শব্দপ্রয়োগে বা অর্থের গুরুত্বে কাব্য হয় না। কিন্তু শব্দার্থের একটি বিশেষ চারু সম্মেলনে বা সাহিত্যেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। শব্দার্থের দার্শনিক সম্বন্ধবিশেষের কথা উল্লেখ করিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সাহিত্য বা সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। সাহিত্য বলতে আমরা বিশেষ সম্মেলনকে বুঝি, যাহা হৃদয়কে আহ্লাদে ও চমৎকারিত্বে পূর্ণ করিয়া তোলে। এই চমৎকারিত্বের মূলে একদিকে যেমন অর্থের চারুতা অপরদিকে তেমনি বাক্যবিন্যাস ও ছন্দ প্রধান'।[১২]

কেবলমাত্র মধুর শব্দ পরপর সন্নিবেশ করলেই কাব্য হয় না। শব্দচয়নে জয়দেব *গীতগোবিন্দে* তার উৎকর্ষতার পরিচয় দিলেও কালিদাসের *মেঘদূত*, *রঘুবংশ* ও *কুমারসম্ভবের* সাথে তার তুলনা করা যায় না। কারণ কালিদাসের কাব্যে শব্দ ও অর্থ পরস্পর তুল্য। *সাহিত্য মীমাংসা* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

'রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়নের তুলনা হয় না কেন? ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে শব্দ ও অর্থের

চমৎকারিত্ব অন্যূনানতিরিক্ত। শব্দ এখানে অর্থের সহিত তুল্যস্কন্ধ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। একটি অপরকে ছাপাইয়া উঠে নাই’।[১৩]

সাহিত্যের কাল বা সময় :- নিখিল বাঙ্ময়ের দুটি ধারা একটি হল অপৌরুষেয় ও অপরটি পৌরুষেয়, প্রথমটি সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের দ্বারা স্বতঃ উদ্ভাসিত ও দ্বিতীয়টি শক্তি প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পুরুষকর্তৃক রচিত। বৈদিক বাঙ্ময় হল অপৌরুষেয়, একমাত্র রাজশেখরই বেদের ষড়ঙ্গের সাথে সাহিত্যবিদ্যাকে সপ্তম অঙ্গ বলেছেন। কারণ বেদাঙ্গের জ্ঞান ব্যতীত যেমন বেদজ্ঞান অসম্ভব, ঠিক তেমনি অলংকারশাস্ত্রের জ্ঞানও বেদজ্ঞানের জন্য আবশ্যক। রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে সাহিত্যবিদ্যা যে সপ্তম অঙ্গের অন্তর্গত সেই বিষয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন-

‘শিক্ষা, কল্পো, ব্যাকরণং নিরুক্তং, ছন্দোবিচিতিঃ, জ্যোতিষং চ ষড়ঙ্গানি ইত্যাচার্যাঃ। উপকারকত্বাত্ অলংকারঃ সপ্তমমঙ্গম্’।[১৪]

কাব্যক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের ব্যবহার রাজশেখরের পূর্ববর্তী নয়। রাজশেখরের পরেও সাহিত্য শব্দের সাথে ব্যাকরণের একটি সম্বন্ধ ছিল, আচার্য কুন্তক সাহিত্য শব্দকে ব্যাকরণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করেন, সহিত শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। সাহিত্যের অর্থ মিলন। শব্দ ও অর্থের মিলনরূপ সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা, তার নাম সাহিত্যবিদ্যা।

সাহিত্যের কাল বা সময় সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে। এই সাহিত্যালোকের আলোক যদি মানবহৃদয়কে উদ্ভাসিত না করত, তবে কে বলতে পারে মানবসভ্যতার বীজ উপ্ত হত না। ১৯১৩ সালে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় *সাহিত্য* প্রবন্ধে পণ্ডিত প্রমথনাথ-তর্কভূষণ মহাশয় বলেছেন-

'এ জগতে সাহিত্য বা কাব্য কতদিনের। মানুষ এখানে যতদিনের, মানুষের সাহিত্য এখানে ততদিনের। কবে এ পৃথিবীতে মানুষ প্রথম দেখা দিয়াছে, তাহা বুঝিবার যেমন কোন উপায় নাই, সেইরূপ মানুষের সাহিত্য মানুষের সমাজে কবে উদিত হইয়াছে তা জানিবার পথ নাই। সাহিত্য ও মানুষের জীবন যেন এক সুরে বাঁধা- সত্য বলিতে, যে হৃদয়ে সাহিত্যের কুসুম বিকশিত হয় না, সে হৃদয় মানুষের নহে। জ্যোতিষের যখন বাল্যাবস্থা, বিজ্ঞান যখন সদ্যপ্রসূত শিশু, চিকিৎসাশাস্ত্রের যখন অন্নপ্রাশনও হয় নাই, ভূগোল, ইতিহাস বা মনোবিজ্ঞান বা দর্শন যখন জন্মগ্রহণও করে নাই, সেই মানবীয় সভ্যতার অঙ্কুর বিকাশের সময়ে একমাত্র সাহিত্যের স্নিগ্ধ আলোকছটা মানুষের হৃদয়কন্দর আলোকিত করিয়া থাকে'।[১৫]

একাদশ শতাব্দীর আলংকারিক রাজানক কুন্তক তাঁর *বক্রোক্তিজীবিত* গ্রন্থে সাহিত্য শব্দটির বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে সাহিত্যের লক্ষণ প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বৃত্তিতে সাহিত্যের কাল বিষয়ে বলেছেন-

'অতএবৈতদুচ্যত-যদিদং সাহিত্যং নাম তদেতাবতি নিঃসীমনি সময়াধ্বনি সাহিত্যশব্দ-মাত্রেণৈব প্রসিদ্ধম্'।[১৬]

অর্থাত্ সাহিত্য সীমাহীন কাল ধরে চলে আসছে তা সাহিত্য এই শব্দটির দ্বারাই কেবল প্রসিদ্ধ। একথা সত্য যে মানুষ ও মানবসভ্যতার কল্যাণব্রতের দায়িত্ব চিরকাল সাহিত্যের স্কন্ধে অর্পিত। খণ্ডিত মানুষকে মিলিত করার দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যের, এ দৃষ্টি দর্শনেরও। সকল মহান সাহিত্যিক এই আবিষ্কারকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন মানুষের পরম কল্যাণের দিকে। তাই পৃথিবীর প্রথম সাহিত্য *ঋগ্বেদের* সর্বশেষ মন্ত্র সকল মানুষের মূলমন্ত্র।

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।[১৭]

অর্থাত্ তোমাদের অভিপ্রায় একপ্রকার হোক, তোমাদের অন্তঃকরণ এক হোক, তোমাদের মন এক হোক। যেন তোমাদের সৌহার্দ্য সুন্দর হয়।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য 'সুসহ' শব্দের অর্থ করলেন 'শোভন সাহিত্য'। বলা হয়েছে- '....যথা বঃ যুষ্মাকং সুসহ শোভনং সাহিত্যম্ অসতি ভবতি তথা সমানস্ত্বিত্যন্বয়ঃ'।[১৮]

অর্থাত্ সায়ণাচার্য্য ব্যাখ্যা করলেন- তোমাদের সাহিত্য যাতে শোভন হয় তাই তোমাদের সংকল্প সমান হ্োক, হৃদয় সমান হোক ও মন সমান হোক। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই প্রাচীন সাহিত্য বেদ ও তার সায়ণভাষ্যে সাহিত্য শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে সহ বা মিলন বা ঐক্যমত্য বা সহাবস্থান অর্থে। মূল আলোচনা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সাহিত্য শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে একই অর্থে। সুতরাং প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্য শব্দের প্রচলন ছিল একথা বলা যায়, তবে পরবর্তিকালে সাহিত্য শব্দটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কাব্য-সাহিত্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি:- ভারতীয় দর্শন প্রধানত বিচারপ্রধান শাস্ত্র। এই দর্শনের সাধারণ অর্থ হল দেখা বা প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু আবার দর্শন শব্দটির যদি বিশেষ অর্থ অন্বেষণ করা যায় তাহলে এর অর্থ হবে জীবন ও জগত্ সম্পর্কে 'তত্ত্বোপলব্ধি' অর্থাত্ গভীর মনন ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মায় তাই হল দর্শন, যে জ্ঞান অবশ্য মোক্ষের কারণ হয়। *ভারতীয় দর্শন কোষ* গ্রন্থে এই দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে তা হল –" দর্শন= দৃশ্ ধাতু +ভাবে ল্যুট্ = ১.চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, ২.মানস প্রত্যক্ষ আবার দৃশ্ ধাতু + করণে ল্যুট্ = তত্ত্বজ্ঞানসাধনশাস্ত্র"[১৯] (যেমন ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন) সুতরাং গভীর মনন ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের যে

বিশেষ বোধের উদয় হয় তাই হল দর্শন। তাহলে দেখা গেল দর্শন শব্দের সাধারণ অর্থ নয়, বিশেষ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের সূচনার আভাস বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়, বেদের মন্ত্র ও কবিতায় মানবমনের যে গভীর ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তা পরবর্তিকালে দর্শনের রূপান্তর নেয় একথা বলা যেতে পারে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* ঋষি বলেছেন –'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো.....'[২০] অর্থাত্‌ হে মৈত্রেয়ি আত্মদর্শন, আত্মশ্রবণ ও আত্মমনন করতে হবে। এই 'আত্মমনন' থেকেই আত্মানুসন্ধানের বিষয়টি এসেছে। অর্থাত্‌ নানান রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য এই দর্শনগুলির সূত্রপাত। প্রাচীন মুনি ঋষির তত্ত্বদর্শন ও সত্যের প্রতি ভালবাসা ও অদম্য জ্ঞানপিপাসা থেকেই দার্শনিক তত্ত্বের আবির্ভাব। বৈদিক কবি-মনীষীর অন্তর্দৃষ্টির আকুতি ও নানান কৌতুহলী প্রশ্ন ও সত্যের প্রতি অনুসন্ধানই দর্শনের প্রথম সোপান।

দার্শনিক ও সাহিত্যিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক :- সাহিত্যের মধ্যে দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বার্তা, বিশেষ ভাব ও আদর্শ সমাজে স্থান পায়, সাহিত্যে দর্শন না থাকলে তা অন্তঃসারহীন কথাবস্তুতে পরিণত হবে। স্বাধীন কবিপ্রতিভা যেমন যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল তেমনি যথার্থ সাহিত্য মীমাংসক যিনি, তার প্রতিভা অপেক্ষা বিচারবুদ্ধি, কল্পনা অপেক্ষা তত্ত্বদৃষ্টি অধিক পরিমাণে থাকবে।

যিনি প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচক তিনি কবির সাহিত্যসৃষ্টি ও সহৃদয়ের রসবোধ এই উভয়ের কার্য-কারণ তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা বিচার করার চেষ্টা করেছেন। এই বিচাররীতিকে দর্শন ছাড়া আর কি বা বলতে পারা যায়। *সাহিত্য মীমাংসা* গ্রন্থে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'আমরা অবাক হইয়া ভাবি, সাহিত্য-মীমাংসার গ্রন্থে এত অনুমান, এত সূক্ষ্ম তর্ক কিসের, এত চুলচেরা বিচারের কী প্রয়োজন? এত ঘটত্বাত্ পটত্বাত্ এর আবেশ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? কিন্তু এই বিস্ময়ের মূলে আছে সাহিত্য মীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। সাহিত্য মীমাংসা কেবল পাঠকের বা দর্শকের হৃদয়ের বস্তুশূন্য ভাবোচ্ছ্বাস নহে.... বস্তুত সাহিত্য মীমাংসা একটি দর্শন বিশেষ'।[২১]

দার্শনিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি স্থির বিচারবুদ্ধি, সুনিপুণ পদার্থ বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের যারা কাব্য ও অলংকারশাস্ত্রের পরমাচার্য ছিলেন তারা সকলেই পরম দার্শনিক ছিলেন, কাব্যশাস্ত্রের প্রতি বিচারে তাদের দার্শনিক বিচারশৈলী প্রতিপাদন করেছেন। তাই এই সম্প্রদায়ের মূল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দর্শনের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। এইভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যারা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মীমাংসক বা কাব্যশাস্ত্রবিশ্লেষক বলে পরিচিত, তারা শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও বটে, বিবিধ প্রকার দর্শনের জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞাত। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

'আমাদের প্রাচীন ভারতে যাঁহারা সাহিত্য মীমাংসার বিভিন্ন প্রস্থানের পরমাচার্য- তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে অধিগতবিদ্য ছিলেন। ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আচার্য আনন্দবর্ধন বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনে পারঙ্গম ছিলেন। এই উভয় দর্শনেই তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করে গিয়াছেন। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রের* টীকাকার ভট্টনায়ক একজন শ্রেষ্ঠ মীমাংসক ছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত *ধ্বন্যালোকলোচন* ও *অভিনবভারতী* সাহিত্য মীমাংসার রত্নভাণ্ডারবিশেষ। তিনিও একজন প্রধান দার্শনিক বলিয়া খ্যাত। কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের তিনি পরমাচার্য। সুতরাং এই সকল সাহিত্য মীমাংসকেরা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া সমধিক খ্যাত ছিলেন'।[২২]

ভারতীয় আলংকারিকগণের মত পাশ্চাত্ত্যেও দার্শনিকেরা তাঁদের দার্শনিক বিচারপদ্ধতির দ্বারা সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ বিচার বা ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন-

'আরিষ্টটল এর মত দার্শনিকের নাম কে না জানে? বর্তমান ইউরোপে যারা মূর্ধাভিষিক্ত সাহিত্য সমালোচক, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রখ্যাতনামা দার্শনিক। .... ইহারা প্রত্যেকেই দার্শনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া, বৃহত্তম মানবজীবন ও বিশ্বসৃষ্টির চরম ও পরম লক্ষ্য ও পরিণতির সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রযত্নবান হইয়াছেন'।[২৩]

সাহিত্যে দর্শন ও দর্শনে সাহিত্য :- আলংকারিকগণ কবিকে তাঁর কাব্যসংসারের প্রজাপতি বলেছেন। আচার্য আনন্দবর্ধন বলেছেন-

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে।।[২৪]

কবি আপন রুচি অনুসারে তার কাব্যজগত্ নির্মাণ করেন। তাই তো আলংকারিক মম্মট তার *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থে কবির সৃষ্ট জগত্ 'নিয়তিকৃতনিয়ম-রহিত', 'হ্লাদৈকময়', 'অনন্যপরতন্ত্র' অর্থাত্ বিধাতাকৃত নিয়ম যার উপর কার্যকরী নয়, কেবলমাত্র আনন্দদায়ক, যা অপরের অধীন নয় বলেছেন। কবির ইচ্ছায় কাব্যজগতের একমাত্র শক্তি। কিন্তু কেবল দর্শন থাকলেই তা যেমন উৎকৃষ্ট কাব্য হতে পারে না, দর্শন এবং বর্ণন একসাথে কাব্যসৃষ্টির উৎকৃষ্ট উপাদান হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ *রামায়ণে* আদিকবি বাল্মীকির শোক থেকে শ্লোকের যে আবির্ভাব হয়েছিল সেকথা বলা যেতে পারে। আদিকবি বাল্মীকির দর্শন যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্ণনের

মধ্য দিয়ে রূপ গ্রহণ করেছিল ততক্ষণ লৌকিক জগতে *রামায়ণ* কথা উদ্ভব হয় নি। সুতরাং কবি হৃদয়ের দর্শন ও বর্ণনাশক্তি পরবর্তিকালে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বা মহাকাব্যের জন্ম দিয়েছিল। ভারতীয় আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র বাল্মীকির প্রতিভায় কবিত্ব শক্তি দর্শনক্ষমতায় পরিপূর্ণ হয়ে প্রথম পরিস্ফূট হয়েছিল।

কাব্যের মধ্য দিয়ে কবির দার্শনিক ভাবনা রমণীয় কল্পনাকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করায় সুখোপভোগ্য হয়। কবিচিত্তের মর্মবেদনা ও বাস্তব জীবনযাপনের সামাজিক দর্শন সাহিত্যে প্রকাশিত হয় ছন্দমাধুর্যে।

মেঘদূত গ্রন্থের বিশেষ অভিভাষণে অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

‘*মেঘদূত*কাব্য কেবলমাত্র সাহিত্য নয়। আবার এরমধ্যে শুধু রসেরই উপস্থাপনা নেই, কেবলমাত্র ভাবাদির আলেখ্যমাত্রও নেই। উপরন্তু এই কাব্যের মধ্যে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্বসমূহও পরিবেশিত হয়েছে। উত্তম কাব্যের এরকমই পরিস্থিতি। এর প্রধান দৃষ্টান্ত হচ্ছে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* কেবলমাত্র দর্শনের গ্রন্থবিশেষ নয়। এ উচ্চাঙ্গের কাব্য’।[২৫]

কালিদাস মহাকবি বলে পণ্ডিতসমাজে সর্বজনবিদিত হলেও বা তাঁর কাব্য-নাটকাদি সম্বন্ধে সকলে জ্ঞাত হলেও ভারতীয় দর্শনের সাথে কালিদাসের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি ও সত্ত্বাদির কথা তিনি বহু ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। যোগদর্শনের কথা তার কাব্যে পাওয়া যায়। যেমন *কুমারসম্ভবের* পঞ্চম সর্গে তপস্যারতা পার্বতীর দেহে প্রথম বৃষ্টিপাতের অপূর্ব বর্ণনার মধ্যে পার্বতীর উপবেশনভঙ্গী যে যোগশাস্ত্রানুযায়ী ছিল তা অত্যন্ত নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দর্শনশাস্ত্র হল তর্কনির্ভর ও যুক্তিশাস্ত্র এখানে কঠোর প্রভুসম্মিত উপদেশে তার প্রকাশ ঘটে কিন্তু কাব্যে যে দর্শন প্রকাশিত হয় কান্তাসম্মিত ভাষায় তার সেই রমণীয় উপস্থাপনা আমাদের মুগ্ধ করে। কাব্যের পরিবেশন করা তত্ত্বের মাধ্যমে দর্শনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উদাহরণ হিসেবে একাধিক বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, যা বিশ্লেষণ করলে গভীর দার্শনিক বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। যেমন *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের নান্দী শ্লোক- 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী' ইত্যাদি শ্লোক। এখানে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশ আছে, যেমন সমগ্র জগৎসৃষ্টি একই পরমেশ্বরের প্রকাশ- কালিদাসের এই অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। যে মূর্ত্তি সকল বীজের আধার, (....তস্মৈ কৃষ্ণায় নমঃ সংসারমহীরূহস্য বীজায়[২৬])। যদিও এই শ্লোকে অষ্টমূর্ত্তিধর মহাদেবের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে।

আসলে অলংকারসাহিত্যের আচার্যগণ ভরত থেকে শুরু করে একাদশ শতকের মম্মট ও সাহিত্যদর্পণাকার বিশ্বনাথ পর্যন্ত কেবলমাত্র পুরাতনের চর্চা করে গেছেন একথা বললে তা ভুল হবে, তারা নতুন নতুন তথ্যের অনুসন্ধান করেছেন। ভরত যা আলোচনা করেননি দণ্ডী ও ভামহ তার সমাধান দিয়েছেন। আবার পরবর্তিকালের সাহিত্য মীমাংসকগণ পূর্ববর্তী আলংকারিকদের অনালোচিত বিষয়গুলিকে সবিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। *সাহিত্য-মীমাংসা* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

'নবীন সাহিত্য মীমাংসকগণ যখন সাহিত্যের আত্মার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের তত্ত্ব সাক্ষাত্ করিবার জন্য তারা ব্যাপৃত। প্রাচীনেরা যখন গুণ ও অলংকারের মধ্যে কোন ভেদ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, নবীন আলংকারিক সেখানে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।.... কেবলমাত্র আমাদের প্রাচীন

আলংকারিকেরা অল্প কথায় সাহিত্য বিষয়ক মীমাংসা করিয়াছেন, সেখানে আধুনিক সমালোচকগণ বিস্তৃত বিশ্লেষণের দ্বারা বিষয়গুলি সমাধান করিয়াছেন’।[২৭]

উপরিউক্ত আলোচনার অর্থাত্ আধুনিক সাহিত্য মীমাংসকগণের বাক্-চাতুর্য ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ কারণ আছে। আমাদের শাস্ত্রধারায় বিশেষ এই যে শাস্ত্রকারগণ তাঁদের প্রতিটি উক্তি উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা, হেতুর দ্বারা, দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এই বিষয় সম্বন্ধে অবগত ছিলেন যে অযৌক্তিক কোন সিদ্ধান্ত প্রতিবাদীগণ মেনে নেবেন না। কারণ বলা হয়েছে- ‘একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েত্’। তাই নবীন সাহিত্য মীমাংসকদের আলোচনায় অত্যধিক পরিমাণে দার্শনিক যুক্তি প্রবেশ করেছে। সুতরাং এইভাবে সাহিত্যে দর্শন ও দর্শনের তত্ত্ব সমধিক পাওয়া যায়। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন-

‘ন্যায়শাস্ত্র সকল শাস্ত্রচর্চার প্রদীপস্বরূপ-‘প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্ উপায়ঃ সর্বকর্মণাম্’। ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী চিন্তা করিবার রীতি, শাস্ত্রবিচার করিবার প্রণালী আমাদের পূর্বাচার্যগণের স্বভাবসিদ্ধ হয়ে গিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারে যেমন প্রয়োগ ছিল, উপযোগিতা ছিল, সাহিত্য মীমাংসা বিষয়ে তাহার প্রয়োগ ও উপযোগিতা কিছু কম নয়। তাঁহাদের চিন্তাধারার সহিত উহা অঙ্গাঙ্গিভাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ছিল’।[২৮]

প্রতিটি বাক্যেই সাহিত্য, দর্শন ও ব্যাকরণের সংযোগ আছে। উদাহরণ প্রদান করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ‘গৌঃ’ এই পদে গকার, ঔকার ও বিসর্গ এই বর্ণগুলির সন্নিবেশ আছে। এই শব্দগুলির দ্বারা পাঁচ প্রকার প্রাতিপদিকের অর্থ প্রকাশিত হয় (স্বার্থ, দ্রব্য, লিঙ্গ, পরিমাণ ও বচন) অথবা আখ্যাতপদার্থষটক (কর্তা, কর্ম, কাল, পুরুষ, বচন ও ভাব) বোঝায়। এসব হল ব্যাকরণের বিষয়। একটি বাক্যে বিভিন্ন পদের অন্বয়রূপ সম্বন্ধ

বিচারপূর্বক এই হল বাক্যার্থের তাৎপর্যার্থ’ এখানে মীমাংসাশাস্ত্রের উপযোগিতা বোঝা যায়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয়কে প্রমাণিত করার জন্য যুক্তি প্রদর্শনে তর্কশাস্ত্রের প্রয়োজন। এসকল (পদ, বাক্য ও অর্থ) নিজ স্বভাবমহিমায় সহৃদয়ের চিত্তাকর্ষক তা প্রতিপাদক করার জন্য সাহিত্যশাস্ত্রের আবশ্যকতা। এই সকল বিচার *বক্রোক্তিজীবিতের* বৃত্তিতে প্রতিপাদিত হয়েছে-

‘এতেষাং চ পদবাক্যপ্রমাণসাহিত্যানাং চতুর্ণামপি প্রতিবাক্যমুপযোগঃ। তথা চৈতত্ পদমেবং স্বরূপং গকারৌকারবিসর্জনীয়াত্মকমেতস্য চার্থস্য প্রাতিপদিকার্থ-পঞ্চক-লক্ষণস্যাখ্যাত-পদার্থষট্-লক্ষণস্য বাচকমিতি পদসংস্কারলক্ষণস্য ব্যাপারঃ।..... প্রমাণেন প্রত্যক্ষাদিনৈতদুপপন্নমিতি যুক্তিযুক্তত্বং নাম প্রমাণলক্ষণস্য প্রয়োজনম্। ইদমেব পরিস্পন্দমাহাত্ম্যাত্ সহৃদয়হৃদয়হারিতাং প্রতিপন্নমিতি সাহিত্যস্যোপযুজ্যমানতা’।[২৯]

উক্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর এখন ‘সাহিত্য ও দর্শন: একে অন্যের পরিপূরক’ এই অধ্যায়ে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বিপুল রচনাকৃতির মধ্যে এই সাহিত্য ও দর্শন যে একে অন্যের পরিপূরক এই ভাবটি সংশ্লেষিত হয়েছে তা প্রতিপাদন করা হবে। পূর্বের আলোচিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে সাহিত্য ও দর্শন স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হয় নি, দর্শন ব্যতীত সাহিত্য সৃষ্টি হলে তা যেমন প্রতিবাদীর কাছে যুক্তিসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না, ঠিক তেমনি সাহিত্য ছাড়া যদি দর্শন সৃষ্টি হয় তা হবে কেবল কর্কশ, যুক্তিবহুল যা সহৃদয় সমাজে গ্রহণযোগ্য নাও হতেও পারে। কারণ অলংকারশাস্ত্রেই প্রতিপাদিত হয়েছে ‘কান্তাসম্মিত উপদেশ’ অধিক গ্রহণযোগ্য। যদি কোন সমালোচক মনে করেন যে সাহিত্য কেবলমাত্র সরল মধুর আলোচনার প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ থাকে তাতে

দর্শনশাস্ত্রের মত মুক্তিলাভের উপায় নেই তা যথার্থ নয়। কারণ *কাব্যালংকার* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।

প্রীতিং করোতি কীর্ত্তিং চ সাধুকাব্যনিষেবণম্।।[৩০]

সুতরাং তর্কাচার্য মহাশয়ের সমগ্র রচনাকৃতি অর্থাত্ মহাকাব্য, দৃশ্যকাব্য ও খণ্ডকাব্য থেকে নির্বাচিত কাব্যে সাহিত্য ও দর্শনের পরিপূরকতার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণামূলক অধ্যয়ন নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সমগ্র আলোচিত বিষয়টি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে- 'কাব্য বা সাহিত্যের মাধ্যমে দর্শন' ও 'দর্শনের মাধ্যমে সাহিত্য'।

কাব্য বা সাহিত্যের মাধ্যমে দর্শন :- তর্কাচার্য মহাশয় একজন নব্যন্যায়ের একনিষ্ঠ অধ্যাপক, দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতির মধ্যে দার্শনিকতার চিন্তা দেখা যায়। সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে তিনি যেন গভীর বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যা কিনা দর্শনচিন্তার নামান্তর।

মাণবকগৌরবম্ :- মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিয়ে কালীপদ তর্কাচার্য নিজ নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার স্পর্শে একটি রসোত্তীর্ণ সপ্তাঙ্ক নাটকের রচনা করেছেন। এখানে সর্বত্র ভক্তি মতাদর্শের চিন্তাধারা বিশেষত গুরুভক্তির ভাবাদর্শ প্রতিপাদিত হয়েছে। নাটকটি গুরু শিষ্যের এক শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুর সম্পর্ক অনবদ্য এক রসাত্মক বাক্যে পরিবেশিত হয়েছে।

গুরু ধৌম্য ও শিষ্যগণের (কাত্যায়ন, হারীত, উপমন্যু, বৈশম্পায়ন) কথোপকথনের মধ্যে এক সুসংহত উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। এখানে গুরুর উপদেশের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির আদর্শবোধ ফুটে উঠেছে। নাটকে প্রাচীন গুরু শিষ্য

পরম্পরায় তপোবনের আদর্শবোধ দেখা যায়, সেই সাথে বর্তমানসময়ের সেই ধারার অবনমন, যেন আলোচ্য নাটকে সুস্পষ্ট হয়েছে। নাটকের প্রথমেই সূত্রধরের কথোপকথনে গুরু ধৌম্যের কাব্য, ব্যাকরণ ও দর্শনাদি বিষয়ে তিনি যে সুপণ্ডিত সেই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সূত্রধর বলেছেন-

কাব্যে ব্যাকরণে পুরাণবিষয়ে বেদে তথা দর্শনে
তর্কে ছন্দসি বাদতন্ত্রনিবহে শিক্ষানিরুক্তাদিকে।
মীমাংসাপরিবিস্তরে পরিবৃঢ়ঃ কল্পে স্মৃতৌ জ্যৌতিষে
শিষ্যাণামুপদেশকঃ স ভগবানায়োদধৌম্যো যথা।।[৩১]

বেদান্তদর্শনের সাধনচতুষ্টয়ের শ্রদ্ধা প্রসঙ্গ :- আলোচ্য নাটকে *বেদান্তসার* গ্রন্থের যে সাধনচতুষ্টয়-শমাদিষটকসম্পত্তির অন্তর্গত 'শ্রদ্ধা' প্রসঙ্গের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এই শমাদিষটকসম্পত্তি (শমাদয়ঃ শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধাখ্যাঃ[৩২]) মধ্যে শ্রদ্ধা অন্যতম। এই শ্রদ্ধা হল গুরুর উপদেশের প্রতি এবং বেদান্ত বাক্যের প্রতি বিশ্বাস। *বেদান্তদর্শনে* বলা হয়েছে কেবলমাত্র শ্রবণ, মনন করিলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় না, শ্রদ্ধাপূর্বক করলে তবে তত্ত্বজ্ঞান হয়। গীতায় বলা হয়েছে- 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তত্পরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ'।[৩৩]

এমনকি *ঋগ্বেদের* শ্রদ্ধাসূক্তে(১০.১৫১.১) শ্রদ্ধার মহত্ত্ব সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক কর্মকে শ্রদ্ধাযুক্ত করার প্রার্থনা করা হয়েছে। অশ্রদ্ধার দ্বারা কোন কিছুই সম্ভব হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন সেকথা-

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যত্।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তত্-প্রেত্য নো ইহ।।[৩৪]

অর্থাত্ হে পার্থ শ্রদ্ধাহীন হয়ে যে যজ্ঞ, দান বা কর্ম করা হয়, তা অসত্ ও নিস্ফল। তা ইহলোকে ও পরলোকে কোন ফল প্রদান করে না।

আলোচ্য *মাণবকগৌরবম্* নাটকে গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা সর্বত্র বিরাজমান। তৃতীয়াঙ্কে গীতরত আরুণির গানের মধ্য দিয়ে এক চরম শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে-

হে গুরুদেব পদং তব বন্দে
কুরু করুণাং ময়ি বিরলানন্দে
তিমিরশতাবৃত-মানসভবনে দীপয় দীপং দুষ্কৃতশরণে
নাশয় পাপং হাপয় তাপং যেন শিবং ভুবি বহুলং বিন্দে।
ত্বং মম তাতঃ স্নেহনিধানং ত্বমপি চ জননী শিবশতশরণম্
তব পদলাভাত্ সফলং জননং বিতর কৃপাং ময়ি সততং বন্দে।।[৩৫]

এইভাবে সমগ্র নাটকে গুরুদেবের প্রতি চরম শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। গুরুভক্ত অন্ধ উপমন্যু কূপে পতিত হলেও তিনি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা থেকে বিচ্যুত হন নি, তাই শেষপর্যন্ত গুরুভক্তি থেকেই পরিত্রাণ পেয়েছে। নাটকের সপ্তমাঙ্কে কূপে পতিত উপমন্যুর গানে এই পরিচয় পাওয়া যায়-

কো মম সম্প্রতি শরণম্?
হা হা দৈবাদন্ধতয়া মে ভবিতা নূনং মরণম্।
.... এহি গুরো! মাং পশ্য বিপন্নং
বিপদি ন বীক্ষে সংশ্রয়মন্যম্,
কো মম দবয়তু দুস্তরদৈন্যং,
পরিতো দুর্গমগহনম্।।
বিহরসি বায়ো! নিখিলে ভুবনে,

জ্ঞাপয় গুরুমিদমাশ্রমভবনে,

করুণা তব যদি নান্তঃকরণে,

নিয়তং যমপুরগমনম্।।[৩৬]

তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতাদর্শ :- *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* শীক্ষাবল্লীতে বলা হয়েছে- 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।... স্বাধ্যায়প্রচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্'।[৩৭] অর্থাত্ সত্য থেকে প্রমত্ত হওয়া উচিত নয়, ধর্ম থেকে প্রমত্ত হওয়া উচিত নয়, বেদাধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা থেকে কখনও প্রমত্ত হওয়া উচিত নয়। আবার এরপরেই এই উপনিষদে বলা হল- 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।[৩৮]

উক্ত নাটকে শিষ্যগণের প্রতি গুরু ধৌম্যের উপদেশে যেন তৈত্তিরীয় উপনিষদে বাণী ধ্বনিত হয়েছে। গুরুর সদুপদেশ সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়েছে সমগ্র নাটকে। ধৌম্যের উক্তি-

গুরৌ যে বিদ্বেষং মনসি পরিপুষ্ণন্তি বিবশা

অসক্তাঃ স্বাধ্যায়ে ব্যসনমথবা কিঞ্চন গতাঃ।

ন বা নিত্যাচারাত্ বিদধতি বৃথাপ্রত্যয়ভৃতো

ন তে মূঢ়াঃ সহ্যা মম নয়লয়াদাশ্রমপদে।।[৩৯]

নীতিবোধের জীবনদর্শন:- কাশ্যপকবি এই নাটকে নীতিবোধের জীবনদর্শন শিক্ষা দিয়েছেন বলে মনে করা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন কঠোপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করেছিলেন মানব বিবেক জাগ্রত করার জন্য- 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'।[৪০] আলোচ্য নাটকের প্রথমাঙ্কে ব্রহ্মচারীর গানে সেই দর্শনবোধ দেখা যায়-

অয়ি জাগৃহি মূঢ় জীব নিদ্রাং কিমু সেবসে

ন কথমরুণরাগরক্তপূর্বগগনমীক্ষসে।

তপনতুষ্টিসাধনং ভবগদাব্ধিতারণং
পরিকল্পয় পূতমর্ঘ্যমথ কিমিতি বিলম্বসে।
স্মর নিজেষ্টদেবতাং নাশয় চিরমূঢ়তাম্
শর্ক্তি চিনু দীর্ঘদিবসকৃতিকৃতে চ মানসে
সন্ধ্যাং ভজ সুস্মিতাং তরূণারূণরঞ্জিতাং
জড়তামিহ পরিহর নর পুণ্যরুচিরতেজসে।[৪১]

নীতিবোধের চিন্তাধারা যাতে শিষ্যগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সেইজন্য গুরু ধৌম্যের উপদেশ দেখা যায় নাটকের সংলাপে, যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল 'গুরুভক্তি' নারীচরিত্রের উপস্থাপনা। নাটকের তৃতীয়াঙ্কে বিবেকের গানের মধ্যে দিয়ে যেন জীবনদর্শন প্রকাশিত-

ক্ষেমাক্ষেমকরম্বিতমখিলং দুঃখং সুখমপি বহু বিভ্রাণম্।
কুসুমং বিকসতি যত্র বনান্তে কণ্টককুঞ্জাতত্র রমন্তে
প্রসরতি কম্রা বৃত্তিঃ খান্তে পরূষাপি চ বহুভাবনিদানম্।
বিষমিহ জনয়তি জীবননাশং সুখয়ত্যমৃতং স্বহিতহতাশম্!
দ্বন্দ্বং ধত্তে ক্রমিকবিলাসং প্রকৃতিঃ প্রচরতি ভেদনিধানম্।।[৪২]

প্রশান্তরত্নাকরম্ :- তর্কাচার্য বিরচিত দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তরের অতিপরিচিত উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত নবমাঙ্কবিশিষ্ট সার্থক নাটক। চরিত্রচিত্রনের আদর্শে নাট্যকার প্রতি নাটকেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন- *মাণবকগৌরবম্* নাটকে যেমন গুরুভক্তি, *স্যমন্তকোদ্ধারে* যেমন বিষ্ণুভক্তি, তেমনি এই নাটকে সুবুদ্ধি বা সুমতি এবং কুবুদ্ধি বা কুমতি ইত্যাদি চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেছেন, যা তর্কাচার্য মহাশয়ের মৌলিক সৃষ্টি। তবে এই নাটকের মূলে আছে আদর্শ জীবনবোধের দর্শন। দরিদ্র রত্নাকরের কষ্টকর জীবনযাপন, দস্যু রত্নাকরের চরিত্র, রত্নাকরের কর্মভোগ, মহর্ষি বাল্মীকিতে পরিণত- এই সকল যেন মানবজীবনের উত্তরণের চেতনামূলক দর্শনবোধ।

মানবজীবনের পরিশুদ্ধি ও জীবনবোধের দর্শন :- পরিতাপ, আত্মগ্লানি, দুঃখজিজ্ঞাসা ও আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব, বিস্ময় থেকে ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব হয় নি। আমি কে এবং কিভাবে আমি দুঃখাতীত হতে পারি, এই দুটি মূলত ভারতীয় দর্শনচর্চার বীজ। ভারতীয় দর্শনকে তাই দুঃখবাদী বলা যেতে পারে। তবে একথা সত্য চার্বাক ছাড়া সকল ভারতীয় দর্শনেই জীবনের দুঃখময় দিকটিকে সযত্নে অঙ্কিত করেছে। যেমন সাংখ্যদর্শনের গ্রন্থ *সাংখ্যকারিকা* শুরু হয়েছে দুঃখ দিয়ে (দুঃখত্রয়াভিঘাত্ জিজ্ঞাসা তদপঘাতক হেতৌ..)।[৪৩] সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* টীকায় বললেন-

‘এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত যদি দুঃখং নাম জগতি ন স্যাত্, সদ্বা অজিহাসিতং, জিহাসিতং বা অশক্য সমুচ্ছেদ...’।[৪৪]

অর্থাত্ যদি দুঃখ নামে কোন পদার্থ জগতে না থাকত, তা হলে শাস্ত্রবিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা হত না....। বলা হয়েছে সমগ্র জগত্ই ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ইহলোকে সুখকে স্বীকার করেন নি, তাই তো *ন্যায়বার্ত্তিককা*রের ২১ প্রকার দুঃখের মধ্যে সুখ হল একপ্রকার দুঃখ। আর অপবর্গ বলতে নিঃশ্রেয়স আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলা হয়েছে।

কালীপদ প্রতিটি নাটকের মত এ নাটকেও একটি সামাজিক বার্তা প্রেরণ করে। এই নাটকেও দরিদ্র ও অসহায় রত্নাকরের দুর্দশাক্লিষ্ট জীবন দিয়ে আরম্ভ হলেও পরিশেষে বাল্মীকি মুনিতে রূপান্তর, যার মুখারবিন্দ থেকে প্রথম শোক বা শ্লোকের সঞ্চার হয়েছিল রামায়ণের মত মহাকাব্যের।

পরিতাপ ও আত্মগ্লানি মানুষের পাপাত্মাকে শুদ্ধ করে। জপতপই আত্মশুদ্ধির এক অন্যতম উপায়। অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে তপস্যার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়।

জীবনবোধের এই দর্শন প্রমাণিত হয়েছে রত্নাকর থেকে বাল্মীকির পরিণত হওয়াকে। নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথমেই বেদনাপূর্ণ জীবনবোধের দর্শন দেখা যায় উক্ত শ্লোকে-

গেহেষু গত্বা ধনিনা সমেষা সম্পার্থিতাস্তে লবণমাত্রভৈক্ষ্যম্।

কেনাপি হা হা ন কৃতাঽনুকম্পা বৃথৈব সর্ব দিবস শ্রমো মে।।[৪৫]

অন্যদিকে এই নাটকে ভিক্ষুবেশে গীতরতা সুমতি যেন মানবজীবনের নিয়তির ভূমিকা পালন করেছে, তার গান যেন সেই কথা স্মরণ করায়-

জীব গুণাকর সুচরিতমনুসর খলতা পরিহর বহ বহুমানম্,

ভৌতিককায়ে দুরিতসহায়ে মা কুরু মা কুরু গৌরবদানম্।

বিধিবিপরীত বিধিমনু ভীত মানসমধিকুরু লসদনধানম্,

বরমিহ মরণ সুচরিতশরণ তদপি বর নহি পাপবিধানম্।।[৪৬]

এবার তর্কাচার্য মহাশয়ের মহাকাব্যগুলির মধ্যে দর্শনভাবনার অন্বেষণ করা হবে নিম্নোক্ত আলোচনায়। কাশ্যপকবি রচিত দুটি মহাকাব্য পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি হল *সত্যানুভাবম্* ও *যোগিভক্তচরিতম্*।

***সত্যানুভাবম্* :-** চতুর্বিংশসর্গবিশিষ্ট স্কন্দপুরাণের সত্যনারায়ণের বৃত্তান্ত নিয়ে এই মহাকাব্যটি তর্কাচার্য মহাশয় রচনা করেন। এই মহাকাব্যে দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাকাব্য মহাভারতেও নানাবিধ দর্শনবিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়। মহর্ষি বেদব্যাস রচিত *মহাভারত* এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ভরতবংশীয়দের মহাযুদ্ধের কাহিনী এর মূল বিষয়বস্তু হলেও এর কাহিনী আশ্রয়ে মিলিত হয়েছে অজস্র উপাখ্যান, উপদেশ, ধর্ম, কর্ম, সমাজনীতি ভারতের চিরায়ত আদর্শ এমনকি ভারতবর্ষের নানান দর্শন সম্প্রদায়।

মহর্ষি বেদব্যাস এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন –

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।

যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তত্ ক্বচিত্’।।[৪৭]

এই বাক্যের ফলশ্রুতি হল – ‘যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে। অর্থাত্ এই মহাভারতে সকল উপাদানই বিদ্যমান আছে। এমনকি এখানে উপনিষদ্ তত্ত্ব ও দর্শনের চরম তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। মহাভারতে শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম অধ্যায়ে, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অংশে অতুলনীয় দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এখানে ‘সাংখ্য’, ‘যোগ’, ‘চার্বাক’, ‘সৌগত’, প্রভৃতি দর্শনের পাশাপাশি মহর্ষি গৌতমের ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।

সুতরাং *সত্যানুভাবম্* মহাকাব্যে চরিত্রচিত্রণ, কাহিনীর উপন্যাস ও ছন্দমাধুর্য থাকলেও সেখানে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারধারা পরিলক্ষিত হয়।

উপনিষদের চিন্তাধারা:- ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মযোগের প্রশংসা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।[৪৮]

অর্থাত্ এই জগতে শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল করতে করতে শতবছর বাঁচতে ইচ্ছা করবে, এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই যার দ্বারা মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এখানে বলা হল কর্ম করতে করতে কর্মসমূহের লিপ্ত না হবার এটাই একমাত্র পথ, এ ব্যতীত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার অন্য কোন পথ নেই। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় ও পঞ্চম অধ্যায়ে এই মতের অনুরূপ মন্তব্য দেখা যায়-

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।[৪৯]

অর্থাৎ বলা হল যিনি সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেন এবং আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন, তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না।

তর্কাচার্য মহাশয়ের উক্ত মহাকাব্যেও কর্মবাদের প্রশংসা করা হয়েছে, মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হল উপনিষদের চরৈবেতি মন্ত্র। তাই সকল সময়ে আসক্তিহীন হয়ে কর্ম করা উচিত। তাই এই মহাকাব্যের *নারদোপদেশো* নামক ষষ্ঠসর্গে দেবর্ষির মুখে কর্মের প্রশংসা দেখা যায়, সামর্থ থাকলে ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি কখনই প্রশংসিত করেন নি। নারদ বলেছেন-

পরভাগ্যপথোপজীবিনো বত জীবন্তি বৃথৈব সংসৃতৌ।
স্বসুখায় পরস্য তাপকাঃ কিমু নৈতে বহুপাপভাগিনঃ।।
যদি তে ধনমদ্য দীয়তে তদিহ শ্বঃ পুনরাগতিস্তব।
ইদমর্থমিদং ন মঙ্গলং জগতঃ পৌরুষনাশকারণম্।।
পরিমুঞ্চ বিমূঢ়তাচ্ছলং ত্বরয়োত্তিষ্ঠ যতস্ব কর্মণে।
ইহ পৌরুষমেব শস্যতে ন তু যাচঞ্ঞা নিকৃতের্নিবন্ধনম্।।[৫০]

আবার মহর্ষি নারদ একটি উপমার সাহায্যে এই কর্ম প্রশংসার কথা বলেছেন যে – ভূমিতলে বহু জলধারা থাকা সত্ত্বেও চাতক পাখির বারি প্রার্থনা বিহগকুলের মধ্যে নিকৃষ্ট কাজ, তেমনি কর্ম থাকতে কর্ম না করা গৌরবের নয়, নিন্দা বটে। নারদের উক্তি-

সতি ভূমিতলে সরিচ্ছতে মধুরাম্ভঃপ্রচয়প্রপূরিতে।
বিহগেষু গতা নিকৃষ্টতাং জলদপ্রার্থনয়ৈব চাতকাঃ।।[৫১]

আত্মচেতনাবোধের বিচার ও লোকশিক্ষার দর্শন :- *রমোপদেশ* নামক দ্বিতীয়সর্গে কলিকালের অনাচার লক্ষ্য করে নারায়ণের মনব্যাথ্যা দূর করার জন্য মহালক্ষ্মী রমার উপদেশ যেন আত্মচেতনাবোধ জাগ্রত করার সূক্ষ্মদর্শনচেতনামূলক। রমার উক্তি-

ইত্থং সর্বজগদ্-গুরুং স্থিতিপরং দৃষ্টা বিকারং গতং
পদ্মা চ্ছদ্মবিভেদনস্থিরমতিঃ কৃত্বা স্মিতং প্রাবদত্।
হে নারায়ণ! শক্তিমানপি পরস্ত্বং তত্ত্বসিদ্ধিক্রমে
যন্মাং পৃচ্ছসি তদ্ধি গৌরবপদং ত্বত্-পাদপদ্মোদ্ভবম্।।[৫২]

এরপরেই এই কলির বিনাশে রমা নারায়ণকে উৎসাহিত করার জন্য দশাবতার বর্ণনা করেছেন। অর্থাত্ যখন এই অধর্মের পথ জেগে ওঠে তখনই ধর্মের অবতার অবতীর্ণ হয়ে অধর্মকে বিনাশ করে। এরপরেই আমরা রমার উক্তিতে লোকশিক্ষার দার্শনিক মত দেখতে পাই-

লোকানামিহ শিক্ষণায় কতিশঃ কর্মাণি সম্পাদয়ন্
লোকাতীতগুণোঽপি লোকনিয়মান্নোপেক্ষসে লোকবত্।
তস্মাদেব জনাপবাদভয়তো জ্ঞাত্বাপি দোষোজ্ঝিতাং
সীতাং গর্ভভরালসাং বনতটে নিঃসম্বলাং পৈষয়ত্।।[৫৩]

পরমাত্মা ও ঈশ্বরের প্রশংসা:- 'তত্র ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মা একমেব'। এখানে এই মহাকাব্যে ঈশ্বর সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যবর্ণনা করা হয়েছে বিবিধ ঘটনার বিন্যাসে। মহাকাব্যের চতুর্বিংশ সর্গে তাই বলা হয়েছে-

জগতি গতিবিহীনে ভানু সত্যানুকম্পা
শিবমশিববিরোধং তত্প্রভাবাদ্বিধত্তাম্।
লয়ময়তু বিষাদঃ সত্যভক্তেষু নিত্যং
জয়তি জয়তি দেবঃ সত্যনারায়ণাত্মা।।[৫৪]

এরপর সাহিত্য ও দর্শন একে অন্যের পরিপূরক এই বিষয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে দর্শনচিন্তা প্রতিপাদন করতে গিয়ে কাশ্যপকবির খণ্ডকাব্যগুলির দার্শনিক উপাদান

আলোচিত হয়েছে নিম্নোক্ত আলোচনায়। তর্কাচার্য মহাশয়ের তিনটি খণ্ডকাব্য থাকলেও যে দুটি খণ্ডকাব্য পাওয়া যায় সেগুলি হল *আলোকতিমিরবৈরম্* ও *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*।

আলোকতিমিরবৈরম্ :- দিল্লীর *সংস্কৃতপ্রতিভা* পত্রিকায় ১৯৫৯-৬০ সালে অক্টোবর ও এপ্রিলমাসে এই *আলোকতিমিরবৈরম্* খণ্ডকাব্যটি প্রকাশিত হয়। আলোক ও তিমির অর্থাত্ অন্ধকারের শত্রুতা নিয়ে কাব্যোচিত ভঙ্গীতে উক্ত খণ্ডকাব্যটি রচনা করা হয়েছে। এই কাব্যটিকে দুটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে- প্রথমপর্বে নব্যনৈয়ায়িকের যুক্তিবিচারের আলোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও দ্বিতীয় পর্বে মীমাংসক সম্প্রদায়ের বিচারে তিমির বা অন্ধকারের মহত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। কারণ ন্যায়সম্প্রদায় অন্ধকারকে পৃথক দ্রব্য বলে স্বীকার না করলেও, ভাট্টমীমাংসক সম্প্রদায় অন্ধকারকে আলাদা দ্রব্য বলে স্বীকার করেছেন। এই কাব্যটির মূল তত্ত্ব দর্শন। তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রতিভায় এখানে কাব্য বা সাহিত্যের মাধ্যমে দার্শনিক বিচার পরিবেশিত হয়েছে। নৈয়ায়িক শিরোমণি কালীপদ মূলত দর্শনের মূলভাব নিয়ে সহৃদয়সমাজে এই কাব্যটি উপহার দিয়েছেন।

*তর্কসংগ্রহদীপিকা*টীকা ও *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থের *সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে* এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাওয়া যায়। সাতটি পদার্থের মধ্যে দ্রব্য নয়প্রকার, এর অতিরিক্ত নয় এই আলোচনা প্রসঙ্গে অন্ধকারের দ্রব্য বিষয়ের অবতারণা। পূর্বপক্ষের মত উল্লেখ করে বলা হয়েছে ‘ননু দশমং দ্রব্যং তমো কুতো নোক্তম্’ আচ্ছা দশম দ্রব্য যে অন্ধকার কি হেতু বলা হবে না? বলে মীমাংসকদের যুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে –

‘তদ্ধি প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে। তস্য চ রূপবত্ত্বাত্ কর্মবত্ত্বাচ্চ দ্রব্যত্বম্। তদ্ধি গন্ধশূন্যত্বাদ্ ন পৃথিবী, নীলরূপবত্ত্বাচ্চ ন জলাদিকং, তত্প্রত্যক্ষে চালোক-নিরপেক্ষং চক্ষুঃ কারণমিতি চেত্’।[৫৫]

পূর্বপক্ষ মীমাংসক বলছেন যেহেতু তা প্রত্যক্ষের দ্বারাই গৃহীত হয়ে থাকে। রূপ ও কর্ম তাতে থাকায় তার দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হয়। অন্ধকার গন্ধশূন্য বলে পৃথিবী নয়, নীলরূপ থাকায় তা তেজ ও জল নয়। অন্ধকারের প্রত্যক্ষে আলোক নিরপেক্ষ চক্ষু কারণ। সুতরাং অন্ধকার দশম দ্রব্য।

এর উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেছেন- 'আবশ্যক-তেজোঽভাবেনৈবোপপত্তৌ দ্রব্যান্তর-কল্পনায়া অন্যায্যত্বাত্। রূপবত্তা-প্রতীতিস্তু ভ্রমরূপা। কর্মবত্তা-প্রতীতি-রপ্যালোকাপসারণৌপাধিকী ভ্রান্তিরেব। তমসোঽতিরিক্ত-দ্রব্যত্বেঽনন্তাবয়বাদি কল্পনা-গৌরবঞ্চ স্যাত্।[৫৬]

নৈয়ায়িক বলেছেন- তা বলা যায় না, কারণ তেজের অভাবের দ্বারাই অন্ধকারের উপপত্তি। তাই অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলা যায় না। অন্ধকারের রূপপ্রতীতি ভ্রান্ত। কর্ম প্রতীতিও ভ্রান্ত। অন্ধকারকে অতিরিক্ত দ্রব্য বললে অনন্ত অবয়ব কল্পনায় গৌরব দোষ হয়।

উক্ত আলোচনার নির্যাস গ্রহণ করলেও তর্কাচার্য মহাশয় কাব্যের বা সাহিত্যের ধারাকে রসোত্তীর্ণ করার জন্য বহুবিধ মৌলিক বিষয়ের সন্নিবেশ করেছেন। এখানে কিছু লঘু ও সরস বৃত্তান্তের প্রবেশ ঘটেছে। তিমিরের নিন্দা এই প্রথম পর্বে উপলব্ধ হয়। তিমির বা অন্ধকারের কারণে জগতে কি কি অসুবিধা হয় সে বর্ণনা দেখা যায়- আলোকের অনুপস্থিতিতে প্রিয় রমণী পরসঙ্গ আশ্রয় করে কলুষিত হয়, এবং এই তিমিরেই চৌর চৌর্যকার্য করতে প্রবৃত্ত হয় যার ফলে জনজীবননাশ হয়, সুতরাং এ পাপভাগী তুমি (তিমির)-

রমণী প্রিয়সঙ্গমাশয়া তিমিরাসাদনদুর্গমে পদে।

কলুষে পরসঙ্গসম্ভবে ত্বয়ি রূঢ়ে বত সন্নিবেশ্যতে।।

নিশি চৌর্যপরাস্তবাগমে পরবিত্তান্যপহর্তুমুদ্যতাঃ।

জনজীবননাশকর্মণাপ্যভিবিন্দন্তি কিয়ন্ন পাতকম্।।[৫৭]

আলোকের জবানীতে তিমিরের প্রতি আরও দোষারোপ করা হয়েছে যে হৃদয় যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে আলোকের ধারায় উদ্ভাসিত না হয় তাহলে জীবনধারা সঙ্কোচের কর্দমে নিমজ্জিত হয়। ভয়যুক্ত বিকারগ্রস্ত মন জীবনকে কোন সাহায্য করে তো না বরং মানুষ বিপথে চালিত হয়-

হৃদয়ং তমসঃ সমাগমে শ্রিতসঙ্কোচমিবাঙ্কপঙ্কিলম্।

পরিতঃ পরিণাহিতা দিশামবলুপ্তেব তদা বিভাব্যতে।।

ভয়ভারবিকারিমানসা ন সহায়েন বিনাত্মনঃ পদে।

ভবতা বিকৃতে মহীপথে প্রতিগন্তুং নিতরামলং জনাঃ।।[৫৮]

এরপরেই আলোকের অভিযোগ এই বৃথা জীবন নিয়ে কেন তুমি এই পৃথিবীতে অবস্থান করছ তোমার খেদ করা উচিত-

‘.....বিফলং কিমু জীবনং বহত্ পরিখেদায় ভুবো বিরাজসে?[৫৯]

দ্বিতীয়পর্বে ‘আলোকং প্রতি তিমিস্তোরম্’ অংশে আলোকের নিন্দা করা হয়েছে তিমিরের জবানীতে- পৃথিবীতে জলের শোভাবর্ধনকারী ও মানুষের চিত্তমনোহারী কুমুদ ফুল কিন্তু তিমিরে চন্দ্রের কিরণে প্রস্ফুটিত হয়, এ ছাড়া মন্ত্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পূর্ণিমায় না যতটা আনন্দিত হয়, ততটা আনন্দিত হয় অমাবস্যার গহন অন্ধকারে, কারণ এই সময় তার সিদ্ধিলাভের সময়-

সরসীসলিলপ্রসাধনং ত্রিদশানামপি চিত্তরঞ্জনম্।

কুমুদং মিহিরং গতস্তথা কমলং হংসি বিধুং ত্বমাশ্রিতঃ।।

প্রিয়তান্ত্রিকমন্ত্রসিদ্ধয়ঃ সুধিয়ঃ পূর্ণিময়া ন হর্ষিণঃ।

তিমিরাবৃতদর্শযামিনীমনুগচ্ছন্তি মহাবিভূতয়ে।।[৬০]

তিমিরের কথায় শতদোষ সত্ত্বেও সত্-ব্যক্তি কখনও ইতরের নিন্দা পছন্দ করে না, কিন্তু খলব্যক্তি অন্যের ভাল গুণাবলীগুলিকে গৌণ করে সামান্য দোষকে মুখ্য করে উপস্থাপিত করেন। আলোকের মত অসদ্ ব্যক্তি নিজ বিষয়ে অন্ধদৃষ্টি পোষণ করেন, কিন্তু পরের দোষেতে সহস্র লোচনে পরছিদ্রান্বেষণ করতে ব্যগ্র থাকেন-

অসতাং নয় এষ সর্বতো নিজদোষে যদিমেঽন্ধদৃষ্টয়ঃ।

পরগৌরববোধবর্জিতাঃ পরদোষেষু সহস্রলোচনাঃ।।

ইতি বচনমুদীর্য তীক্ষ্ণশান্তং তিমিরমগাত্ ত্বরিতং মহাদ্রিকুক্ষিম্।

লঘুচরিতমহস্বিবৈরিভীতা মহদনুগা হি ভবন্তি বুদ্ধিমন্তঃ।।[৬১]

মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্ :- কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অন্যতম খণ্ডকাব্য হল *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*। এই কাব্যে আচার্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, করুণরস প্রধান এই খণ্ডকাব্যটিতে জীবনবোধের বাস্তবচিত্র কাব্যোচিত ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়েছে। *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* খণ্ডকাব্যটি কালীপদ তর্কাচার্যের জীবন দর্শনের এক ক্ষুদ্রাকার দর্পণ বলা চলে। ষষ্ঠ বিলাসে পরিবেশিত এই কাব্যে প্রেম, মাধুর্য, গ্রাম্য প্রকৃতির সৌন্দর্য, পত্নী বিয়োগজনিত বিরহতাপ, দুঃখবেদনা ছাড়িয়ে এই খণ্ডকাব্য কবিচেতনার দর্শন যেন আনন্দলোকের পথে উত্তরণ ঘটেছে। এখানে মনে হয় কবিসত্তা দুঃখের কষ্টিপাথরে পরিশুদ্ধ ও নির্মল হয়ে পরিশুদ্ধি ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

মহাকবি কালিদাসের *মেঘদূত* গ্রন্থ থেকে বিরহী যক্ষের ভাবনার দর্শন নিয়ে যেন তর্কাচার্য মহাশয় এই কাব্যটি সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দের নির্বাচন, বিপ্রলম্ভ

শৃঙ্গার রসের পরিবেশন, বিরহের আর্তি সকল বিষয়ে মহাকবি কালিদাসের সাথে সাদৃশ্য মেলে। ভারতীয় প্রকৃতির চিত্রের সৌন্দর্যের পাশাপাশি যক্ষদম্পতির প্রেমগাথা ও অন্যদিকে বঙ্গীয় পল্লীপ্রকৃতির সাথে নায়ক-নায়িকার বিরহ দাম্পত্যজীবন যেন একই প্রতিচ্ছবি।

এইভাবে আচার্য মহাশয় উপরিউক্ত আলোচনায় কাব্য বা সাহিত্যের মাধ্যমে সূক্ষ্ম দর্শনবোধ ও দার্শনিক মনোভাবের ভাবধারার আলোচনা করেছেন। ফলস্বরূপ কাব্যসৌন্দর্যের রসবোধ ও সৌন্দর্যচেতনা যথার্থ পরিপুষ্টিও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে পণ্ডিতসমাজে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

দর্শনের মাধ্যমে সাহিত্য :- সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে নিবিড় তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কবি বা সাহিত্যিক যেমন সত্যদ্রষ্টা তেমনি দার্শনিক হলেন সত্যদ্রষ্টা। এই জন্যই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তাই তো *বৃহদারণ্যক-উপনিষদে* ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন- 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো...'[৬২]। অর্থাত্ হে মৈত্রেয় আত্মদর্শন করতে হবে, আত্মশ্রবণ করতে হবে, আত্মমনন করতে হবে, আর এই আত্মমনন হল যুক্তির মাধ্যমে আত্মানুসন্ধান। যেখানে দর্শনের আলোচনা এসে পড়ে।

তর্কাচার্য মহাশয় ভারতীয় দর্শন বিশেষত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উপর একাধিক গ্রন্থ টীকাসহ সম্পাদনা করেছেন। এই সকল দর্শন গ্রন্থের আলোচনা, পর্যালোচনা, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, মৌলিক তথ্যের অবতারণা করতে গিয়ে বিচার প্রসঙ্গে কাব্যতত্ত্ব ও সাহিত্যের আলোচনার সন্নিবেশ করেছেন কাব্যিক নৈপুণ্যে। দর্শনের গুরুগম্ভীর আলোচনা যাতে পাঠকগণের কাছে প্রধানত প্রথম পাঠার্থীর কাছে নিরস না হয়ে ওঠে

এইজন্যই আচার্য মহাশয়ের প্রয়াস। আচার্য মহাশয় নব্যন্যায়ের মত গম্ভীর আলোচনা অতি সহজে বোধগম্যতার জন্য সর্বাধিক প্রয়াস করেছেন। প্রতিটি দর্শনগ্রন্থ সম্পাদনাকালে গ্রন্থের প্রথমে আনুষঙ্গিক দীর্ঘ কাব্যিক আলোচনা সেই গ্রন্থের প্রধান পরিচয় বহন করে।

দর্শনের মূল তত্ত্ব আহরণ করে তা যে কাব্যের ছলে বর্ণনা করা যায় তা তর্কাচার্য মহাশয় *আলোকতিমিরবৈরম্* নামক খণ্ডকাব্য রচনায় মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের যুক্তিপূর্ণ অন্ধকারের দ্রব্যত্ব অস্বীকার এই কাব্যে পরিবেশিত হয়েছে। দর্শন গ্রন্থের আলোচনার শুরুতে তিনি কবিসুলভ আচরণে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে তিনি সেই গ্রন্থের বিবৃত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। দর্শনের আলোচনাতে তিনি অলংকারশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন, এর উদাহরণ পাওয়া যায় *প্রবচনত্রয়ী* (কাশীতে আমন্ত্রিত আলোচনাসত্রে তিনটি ভাষণ, পরবর্তিকালে এই নামে প্রকাশিত হয়) নামক গ্রন্থে সেখানে বিষয়ে প্রাসঙ্গিকক্রমে দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ* অলংকারশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে আলোচনা বিবৃত করেছেন। অর্থাত্ দার্শনিক আলোচনায় তিনি কাব্যিক বিষয় উত্থাপন করেছেন।

১৯৬৪ সালে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যক্ষীয় তিনটি প্রবচন বা বক্তৃতার সমাহার। এই বক্তব্যগুলি *প্রবচনত্রয়ী* নামে পরবর্তিকালে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই প্রবচনগুলি ছিল নব্যন্যায়ের পারিভাষিক পদার্থসমূহের উপর, আদ্যোপান্ত গুরুগম্ভীর দর্শনের আলোচনা হলেও এই প্রবচনের প্রারম্ভে কাব্যোচিত ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ প্রতিপাদন করেছেন। মহাকাব্য প্রণয়ন করার সময় দেখা গেছে অধিকাংশ স্থানে

বসন্ততিলক ছন্দের প্রয়োগ করেছেন, দার্শনিক এই আলোচনাতেও উক্ত ছন্দ ব্যবহার করে নিম্নোক্ত শ্লোকটি রচনা করেছেন-

গঙ্গাতরঙ্গনিকরৈর্মুখরোত্তমাঙ্গং
ভূত্যা সিতং দলিতভূতিবিশেষসঙ্গম্।
জ্ঞানেশ্বরং তিমিরভারহরং সদারং
শ্রীবিশ্বনাথমভয়ং সভয়োঽহমীড়ে।।[৬৩]

কাব্যিক বর্ণনায় দক্ষ তর্কাচার্য মহাশয় অজ্ঞানান্ধকার হরণকারী জ্ঞানের ঈশ্বর কাশীশ্বর বিশ্বনাথের বন্দনা করেছেন।

আবার প্রথম প্রবচন *নব্যন্যায়পারিভাষিকপদার্থ* বিষয়ে বলতে গিয়ে কাব্যশাস্ত্রকার আচার্য দণ্ডীর *কাব্যাদর্শের* প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। শাব্দবোধের মাহাত্ম্যের কথা বলতে গিয়ে কাব্যাদর্শের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তর্কাচার্য মহাশয়-

ইদমন্ধং তমঃ কৃত্স্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।।[৬৪]

এই সমগ্র ত্রিভুবন গাঢ় অন্ধকারের সমাচ্ছন্ন হত, যদি শব্দ নামক জ্যোতি সৃষ্টিকাল থেকে জগতে প্রকাশ না পেত। অর্থাত্ এই বক্তব্যের তাৎপর্য হল এই সূর্য প্রকাশিত না হলে যেমন ত্রিভুবন গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি শব্দরূপ জ্যোতির প্রকাশ না ঘটলে ত্রিভুবন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকত। সকল পদার্থের যথাযথস্বরূপ প্রকাশিত হয় বা জ্ঞানগোচর হয় শব্দের দ্বারা। এজন্য শব্দ জ্যোতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। *বাক্যপদীয়* গ্রন্থে এজন্য শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

তর্কাচার্য মহাশয় কাব্যশাস্ত্রের এই শাব্দবোধের আলোচনা নব্যন্যায়ের পারিভাষিক পদার্থের আলোচনার সাথে সাযুজ্য প্রতিপাদন করেছেন। অর্থাত্ নব্যন্যায়ের ভাষা হল একটি কৃত্রিম ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট পরিভাষা, যেহেতু প্রত্যেক শাস্ত্রের একটি নিজস্ব পরিভাষা রয়েছে। এই পরিভাষার জ্ঞান আবশ্যক সেই শাস্ত্রের প্রবেশের জন্য। নব্যন্যায়দর্শনের এই বিষয়ের সমর্থনের জন্য আবার তর্কাচার্য মহাশয় *কাব্যাদর্শ* সাহিত্যশাস্ত্রের সমর্থন দেখিয়েছেন-

ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্বথা।

বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ত্ততে।।[৬৫]

অর্থাত্ এই সংসারে শিষ্ট এবং অবশিষ্ট ভাষার প্রসাদে সকল ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। নব্যন্যায়ের এই পরিভাষা শিষ্ট ভাষার মধ্যে পড়ে। সুতরাং আচার্য মহাশয় দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে কাব্যশাস্ত্রের তত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কালীপদ তর্কাচার্য (১৯১৭-১৯৭২) আমৃত্যু নিযুক্ত ছিলেন। এই *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকায়* তাঁর গবেষণানিবন্ধগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস মহাশয়ের সম্পাদনায় পত্রিকার ৯২ তম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়, সেখানে তর্কাচার্য মহাশয়ের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়- *তর্কপরিভাষা* ও *ন্যায়বৈশেষিকদর্শনবিমর্শ*। *তর্কপরিভাষা* নামক প্রথম প্রবন্ধে নব্যন্যায়ের পারিভাষিক শব্দের আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিভাষা আলোচনার প্রারম্ভে কাব্যোচিত শৈলীতে শ্লোকাকারে প্রবন্ধবিষয় প্রতিপাদন করেছেন।

যে সকল পরিভাষাগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে সেগুলি হল- প্রথমে মঙ্গলাচরণ শ্লোক, প্রতিযোগিত্ব, অনুযোগিত্ব, অবচ্ছেদক, পর্যাপ্তিসম্বন্ধ, অধিকরণত্ব, আধেয়তা, বিষয়তা,

বিষয়িত্ব, বিশেষত্ব, প্রকারত্ব। গবেষণা নিবন্ধের প্রথমেই মালিনী ছন্দে আচার্য মহাশয় বলেছেন-

ধৃতশিবহরিকায়ং ভক্তসিদ্ধেঃ সহায়ং
শিবজনকবিতীর্ণাং ক্বাপি সীতাং শ্রয়ন্তম্।
স্বজনমুপনয়ন্তং ক্বাপি লক্ষ্মীং সুশীলাং
মহিমবিততকীর্ত্তিং তাতমূর্ত্তিং প্রপদ্যে।।[৬৬]

পরবর্তিশ্লোকে বসন্ততিলকছন্দে আচার্য মহাশয় *তত্ত্বচিন্তামণি*র গ্রন্থকার গঙ্গেশ, নিজপিতা হরিদাস ও গুরুদেবের প্রতি মঙ্গলাচরণ পরিবেশন করে গ্রন্থ প্রয়োজন প্রতিপাদন করেছেন-

গঙ্গেশ মুখ্যনববাঙ্ময়মত্তভৃঙ্গং
শিষ্যপ্রিয়ং প্রিয়পদং বিদুষাং বরেণ্যম্।
সত্ত্বাধিকং নৃপয়তীন্দ্রমতং মহিম্না
বন্দে শিবং হরিমপি স্বগুরুং সদাহম্।।
তর্কবিদ্যার্থিনাং তর্কপরিভাষোপমদ্ধয়ে।
সভয়েন ময়া তর্কপরিভাষা প্রকাশ্যতে।
পুরন্দরকুলদ্যোতী মতিং কালীপদে ময়ি।।
ভব্যামব্যাজমাধত্তাং বান্ধবো মধুসূদনঃ।।[৬৭]

দর্শনের পরিভাষার প্রয়োজন ও পরিভাষার বিভাগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তর্কাচার্য মহাশয় *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থানুসারী কারিকা ও তার বৃত্তি এই ক্রমে সমগ্র প্রবন্ধটি প্রতিপাদন করেছেন। প্রথমেই পরিভাষা এই শব্দের অর্থের নিরূপণ করেছেন-

যয়া শাস্ত্রেঽথবা লোকে পদার্থঃ পরিভাষ্যতে।

লোকে শাস্ত্রে চ সা লোকৈঃ পরিভাষেতি গীয়তে।।

পরিভাষা দ্বিধা প্রোক্তা শাস্ত্রীয়া লৌকিকী তথা।

শাস্ত্রকারকৃতাদ্যা স্যাদ্ দ্বিতীয়া লোককল্পিতা।।[৬৮]

এই কারিকার বৃত্তিতে তর্কাচার্য মহাশয় বললেন- 'অথাদৌ পরিভাষাশব্দার্থো নিরূপ্যতে। শাস্ত্রে লোকে চ সমাসতো বিশেষার্থপ্রতিপত্তয়ে শাস্ত্রকারৈশ্চ লোকৈশ্চ যা সংজ্ঞা নিয়ম্যতে, সৈব পরিভাষেতি ব্যপদিশ্যতে। তদুক্তং গদাধরেণ 'আধুনিকসংঙ্কেতঃ পরিভাষেতি'। যা তু 'উভয়াবৃত্তিধর্মেণ সংজ্ঞা স্যাত্ পারিভাষিকীতি নিরূক্তিপ্রতিপাদ্যা সা তু অন্যাদৃশ্যেব'।[৬৯]

সুতরাং তর্কাচার্য মহাশয় পরিভাষাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন শাস্ত্রীয় পরিভাষা ও লৌকিক পরিভাষা। শাস্ত্রকারকৃত পরিভাষা হল শাস্ত্রীয় পরিভাষা এবং লোককল্পিত পরিভাষা হল লৌকিক পরিভাষা। শাস্ত্রীয় ব্যবহার ও পণ্ডিতদের লাঘবের জন্য নদী, বৃদ্ধ্যাদি প্রভৃতি পরিভাষা হল শাস্ত্রীয় পরিভাষা। যেগুলি সংক্ষেপে বলা হলেও বিবিধ অর্থের প্রতিপাদক হয়। অন্যদিকে লৌকিক ব্যবহারে পিত্রাদি পরিকল্পিত রাম শ্যামাদি হল লৌকিক পরিভাষা। লৌকিক পরিভাষা লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্তে প্রযুক্ত। প্রত্যেক শাস্ত্রের একটি নিজস্ব পরিভাষা আছে। সেই পরিভাষার জ্ঞান ছাড়া উক্ত শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যায় না।

এইভাবে পরিভাষা বিষয়ে ভূমিকা প্রতিপাদন করে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে, সরল বিশ্লেষণে নব্যন্যায়ের সুকঠিন ও সূক্ষ্ম পরিভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ হলেও এই সকল শ্লোকে স্বভাবকবি কালীপদ তর্কাচার্যের কাব্যিক ছাপ স্পষ্ট। এই পরিভাষাগুলি রচনার মধ্য দিয়ে তিনি অসাধারণ দার্শনিক মনীষা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. *বক্রোক্তিজীবিত*, কারিকা ১.১৭, বৃত্তি অংশ

২. *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২১১

৩. *Tri-lingual Dictionary*, p. 424

৪. *সাহিত্য পরিচয়*, পৃ. ৩

৫. *সাহিত্য*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১১২

৬. *রঘুবংশ*, শ্লোক নং ১

৭. *সাহিত্য মীমাংসা*, পৃ. ১৪

৮. *বাক্যপদীয়,* ১.১

৯. *বক্রোক্তিজীবিতম্*, ১.১৭

১০. *তদেব*, বৃত্তি

১১. *তদেব*, ১.৭

১২. *সাহিত্য পরিচয়*, পৃ. ৭

১৩. *সাহিত্য মীমাংসা*, পৃ. ১৫

১৪. *কাব্যমীমাংসা*, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৯

১৫. *ভারতবর্ষ* পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ১৯১৩ আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ৫০০

১৬. *বক্রোক্তিজীবিত*, কারিকা.৭, বৃত্তি অংশ

১৭. *ঋগ্বেদ* ১০.১৯১.৪

১৮. *তদেব, সায়ণভাষ্য*

১৯. *ভারতীয় দর্শন কোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭

২০. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্,* ৪|৬

২১. *সাহিত্য মীমাংসা*, পৃ. ৮

২২. *তদেব*, পৃ. ৮

২৩. *তদেব*, পৃ. ৯

২৪. *ধ্বন্যালোক*, তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃ. ২৩৭

২৫. *মেঘদূতম্*, অভিভাষণ, পৃ. ৯

২৬. *ভাষাপরিচ্ছেদ*, কারিকা নং ১

২৭. *সাহিত্য মীমাংসা*, পৃ. ৫

২৮. *তদেব*, পৃ. ৬

২৯. *বক্রোক্তিজীবিত*, কারিকা ৩৪-৩৬ এর বৃত্তি

৩০. *কাব্যালংকার*, ১.২

৩১. *মাণবকগৌরবম্*, প্রথমাঙ্ক, পৃ. ৩

৩২. *বেদান্তসার*, সাধনচতুষ্টয় পৃ. ৪৭

৩৩. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৪.৩৯

৩৪. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১৭.২৮

৩৫. *মাণবকগৌরবম্*, তৃতীয়াঙ্ক, পৃ. ৪৩

৩৬. *তদেব*, সপ্তমাঙ্ক, পৃ. ৮৭

৩৭. *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্*, শীক্ষাবল্লী, একাদশ অনুবাক

৩৮. তত্রৈব

৩৯. *মাণবকগৌরবম্*, চতুর্থাঙ্ক, পৃ. ৬১

৪০. *কঠোপনিষদ্*, ১.৩.১৪

৪১. *মাণবকগৌরবম্*, প্রথমাঙ্ক, পৃ. ৯

৪২. *তদেব*, তৃতীয়াঙ্ক, পৃ. ৩৯

৪৩. *সাংখ্যকারিকা*, কারিকা নং ১

৪৪. *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* টীকা, পৃ. ২

৪৫. *প্রশান্তরত্নাকরম্*, প্রথমাঙ্ক, পৃ. ৩

৪৬. *তদেব*, পৃ. ৪

৪৭. *মহাভারত* ১.২.৩৯০

৪৮. *ঈশোপনিষদ্*, মন্ত্র ২

৪৯. *গীতা* ৫.১০

৫০. *সত্যানুভাবম্*, ষষ্ঠ সর্গ, শ্লোক নং ২৩-২৫

৫১. *তদেব*, শ্লোক নং ২৬

৫২. *সত্যানুভাবম্*, দ্বিতীয় সর্গ, শ্লোক নং ১

৫৩. *তদেব*, দ্বিতীয় সর্গ, শ্লোক নং ৩৫

৫৪. *তদেব*, ২৪.১২৬

৫৫. *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*, কারিকা ৩ প্রসঙ্গে

৫৬. *ভাষাপরিচ্ছেদ*, সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৩৬

৫৭. *আলোকতিমিরবৈরম্*, তিমিরং প্রতি আলোকঃ, শ্লোক নং ৯-১০

৫৮. *তদেব*, শ্লোক নং ১২-১৩

৫৯. তত্রৈব

৬০. *আলোকতিমিরবৈরম্*, আলোকং প্রতি তিমিরোত্তরম্, শ্লোক নং ৪০, ৪২

৬১. *তদেব*, শ্লোক নং ৮৪, ৮৬

৬২. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, ৪.৫.৬

৬৩. *প্রবচনত্রয়ী*, মঙ্গলাচরণ শ্লোক

৬৪. *কাব্যাদর্শ* ১.৪

৬৫. *তদেব*, ১.৩

৬৬. *তর্কপরিভাষা*, মঙ্গলাচরণশ্লোক, পৃ. ৫৭

৬৭. *তদেব*, পৃ. ৫৮

৬৮. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা*, খণ্ড. ৯২, পৃ. ৫৮

৬৯. *তত্রৈব*

পঞ্চম অধ্যায়

তর্কাচার্য মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি ও তার অনন্যতা

মহামহোপাধ্যায় কাশ্যপকবি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সারস্বত অবদানে উক্ত অধ্যায়ে তাঁর নির্বাচিত সাহিত্যকৃতিগুলির মধ্যে স্বকীয়তা, অনন্যতা, প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক আলোচনা এবং সর্বোপরি বিদ্বত্-সমাজের কাছে তাঁর সৃষ্টির উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করা হবে। মূলত তাঁর সারস্বতকৃতিতে উল্লেখযোগ্য অনন্যতা হল তর্কশাস্ত্র ও কাব্যে সমান পারদর্শিতা। তাঁকে কবি-তার্কিক বলা যায়। দুর্গম তর্কশাস্ত্রে অবাধ প্রবেশ অন্যদিকে কাব্যসংসারে রসজ্ঞ আবেদন – এই দুটি ধারার সমন্বয় বিদ্বানগণের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এক জ্ঞানসাধক। আলংকারিক রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে প্রতিভার দ্বিবিধ ভাগ করেছেন- কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী। এই কারয়িত্রী প্রতিভা আবার ত্রিবিধ যথা সহজা, আহার্যা ও ঔপদেশিকী, জন্মান্তরের সংস্কারের ফলে উৎপন্ন প্রতিভা হল সহজা। ইহ জন্মের সংস্কারের ফলে উৎপন্ন বুদ্ধি হল আহার্যা ও মন্ত্রতন্ত্র উপদেশের ফলে উৎপন্ন বুদ্ধি হল ঔপদেশিকী। *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

‘সা চ দ্বিধা কারয়িত্রী ভাবয়িত্রী চ। কবেরুপকুর্বাণা কারয়িত্রী। সাঽপি ত্রিবিধা সহজা-আহার্যৌপদেশিকী চ। জন্মান্তরসংস্কারাপেক্ষিনী সহজা। ইহ জন্মসংস্কার যোনিরাহার্যা..’।[১]

তর্কাচার্য মহাশয় ‘কারয়িত্রী’ ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার অধিকারী, যা তাঁর কৃতিগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। কারণ কারয়িত্রী প্রতিভা কাব্যোৎপত্তির কারণ, ভাবয়িত্রী

প্রতিভা কাব্য সমালোচনার কারণ। একটির উদ্ভব প্রতিভা থেকে এবং অপরটির উদ্ভব প্রজ্ঞা থেকে। এই প্রতিভাবলে আচার্য মহাশয়ের চরিত্রের ঔদার্য ও প্রজ্ঞার দীপ্তির সমন্বয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন দর্শনশাস্ত্রবেত্তা টীকাকার (*মুক্তিদীপিকা* ও *সূক্তিদীপিকা* ইত্যাদি) মৌলিক কাব্য প্রণেতা (*সত্যানুভাবম্, মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*) কাব্যতত্ত্বজ্ঞ সমালোচক (*কাব্যচিন্তা* সমালোচকগ্রন্থ) ব্যাখ্যাকার (*সুপ্রভা* ব্যাখ্যাগ্রন্থ) গ্রন্থ-সম্পাদক (*দশকুমারচরিত, মেঘদূত, সাংখ্যকারিকা* ইত্যাদি) প্রথিতযশা অধ্যাপক (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ ও সংস্কৃত কলেজ), পত্রিকা সম্পাদক (*সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা, সংস্কৃত-পদ্যবাণী*), নাট্যাচার্য (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্), নাট্যাভিনেতা (*অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকে দুষ্যন্ত, *মৃচ্ছকটিকে* চারুদত্ত, *মধ্যমব্যায়োগে* ভীম), অনুবাদক (*গীতাঞ্জলি, শ্রীশ্রীচণ্ডী*), ভক্তিপরায়ণ (আদ্যাপীঠ মায়ের ধ্যানমন্ত্র রচনা এবং শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের পরম মিত্র), সুবক্তা সর্বোপরি উদারচেতা ছাত্রদরদী প্রভৃতি অজস্র বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। তর্কাচার্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের কথা বলতে গিয়ে পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় বলেছেন-

তর্কাচার্যপদাদ্ বিতর্করহিতং যন্নাম সঙ্কীর্ত্ত্যতে
মর্ত্ত্যে যশ্চ গুরুর্বুধঃ কবিরপি ভ্রাজিষ্ণুকীর্ত্তিঃ সদা।
ওজস্বিপ্রিয়ভাষণৈর্জিতচতুর্বক্ত্রোঽপি রক্তো নৃণা-
মেকচ্ছত্রনৃপোপমোঽরমত যঃ ক্বাসৌ গতোঽতর্কিতঃ।।
নানানাট্যনিবন্ধবন্ধন-মহাকাব্যাদিসংগ্রন্থনে
বশ্যা স্ত্রীব সদানুবর্ত্তনপরা যস্যাভবল্লেখনী।
আবাল্যং প্রলয়াবধির্নিরবধি স্থিত্বা চিরং সঙ্গিনী
সাধ্বী তেন সমং গতা সহমৃতা নান্যং বরীতুং ক্ষমা।।[২]

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অতি সাধারণ, কোন আড়ম্বর ছিল না। অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য* প্রবন্ধে বলেছেন-

'ব্যক্তিজীবনে ইনি নিরলস, কঠোর পরিশ্রমী, সদাপ্রফুল্ল, সর্বজনহিতৈষী এবং অজাতশত্রু ছিলেন। দেবব্রাহ্মণে এবং পিতা মাতা ও গুরুর প্রতি তার ভক্তি আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার পোশাক ছিল সাদা ধুতি চাদর এবং তালতলার চটি। শীতকালে সুতি চাদরের স্থান লইত একখানি গরম চাদর।[৩]

নিম্নলিখিত আলোচনায় তর্কাচার্য মহাশয়ের সকল সারস্বতকৃতিগুলির মহত্ত্ব ও স্বকীয়তা, বিচার করা হয়েছে-

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তর্কাচার্য মহাশয়ের অনন্যতা

সূক্তিদীপিকা উপটীকার মৌলিক বিষয় :-

তর্কাচার্য মহাশয় যেমন মূল গ্রন্থের উপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকাগ্রন্থ রচনা করেছেন তেমনি টীকাগ্রন্থের উপর টীকা অর্থাত্ উপটীকা রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় *সূক্তিদীপিকা* গ্রন্থ প্রণয়ন। কারণ প্রশস্তপাদাচার্যের *প্রশস্তপাদভাষ্যের* উপর জগদীশ তর্কালংকার *সূক্তি* টীকা রচনা করেন, এই *সূক্তি* টীকার উপর কালীপদ তর্কাচার্য *সূক্তিদীপিকা* উপটীকা রচনা করেন। *সূক্তি* টীকার আশ্রয়ে তর্কাচার্য মহাশয় সর্বপ্রথম কোন উপটীকা গ্রন্থ রচনা করেন, সেদিক থেকে এই উপটীকার বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জগদীশ তর্কালংকারের *সূক্তি* টীকার স্পষ্টার্থের জন্য।

তর্কাচার্য মহাশয় সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই গ্রন্থটিকে *প্রশস্তপাদভাষ্য* বলে দাবী করেছেন, যেখানে অন্যান্য সম্পাদকগণ এটিকে ভাষ্যগ্রন্থ্ বলতে রাজী নন। কারণ হিসেবে অন্যেরা বলেছেন ভাষ্যের লক্ষণানুসারে এই গ্রন্থটি সূত্রানুসারী ব্যাখ্যাগ্রন্থ্ নয়। কিন্তু আচার্যদেব যুক্তিসঙ্গত বহুবিধ হেতু প্রদর্শন করে গ্রন্থটিকে ভাষ্য বলে সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। *সূক্তিদীপিকা* টীকাগ্রন্থের আলোচনার প্রারম্ভেই কালীপদ তর্কাচার্য বলেছেন-

'অত্র ভাষ্যশব্দো ন পারিভাষিকার্থকঃ প্রকৃতে 'সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ'। ইতি তল্লক্ষণাননুগমাত্, কিন্তু যৌগিক এব। ইত্থঞ্চ পদার্থধর্মসংগ্রহগ্রন্থস্য প্রকর্ষকথনাবসরে 'বৈশদ্যং লঘুত্বং কৃত্স্নত্বঞ্চ প্রকর্ষঃ। সূত্রেষু বৈশদ্যাভাবাত্ ভাষ্যস্য চ বিস্তরত্বাত্ প্রকরণাদীনাঞ্চ একদেশত্বাত্ ইতি কিরণাবল্যামাচার্য্যবচনমপি সঙ্গচ্ছতে। পরে কথঞ্চিদেব ভাষ্যলক্ষণং যোজয়ন্তি'।[৪]

এই গ্রন্থের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- প্রশস্তপাদভাষ্যের মূল যে বৈশেষিক সূত্রাশ্রয়ে প্রণীত হয়েছে তা তিনি নির্দেশ করেছেন, যা কিনা অন্য গ্রন্থে বিরল। যেমন 'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষ....' ইত্যাদি ভাষ্যটি 'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ'[৫] এই সূত্রাশ্রয়ে রচিত হয়েছে। অর্থাত্ সূত্রাশ্রয়ে ভাষ্য নিরূপণ আচার্য মহাশয়ের মৌলিক কৃতিত্ব।

প্রথমে 'বৈশেষিকদর্শনস্য সপ্তপদার্থপরত্বম্' এই অংশে তিনি বৈশেষিকদর্শন সপ্তপদার্থবাদী এই সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেছেন। সাংখ্যসূত্রাদির বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেছেন অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের দ্বারা বলা যায় বৈশেষিক দর্শন হল সপ্তপদার্থবাদী, কারণ পরবর্তিকালে বৈশেষিক দর্শনের টীকাগ্রন্থ *কিরণাবলী* ইত্যাদিতে সপ্তপদার্থের কথা বলা হয়েছে। এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে তর্কাচার্য মহাশয় উদয়নাচার্যের *কিরণাবলী,*

শ্রীধরাচার্যের *ন্যায়কন্দলী,* প্রভৃতি টীকার সমর্থন বিবৃত করেছেন। সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের *কণাদসূত্রের* উপর *কণাদসূত্রবিবৃতি,* বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতী* গ্রন্থের এই সপ্তপদার্থত্ব বিষয়ে যে পাঠ তার অবতারণা করেছেন। আচার্য মহাশয় বলেছেন-

'বিদিতমেবেদং ভারতীয়দার্শনিকানাম্ যথা ষট্সু প্রথিতাস্তিকদর্শনেষু বৈশেষিকমেকতমং পদার্থতত্ত্বনির্ণয়প্রধানং দর্শনমিতি। তত্র মুখ্যতয়া প্রতিপাদিতাঃ ষট্ পদার্থা দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ, ত এব গৌণতয়াঽভাবস্যাপি অভ্যুপগমেনাভাবসপ্তমাঃ।..... 'ন বয়ং ষট্-পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিতি সাংখ্যসূত্রাদিভিরপি কণাদতচ্ছিষ্যপ্রশিষ্যাদীনাং ষট্-পদার্থবাদিত্বস্য বিশেষতঃ সমুল্লেখাত্, 'ধর্ম ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্-পদার্থোপবর্ণনম্। সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্-গমনোপমম্। ইতি ষট্-পদার্থবাদিতয়া সমুল্লিখৈব বৈশেষিকদর্শনকারাণামধি-ক্ষেপোপক্ষেপাদন্যথা চ বৈশেষিকদর্শনসিদ্ধাঃ ষড়েব পদার্থাঃ প্রসিধ্যন্তি, নাভাবসপ্তমা ইতি শঙ্কনীয়ম্, শ্রীভগবদুদয়নাচার্য্যাদিভিরেতচ্ছঙ্কায়াঃ সুসমাধানাত্'।[৬]

প্রশস্তপাদভাষ্যস্য বিশেষতঃ প্রামাণ্যম্, 'প্রস্তুতভাষ্যস্য প্রশস্তপাদভাষ্যযুক্তিঃ' প্রশস্তপাদস্য নামবিচারঃ, প্রশস্তপাদস্য কালঃ, প্রশস্তপাদগ্রন্থস্য ভাষ্যত্ববিচারঃ, - এইসকল নামে তর্কাচার্য মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের অন্যতম গ্রন্থ প্রশস্তপাদভাষ্যের বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেখানে এই গ্রন্থের ভাষ্যত্ব স্থাপনের যুক্তি, গ্রন্থের নামবিচার, সময়কালও বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে *প্রশস্তপাদভাষ্য* এই নামের উল্লেখ (কারণ অনেক আচার্যগণ এই গ্রন্থ *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন) প্রভৃতি বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে। এই গ্রন্থের সময়কাল সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী বলা হয়েছে কারণ শঙ্করাচার্যের লেখনশৈলীর থেকে এই

গ্রন্থের শৈলী প্রাচীন। এ ছাড়া উদয়নাচার্যের *কিরণাবলী* টীকাগ্রন্থ থেকে *প্রশস্তপাদভাষ্য* গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা অনেক পূর্বে। তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

'খ্রিস্টীয় সপ্তম-শতাব্দ্যাং বর্ধমানস্য উদ্দ্যোতকরস্য গ্রন্থে প্রশস্তপাদস্য নামোল্লেখো বর্ত্ততে, ততস্তস্মাদয়ং প্রাচীন ইতি স্থিতে খৃষ্টসপ্তমশতাব্দোপূর্বকালস্তৎকাল আয়াতি। শঙ্কারাচার্যলেখদর্শনেন ততোঽপ্যয়ং প্রাচীন আভাতি। উদয়নকৃতকিরণাবলীদর্শনাত্ প্রশস্তপাদস্য তদপেক্ষয়া বহোঃ কালাত্ পূর্বতঃ সুপ্রতিষ্ঠা প্রতীয়তে'।[৭]

সূক্তিদীপিকা উপটীকায় জগদীশের *সূক্তি* টীকা ব্যাখ্যা করা হলেও প্রশস্তপাদাচার্যের অন্যান্য টীকাকারদের মতের পর্যালোচনা করেছেন, যেমন *কিরণাবলী* ও *ন্যায়কন্দলী* ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্রপরম্পরা এই টীকার পরিলক্ষিত হয়।

*সূক্তি*টীকায় 'ঈশ্বরনোদনতয়া বেদেনাভিব্যক্তাত্' বললেও মূল শ্রুতিবচনের কথা উল্লেখ করেনি, কিন্তু তর্কাচার্য মহাশয় পাঠকদের বোধার্থে উপটীকায় সেই শ্রুতিবচনের উল্লেখ করে মূলকে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

'ঈশ্বরনোদনয়েতি- 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদিনা শ্রুতিবাক্যেন ইত্যর্থঃ'। ন্যায়কন্দলীকৃতস্তু ঈশ্বরনোদনা ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষঃ তদভিব্যক্তাত্ ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষেণ কার্যারম্ভাভিমুখীকৃতাত্ ধর্মাদিত্যর্থং ব্যাচক্ষতে। তথাহি ধর্মস্যাপি ন তাবত্ নিঃশ্রেয়সোপধানং, যাবদীশ্বরেচ্ছয়া নানুগ্রহ ইতি ভাবঃ।[৮]

রত্নলক্ষ্মী টীকাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য:-

কণাদ তর্কবাগীশ বিরচিত এই *ভাষারত্ন* গ্রন্থটি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় প্রথম পুঁথি থেকে সম্পাদনা করেন বলে জানা যায়, *ভাষারত্নের* উপর স্বকীয় *রত্নলক্ষ্মী* টীকাগ্রন্থটি

একমাত্র টীকা। এর পূর্বে এই গ্রন্থের ছাপা পুস্তক ছিল না। তিনটি হস্তলিখিত পুঁথি থেকে এই গ্রন্থের সম্পাদনা করা হয়েছে। তার মধ্যে দুটি পুঁথি কলকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে লব্ধ, অপরটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে উপলব্ধ বলে জানা যায়। প্রথম দুটি বঙ্গাক্ষরে এবং দ্বিতীয়টি দেবনাগরী অক্ষরে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থ দুটি ছিল সম্পূর্ণ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই তিনটি গ্রন্থ পর্যালোচনা করে টীকাটি প্রণয়ন করেছেন আচার্য মহাশয়। তিনটি মূল গ্রন্থের যে বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায় সেই পাঠগুলি পাদটীকা হিসেবে এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে বলে তর্কাচার্য মহাশয় উল্লেখ করেছেন গ্রন্থ ভূমিকার অন্তিমাংশে-

'অস্য গ্রন্থস্য সম্পাদনাবসরে ত্রীণি হস্তলিখিতপুস্তকানি ময়া লব্ধানি। ...ত্রয়াণাং লিপিগ্রন্থানাং পাঠং বিচার্যঃ য এব সমীচীনতয়া অবধারিতঃ, স এব মূলপাঠরূপেণ ইতরশ্চ পাঠটীকারূপেণ সন্নিবেশিতঃ'।[৯]

টীকার বৈশিষ্ট্যানুসারে *রত্নলক্ষ্মী* যথার্থ টীকাগ্রন্থ। এখানে *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের যথাসম্ভব অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। রাজশেখর তার *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে বলেছেন-

'অবান্তরার্থবিচ্ছেদশ্চ সা। যথাসম্ভবমর্থস্য টীকনং টীকা'।[১০]

অর্থাত্ সূত্র, বৃত্তি, পদ্ধতি ও সমীক্ষার মধ্যদিয়ে মিলিতভাবে যতটা অর্থের সূচনা ঘটে, সেই সমস্ত অর্থের যথাসম্ভব টীকন বা উল্লেখ হল টীকা।

ভাষারত্ন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি পর্যালোচনা করলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে, মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি হল- 'ওম্ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণো নমঃ'। এই মঙ্গলশ্লোকের 'ওম্' এই

অংশের ব্যাখ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য যথাসম্ভব অর্থপ্রকাশের জন্য তিনটি মতের উল্লেখ করেছেন-

প্রথমত, ওম্ শব্দটি পরমাত্মাপরপর্যায়ব্রহ্মবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে –'ওম্ তত্ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতং ইতি শাস্ত্রাত্ ওম্-শব্দস্য পরমাত্মাপরপর্যায়ব্রহ্মবাচকতয়া পরমাত্মন ইত্যর্থঃ'।

দ্বিতীয়ত, 'ওম্' শব্দের দ্বারা এখানে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করেছেন, কারণ শব্দটি মঙ্গলসাধক- 'ওমিত্যাদিনা প্রতিপাদিতো নমস্কারশ্চ মঙ্গলাচরণলক্ষণঃ। ওমিতিপদস্য প্রারম্ভে সন্নিবেশোঽপি মঙ্গলসাধক এবেতি মন্তব্যম্'যদুক্তম্-

ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।।[১১]

তৃতীয়ত, পতঞ্জলি যোগদর্শনানুসারে ওম্ হল প্রণব মন্ত্রের বাচক- 'ওমিত্যস্য পরমেশ্বরবাচকত্বমাহ পতঞ্জলিঃ, 'তস্য বাচকঃ প্রণব' ইতি সূত্রেণ। প্রণবাত্মকস্য চ ওম্-পদস্য বিগ্রহদৃষ্ট্যা-অকারো-কার-মকার-স্বরূপতাবভাসেন-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-স্বরূপাভিন্ন-পরমাত্ম-প্রতিপাদকত্বম্'।[১২]

সুতরাং এইভাবে টীকাতে যথাসম্ভব অর্থের ব্যাখ্যায় এক অনবদ্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তর্কাচার্য মহাশয়।

সাংখ্যদর্শনে আচার্য মহাশয়ের অবদান

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় মূলত *ন্যায়-বৈশেষিক* দর্শনের ছাত্র হলেও তিনি *সাংখ্যদর্শনের* আলোচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি *সাংখ্যদর্শনের* দুটি গ্রন্থ

টীকাসহ রচনা করে সম্পাদনা করেন, গ্রন্থদুটি *সাংখ্যসার*—সাংখ্যের প্রকরণ গ্রন্থ ও *সাংখ্যকারিকা*। *সাংখ্যসার* গ্রন্থটি তর্কাচার্য মহোদয় সম্পাদিত ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রপুস্তকালয়, বাগবাজার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ।

সাংখ্যকারিকা গ্রন্থটি তর্কাচার্য মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রের *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* ও গৌড়পাদাচার্যের *গৌড়পাদভাষ্য* এবং আচার্যদেবের *ভাষ্যপ্রভা* পাদটীকা সহ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিশেষত হল-

প্রথমত গৌড়পাদাচার্যের সমগ্র ভাষ্যের এখানে সরল বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে, যা অন্যান্য সম্পাদনাকৃত গ্রন্থে দেখা যায় না। ভূমিকাংশে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন- 'নাদ্য যাবত্‌ ঈদৃশস্য সভাষ্যং সাংখ্যকারিকাগ্রন্থস্য সমীচীনং সংস্করণং প্রকাশিতং কেনাপি'। *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটির অধিকাংশ সম্পাদক বাচস্পতি মিশ্রের *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* সহ আলোচনা করেছেন, এমন কিছু উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা হল- পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কারত্নকৃত *তত্ত্বকৌমুদী* টীকার উপর *পূর্ণিমা* টীকাসহ সম্পাদনা, অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামীকৃত *তত্ত্বকৌমুদী* টীকার উপর বঙ্গভাষায় অধ্যাপনাসহ সম্পাদনা ইত্যাদি। কেবলমাত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রদ্বয় আশুবোধ বিদ্যাভূষণ ও নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন ১৯২৯ সালে *গৌড়পাদভাষ্য*সহ সম্পাদনা করেন, কিন্তু কোন অনুবাদ বা ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে নেই। সেদিক থেকে কালীপদ তর্কাচার্যের *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটি অভিনবত্বের দাবী রাখে।

এই ভাষ্যটি বেশ প্রাচীন ও *সাংখ্যকারিকার* যথাযথ ব্যাখ্যা গ্রন্থ। গৌড়পাদাচার্যের সময়কাল পঞ্চম শতাব্দী, কারণ শঙ্করাচার্যের গুরুদেব হলেন গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু হলেন এই গৌড়পাদাচার্য। গ্রন্থটি একটি যথাযথক্রমে আলোচিত হয়েছে- গ্রন্থ আলোচনার ক্রমটি হল- বিস্তৃত ভূমিকা – *সাংখ্যকারিকা* – *গৌড়পাদভাষ্য* –

*সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*টীকা – *সাংখ্যকারিকার* বঙ্গানুবাদ – *গৌড়পাদভাষ্যের* বঙ্গানুবাদ – তর্কাচার্য-কৃত অতি সংক্ষিপ্ত *ভাষ্যপ্রভা* নামক পাদটীকা।

দ্বিতীয়ত এই গ্রন্থের আলোচনায় যথাসম্ভব সহজবোধ্য পর্যালোচনা প্রতিপাদিত হয়েছে। কারণ এটি ছাত্রপাঠ্যের উপযোগী করে সম্পাদনা করা হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন –

'তত্র গৌড়পাদাচার্যকৃতভাষ্যং কারিকাসহিতং সাংখ্যশাস্ত্রীয়প্রথমপরীক্ষায়াং নির্দিষ্টং পাঠ্যরূপেণ বর্ত্ততে। পরং গৌড়পাদভাষ্যস্য বহুষু স্থলেষু দুরববোধতয়া তেন বিদ্যার্থিতানাং জিজ্ঞাসূনামপরেষাঞ্চ সাংখ্যতত্ত্বাববোধো নৈব সম্যকতয়া সম্পদ্যতে, অত এবাস্মাভিঃ গৌড়পাদভাষ্যস্য ভাষ্যপ্রভাখ্যটীকয়া কারিকায়া বঙ্গভাষানুবাদেন চ সমলঙ্কৃত্য সাংখ্যকারিকা সম্পাদিতা প্রকাশিতা চ'।[১৩]

তৃতীয়ত তর্কাচার্য সম্পাদনাকৃত গ্রন্থের ভূমিকা অংশে আচার্যদেব ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনে সাম্য ও বৈষম্য নাম দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন। উভয় দর্শনের সাম্য তিনটি ক্ষেত্রে বলেছেন- ১. উভয়েই জগতের সত্যতা স্বীকার করেন, ২. উভয়মতেই দেহভেদে জীব ভিন্ন ভিন্ন ৩. উভয়মতেই পরমপুরুষার্থ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এবার উভয়দর্শনের বৈষম্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- ১. ন্যায়মতে অসৎকার্যবাদ স্বীকৃত কিন্তু সাংখ্যমতে সৎকার্যবাদ স্বীকৃত। ২. ন্যায়মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন ছয়টি ইন্দ্রিয়, সাংখ্যমতে কর্মেন্দ্রিয়+জ্ঞানেন্দ্রিয়+মন=১১ ইন্দ্রিয় স্বীকৃত। ৩. ন্যায়মতে ভ্রমস্থলে অন্যথাখ্যাতিস্বীকৃত, সাংখ্য স্বীকার করেন অখ্যাতি। ৪. ন্যায়ে মন হল নিত্য, সাংখ্যমতে মন হল অনিত্য।

অন্যদিকে *সাংখ্যসার* গ্রন্থের উপর যে *সারপ্রভা* টীকা তর্কাচার্য মহাশয় প্রণয়ন করেন, তা অনবদ্য। বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত *সাংখ্যসার* গ্রন্থের পংক্তি ধরে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তবে তা সহজবোধ্যভাবে বিদ্যার্থীদের উপযোগি করে। *সারপ্রভা* টীকার প্রারম্ভে কাশ্যপকবি বলেছেন-

.... তনোতি টীকামিহ সাংখ্যসারে

সারপ্রভাং বালজনোপযোগ্যাম্।[১৪]

অর্থাত্ *সাংখ্যসার* গ্রন্থের উপর রচিত *সারপ্রভা* টীকা বালকদের উপযোগি করে প্রণয়ন করছি।

গ্রন্থ আলোচনার ক্রমটি হল- বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত মূল *সাংখ্যসার*- তর্কাচার্যকৃত *সারপ্রভা*-টীকা-মূল সাংখ্যসারের বঙ্গানুবাদ। মূলত *সারপ্রভা* টীকা স্পষ্টার্থ প্রতিপাদন করা হয়েছে, উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যায়- মূল *সাংখ্যসারের* কারিকা হল-

সাংখ্যকারিকয়া লেশাদাত্মতত্ত্বং বিবেচিতম্।

সাংখ্যসারবিবেকোঽতো বিজ্ঞানেন প্রপঞ্চ্যতে।।[১৫]

এই শ্লোকের অনুবাদ তর্কাচার্য মহাশয় করলেন- ভগবান ঈশ্বরকৃষ্ণ *সাংখ্যকারিকা* দ্বারা সংক্ষিপ্তরূপে আত্মতত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন, এইজন্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যশাস্ত্রীয় সারভাগ বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন।

স্বকীয় *সারপ্রভা* টীকাগ্রন্থে তর্কাচার্য মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বললেন –

'ননু ভবতা নিরর্থকং এবায়ং সাংখ্যসারগ্রন্থঃ শ্রীমদীশ্বরকৃষ্ণপ্রণীতয়া সাংখ্যকারিকয়ৈব গতার্থত্বাত্, অতঃ কিমিতি তন্নির্বিঘ্নপরিসমাপ্ত্যদ্যর্থং মঙ্গলাচরণমনুষ্ঠীয়ত ইত্যাশঙ্কামপাকর্ত্তুমাত্মনো গ্রন্থস্য সাংখ্যকারিকয়া গতার্থত্বং প্রতিষেধতি

সাংখ্যকারিকয়েত্যাদিনা। সাংখ্যকারিকয়া সাংখ্যকারিকাখ্যগ্রন্থেন ঈশ্বরকৃষ্ণপ্রণীতেনেত্যঃ। লেশাত্ সংক্ষেপতঃ তদীয়মংশবিশেষমাশ্রিত্য ইত্যর্থঃ।[১৬]

কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যকৃতির স্বকীয়তা

মহাকাব্য:- কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় *সত্যানুভাবম্* ও *যোগিভক্তচরিতম্* নামক দুটি মহাকাব্য রচনা করেন এর মধ্যে *সত্যানুভাবম্* মহাকাব্যটি পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হলেও *যোগিভক্তচরিতম্* হল তৎকালীন বর্তমান সমস্যা নিয়ে এই মহাকাব্যের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। আসলে হিন্দুসমাজের নবজাগরণের জন্য এই মহাকাব্যটি তর্কাচার্য মহাশয় রচনা করেন। ইতিহাসের তথ্য অনুধাবন করলে বোঝা যায় যুগে যুগে সনাতনধর্মী মানুষের প্রতি অবিচার নেমে এসেছে বিধর্মী আক্রমণের ফলে, তাই এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ যুবসমাজ, সেই যুবসমাজ গঠনের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ এক শ্রেণীর দেশপ্রেমিক বীর সন্ন্যাসী অগ্রসর হন, স্বামী বিবেকানন্দ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনই একজন হলেন যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ। তর্কাচার্য মহাশয়ের অনুধাবনে সনাতনধর্মের চেতনাবোধ ও দেশপ্রেম এই কাব্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যুগাচার্যের জীবনদর্শন বর্ণনায়।

বিংশসর্গাত্মক মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও কর্মসাধনা নিয়ে কাশ্যপকবি উক্ত মহাকাব্যটি রচনা করেন। এই মহাকাব্যে নগেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিকচর্চা প্রতিপাদিত হয়েছে। মহর্ষির ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন, যোগসাধনা, সমাজসেবা ও দরিদ্র আর্তের সেবা প্রভৃতি বর্তমান সমাজে বিবেকচেতনার মর্মবোধের দর্শন বলা যায়। শঙ্করাচার্য যেমন তার অদ্বৈতবাদের বিচার দিয়ে সমস্ত মতবাদকে পরাস্ত করে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করে,

ঠিক তেমনি পরমঠাকুর নগেন্দ্রনাথ নিজ জীবনদর্শন দিয়ে সনাতনধর্মকে রক্ষা করেছেন। চতুর্থাঙ্কে বলা হয়েছে-

বিরুদ্ধমতসংঘাতং বারয়ন্ দদৃমে ক্বচিত্।

বৌদ্ধসিদ্ধান্তনির্হন্তা ভগবান্ শঙ্করো যথা।[১৭]

অধ্যাত্মচেনার বিকাশ :- কাশ্যপকবির এই মহাকাব্যে যোগদর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নগেন্দ্রনাথের জীবনচর্চা ও অধ্যাত্মসাধনায় পাতঞ্জল দর্শন যেন অঙ্গীভূত হয়ে আছে। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' এই মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নগেন্দ্রনাথ কর্মজীবনের এত অধিক ব্যাপ্তি। তাঁর বাল্যজীবন কঠোর যোগসাধনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, চিত্তবৃত্তির নিরোধে তিনি সদাচেষ্ট ছিলেন। যোগদর্শনে বলা হয়েছে- 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।[১৮] *যোগদর্শনের* অষ্টাঙ্গ যোগ- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এইগুলি যথাযথ অভ্যাসে তিনি অধ্যাত্মজীবনে উন্নীত হন। বাল্যজীবনের যোগসাধনার কথা বলতে গিয়ে দ্বিতীয়সর্গে বলা হয়েছে-

ন ক্রীড়নে প্রাপ রতিং বয়স্যৈঃ স নির্জনস্থানগতঃ প্রশান্তঃ।

তাতস্য সাম্যেন নিমীলিতাক্ষঃ কস্যাপি চিন্তানিরতো বভূব।।[১৯]

নগেন্দ্রনাথের জীবনে যোগের উপযোগিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

তস্মিন্ কালে পূর্বসংস্কারযোগাত্ প্রাণায়ামে কামনামেষ বব্রে।

তীব্রোত্সাহং স ব্রতং সাধয়িত্বা দীর্ঘং কালং সিদ্ধিমাদ্যাং প্রপেদে।।

কশ্চিত্ কালং কুর্বতো যোগকৃত্যং শূন্যে তস্যাবস্থিতিঃ সুস্থিরাভূত্।

যোগাচারে নিত্যমিত্থং স্থিতস্য সিদ্ধিঃ শুদ্ধা ভূয়সী তস্য জজ্ঞে।।[২০]

দৃশ্যকাব্য:- তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রত্যেক সাহিত্যকর্মে প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। সমাজের বাস্তব সমস্যা ও তার সমাধানে তিনি সাহিত্যরচনার মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন, নাটকের প্রতিটি ধারায় তিনি ছিলেন অধিক সাবলীল। ১৯৫৮ সালে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে *মাণবকগৌরবম্* নাটকটি প্রকাশিত হয়। মূলত ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও পরবর্তিকালের বেশ কিছু সময় এক অস্থির পরিস্থিতি সমাজে দেখা যায়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার নিজ ছন্দে ফিরে আসতে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়, এই অশান্ত পরিস্থিতির প্রভাব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা ও প্রাচীন চতুষ্পাঠী শিক্ষার একে অন্যের বিরোধী হয়ে ওঠে। এই সময় গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের বিশেষ অবনতি ঘটে, যা কালীপদকে বেদনাহত করে। এমন পরিস্থিতিতে তর্কাচার্য মহাশয় মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনী নিয়ে সৃষ্টি করলেন একটি আধুনিক সংস্কৃত নাটক *মাণবকগৌরবম্*।

রচনাশৈলীর স্বকীয়তা:- উক্ত নাটকের রচনাশৈলীতে সর্বত্র গুরুভক্তির প্রতিচ্ছবি। অলংকার, ছন্দ ও চরিত্রের অসাধারণ সংলাপ নাটকটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। অপূর্ব শব্দবিন্যাস যা নাটকটিকে আলাদা মর্যাদায় উন্নীত করেছে। নাট্যগীতের সমাবেশে নাটকের বিষয়বস্তুটি পাঠকসমাজের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয়ের বিরল কৃতি হল নাট্যগীত রচনা, এখানে গুরুবন্দনা পরিস্ফুট-

অভয়া গুরুপদসেবা

যো গুরুমঞ্চতি কুশলং স ভজতি

তস্য হি তুষ্টা দেবাঃ।

... ভক্ত! সমেহি মদঙ্কম্,

ক্ষালয় মানসপঙ্কম্,

ভজ গুরুমিহ নিঃশঙ্কম্

ভুবি তব চিন্তা কা বা ?[২১]

মহাভারতের প্রচলিত কাহিনী কাশ্যপকবির লেখনশৈলীতে হয়েছে প্রাণবন্ত। নাটকটিতে মূলত গুরুভক্তির পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাত্ গুরু ধৌম্য ও শিষ্যদের কাহিনী এই নাটকের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। আসলে পঞ্চাশের দশকে গুরু ও শিষ্যের শ্রদ্ধার সম্পর্কের অবনমন ঘটতে থাকে। ছাত্রের শৃঙ্খলার অভাব, গুরুর প্রতি বিনয়ের অভাব কালীপদ তর্কাচার্যকে দগ্ধ করেছিল, তাই জন্য এই *মাণবকগৌরবম্* নাটকের আবির্ভাব। নাট্যগ্রন্থের 'মাণবক-গৌরব' ভূমিকা অংশে তর্কাচার্য মহাশয়ের সুহৃদবর স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী বলেছেন-

'গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যেত্যাদি প্রবচনানুসারিণী নীতির্ভারতবর্ষে মন্বাদিস্মৃতিবোধিতস্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমরূপস্য গুরুকুলবাসস্য সর্বথা সাহায়কং বিদধানা শশ্বদবাধেন প্রবৃত্তা বভূবেত্য-বিসংবাদম্। কলিযুগ-প্রভাবাত্ততো বৈদেশিকবণিগ্-জাতীয়সাম্রাজ্যপারতন্ত্র্যাচ্চ নীতিরাশ্রম-ব্যবস্থা চ সুচিরং হতাদরতয়া শনৈঃ শনৈঃ ক্ষীণপ্রায়ে অপি ক্বচিদ্দৃষ্টিপথং কদাচিদ্বা শ্রুতিপথমস্মাকং সমায়াতে'।[২২]

পুরাণশাস্ত্রে আচার্য প্রতিভা

১৩৭৩ বঙ্গাব্দে (১৯৬৬ সাল) শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত *সনাতনশাস্ত্রম্* গ্রন্থে কালীপদ তর্কাচার্যকৃত *বিষ্ণুপ্রভা* পাদটীকাসহ *বিষ্ণুপুরাণ* প্রকাশিত হয়।

প্রথম থেকে ছয়টি অংশে এটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম অংশে আছে ২২ টি অধ্যায়। দ্বিতীয় অংশে আছে ১৬টি অধ্যায়, তৃতীয় অংশে ১৮ টি, চতুর্থ অংশে ২৪টি, পঞ্চম অংশে ৩৮টি এবং ষষ্ঠ অংশে ৮ টি অধ্যায়-মোট ১২৬টি অধ্যায় বিষ্ণুপুরাণে সমাপ্ত। তাই অধ্যায় বিভাগটি উপবিভাগ বলা যেতে পারে, প্রধান বিভাগ হল অংশ।

আচার্যদেব কাশ্যপকবি পুরাণশাস্ত্রে মূলত *বিষ্ণুপুরাণে* শ্রীধর স্বামীর *আত্মপ্রকাশ* টীকার উপর স্বরচিত পাদটীকা *বিষ্ণুপ্রভা* প্রণয়ন করেন। অতিসংক্ষিপ্ত এই টীকাটি সারগর্ভ ও প্রয়োজনীয়, মূল শ্রীধরস্বামীর *আত্মপ্রকাশ* টীকার অর্থ যেখানে দুর্বোধ্য সেখানে কালীপদ পাদটীকা করেছেন। *বিষ্ণুপুরাণের* মত এত অতিসংক্ষিপ্ত পাদটীকা পাওয়া যায় না। এই *বিষ্ণুপ্রভা* পাদটীকায় যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ-

প্রথমত তর্কাচার্য মহাশয়ের টীকাসহ এই *বিষ্ণুপুরাণ* সম্পাদনার বিশেষ কারণ রয়েছে- যেখানে সৃষ্টিপক্রিয়া থেকে ভারতবর্ষের বর্ণনা কলিধর্ম নিরূপণ সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গৃহস্থের সদাচার এখানে বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে কেবলমাত্র পৌরাণিক ঘটনাবলী নয় বর্ণিত হয়েছে সামাজিক প্রাসঙ্গিক বিষয়, তাই সনাতন শাস্ত্রের প্রচারে এই *বিষ্ণুপুরাণের* অনুবাদ ও সম্পাদনা করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই পুরাণের মহত্ত্ব বর্ণনায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তাই বলেছেন-

'*বিষ্ণুপুরাণ* অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট মহাপুরাণ। *বিষ্ণুপুরাণ* সর্বশিষ্ট সম্মত বিসংবাদ-শূন্য মহাপুরাণ।... *বিষ্ণুপুরাণ* অভ্যাস করিলে স্মার্ত্ত, দার্শনিক ও প্রগাঢ় ঐতিহাসিক হইতে পারা যায়। সর্ব-বিদ্যা-হেতু ধর্মশিক্ষাপ্রদ মহাপুরাণ।'[২৩]

দ্বিতীয়ত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রতিভাবলে এই শ্রীধরস্বামীর টীকার উপর অতিসংক্ষিপ্ত পাদটীকায় কখনও শব্দের অর্থ, ব্যাকরণগত প্রয়োগ, আবার কখনও অন্যশাস্ত্র

থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন মূল টীকাটিকে সহজবোধ্য করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ *বিষ্ণুপুরাণের* প্রথম অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের প্রসঙ্গ প্রতিপাদন করা যেতে পারে। সেখানে মঙ্গলাচরণে বলা হয়েছে-

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।

নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্বজ।।[২৪]

অর্থাত্ হে পুণ্ডরীকাক্ষ তোমার জয় হোক! হে বিশ্বের উদ্ভাবক তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ, হে আদিম পুরুষ তোমাকে নমস্কার।

এই ব্যাখ্যায় নব্যন্যায়ের প্রসঙ্গ এনে পাদটীকা আরম্ভ করলেন পণ্ডিত তর্কাচার্য মহাশয়। তিনি টীকায় বললেন-

'নমস্কারঃ স্বাবধিকোত্কর্ষবত্ত্বয়া জ্ঞাপনরূপো নমস্কারপদার্থঃ। আক্ষিপ্তঃ সূচিত ইত্যর্থঃ। উক্তং হি গদাধরভট্টাচার্য্যেণানুমানদীধিতিবিবৃতৌ- 'বস্তুতস্তু স্বাবধিকোত্কর্ষবত্ত্বয়া জ্ঞাপনং নমস্কার' ইতি। তদেবং সর্বোত্কর্ষেণেত্যনেন সর্বাবধিকোত্কর্ষস্য প্রতিপাদনাত্ স্বস্যাপি সর্বান্তর্গতত্বেন স্বাবধিকোত্-কর্ষস্যাপি প্রতিপত্তেঃ প্রাগুক্তনমস্কারস্যানেন সূচনমুপপন্নম্'।[২৫]

আবার প্রথম অধ্যায়ের ২০ নং শ্লোকে পরাশর মুনির উক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –'... 'রাক্ষসা নাপরাধ্যন্তে পিতুস্তে বিহিতং তথা' এই অংশে তর্কচার্য মহাশয় বললেন- 'পরস্মৈপদিনোঽপি রাধেরাত্মনেপদে প্রয়োগঃ পূর্ববদার্ষত্বাদেব সোঢ়ব্যঃ'[২৬] অর্থাত্ 'রাধ্' ধাতু পরস্মৈপদী হলেও এখানে আত্মনেপদ বলে প্রয়োগ হয়েছে তাই এটি আর্ষ প্রয়োগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে-

আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা।

শব্দাদিভিগুণৈঃ ব্রহ্মন্ সংযুক্তান্যুত্তরোত্তয়ৈঃ।।

এখানে বলা হয়েছে- আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণযুক্ত। এখানে মূলে অর্থ স্পষ্ট নয়। তাই মূলের 'সংযুক্তান্যুত্তরোত্তয়ৈঃ' এই পদের ব্যাখ্যায় তর্কাচার্য মহাশয় *বিষ্ণুপ্রভা* টীকায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করলেন-

'উত্তরোত্তরৈঃ ক্রমসিদ্ধৈঃ শব্দাদিভিঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধৈঃ। পূর্বাদ্ধোক্তানি আকাশাদীনি ভূতানি সংযুক্তানি সম্বদ্ধানীত্যর্থঃ। এবঞ্চ আকাশং শব্দগুণকম্, বায়ুঃ স্পর্শগুণকঃ, তেজো রূপগুণকম্, সলিলং রসগুণকম্, পৃথিবী চ গন্ধগুণেতি তত্র তত্র ক্রমেণ তত্তদ্-গুণসম্বন্ধঃ সিদ্ধঃ।'[২৭]

প্রকীর্ণ বিষয় অবলম্বনে কাশ্যপকবির অবদান

ক. *অনুবাদ-নবোদয়ঃ*, খ.*কাব্যচিন্তা* (সমালোচনামূলক গ্রন্থ) গ. গ্রন্থভূমিকা, ঘ. নগেন্দ্র-ধ্যান ও নগেন্দ্র- -স্তোত্রমন্ত্র রচনা।

ক. *অনুবাদ-নবোদয়ঃ*

সংস্কৃত বুক ডিপো ও ছাত্র পুস্তকালয়ের যৌথ উদ্যোগে *অনুবাদ-নবোদয়* গ্রন্থটি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় রচনা করে প্রকাশ করেন। এটি তাঁর মৌলিক কৃতি। সংস্কৃতের নবীন বিদ্যার্থিদের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ শেখানোর জন্য তিনি এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটিতে অনুবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সজ্জিত করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের প্রথমেই কাশ্যপকবি আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন পিতৃব্যের স্তুতি করে-

যো ভব্যভাগবতভাবিতসত্স্বভাবো

দেবদ্বিজেষু পরমাং রতিমাসসাদ।

ধীমানুপেন্দ্রপরমঃ পরভব্যকামী

শ্রীকৃষ্ণদাস ইতি সান্বয়নাম ভেজে।[২৮]

গ্রন্থের সূচীপত্রে অষ্টমাংশে ভাগ করা হয়েছে- **প্রথমাংশ**- সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য, বিশেষ্য ও বিশেষণ, শব্দানুবাদ (স্ত্রীপ্রকরণ, অঙ্গপ্রকরণ, রোগপ্রকরণ, পশু, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল ও শয্যা প্রকরণ), ক্রিয়ার কাল, কারক ও বিভক্তি, **দ্বিতীয়াংশ-** প্রত্যয়াদি ও সমাস, **তৃতীয়াংশ**- নানাবিধ ক্ষুদ্র বাক্যানুবাদ, **চতুর্থাংশ**- সংস্কৃতে কথোপকথন প্রকরণ, **পঞ্চমাংশ**- বিচিত্র বাক্যানুবাদ, **ষষ্ঠাংশ**- পদ্যানুবাদ প্রকরণ, **সপ্তমাংশ**- সংস্কৃতে পত্রাদি-লেখন প্রণালী, **অষ্টমাংশ**- সংস্কৃতে পরীক্ষা প্রশ্নপত্রের সন্দর্ভানুবাদ প্রকরণ ইত্যাদি।

অনুবাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি। সংস্কৃত ভাষায় লিখতে গেলে দুটি বিষয়ে নজর দিতে হয়। প্রথম হল শব্দাবলী, দ্বিতীয় হল ব্যাকরণ, এই গ্রন্থে এই দুটি বিষয়ের আলোচনা করে অতি সুন্দরভাবে পাঠকদের নিকট পরিবেশন করেছেন।

অনুবাদের জন্য উক্ত গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- প্রথমত এই গ্রন্থে সাধারণ ব্যাকরণ বিষয় আলোচিত হবার সাথে সংস্কৃত শব্দাবলীর ব্যবহার আলোচিত হয়েছে। নবীন বিদ্যার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* ও *ব্যাকরণ-কৌমুদী,* পণ্ডিত জানকীনাথ শাস্ত্রী রচিত *Help to the Study of Sanskrit* এ ছাড়াও প্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী এবং হৃষীকেশ শাস্ত্রী রচিত *পাণিনীয়ম্*। এই গ্রন্থে ব্যাকরণগত আলোচনা যথাযথ থাকলেও সংস্কৃত শব্দাবলীর ব্যবহার নেই। যা কিনা সংস্কৃত বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ও অনুবাদে অত্যন্ত অপরিহার্য। শব্দানুবাদ (মানুষপ্রকরণ, স্ত্রীপ্রকরণ,

অঙ্গপ্রকরণ, রোগপ্রকরণ, পশু, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল ও শয্যা প্রকরণ) সামঞ্জস্যভাবে আলোচিত ব্যাকরণগত পর্যালোচনার সাথে সাথে।

দ্বিতীয়ত *অনুবাদ-নবোদয়* গ্রন্থটি তর্কাচার্য মহাশয় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে প্রণয়ন করেছেন, তিনি জানতেন সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলি তাই সেগুলি অধিক আলোকপাত করেছেন। যেমন উক্ত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ-প্রকরণ আলোচনা, সাধারণত অন্যান্য গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। এখানে সংস্কৃত পদ্য রচনার কৌশল বিষয়ে তর্কাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থে বলেছেন-

'বাঙ্গলা গদ্য বা পদ্যটিকে অনুরূপভাবে প্রথমত সংস্কৃত গদ্যে পরিণত করিয়া ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘাদি অনুসারে যে শব্দের পর যে শব্দটি সন্নিবেশ করিলেই পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ হইবে'।[২৯]

খ. *কাব্যচিন্তা*

গ্রন্থরচনা ও প্রকাশকাল :- কালীপদ তর্কাচার্যকৃত ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কাব্যসমালোচনাত্মক গ্রন্থটি *কাব্যচিন্তা* নামে ছাত্র পুস্তকালয় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি পরিষদের সম্পাদক পদে ব্রতী ছিলেন। গ্রন্থটি পণ্ডিত উপেন্দ্র মোহন কাব্য-সাংখ্যতীর্থ ভট্টাচার্য মহাশয় সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। পরবর্তিকালে *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায়* ৯১ তম বর্ষে ২০০৮-২০০৯ সালে ১১১-৩৫২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। এই ধরনের সমালোচনামূলক গ্রন্থ সাধারণত দেখা যায় না। মহাকবিদের মহাকাব্য নিয়ে তর্কাচার্য মহাশয় গঠনমূলক সমালোচনা করে সমাপ্তিতে স্বসিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছেন, এটি আচার্য মহাশয়ের প্রতিভার স্বকীয়তা।

বিষয়বিন্যাস:- গ্রন্থটি দুইভাগে সম্পাদিত হয়। মূলত মহাকবি ভবভূতি ও মহাকবি কালিদাস প্রণীত কাব্যগ্রন্থসমূহের একটি সমালোচনা। গ্রন্থের শিরোনাম পৃষ্ঠায় 'শ্রীকণ্ঠ-কালিদাস-কাব্যসমালোচনাত্মকগ্রন্থ' কথাটি পাই। এই গ্রন্থে তিনি দুই মহাকবির কাব্যের উল্লেখ করে তার বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকটির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে বিষয়গুলির উত্থাপন করেছেন তা হল- অভিজ্ঞানশকুন্তলে বিশেষঃ, কাব্যের বিভাগ, দৃশ্যকাব্যের সামাজিকতা, সৎকাব্য ও অসৎকাব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সৎকাব্য, নায়কাদি নিরূপণ ইত্যাদি।

এছাড়াও যে আলোচনাগুলো আচার্য মহাশয় প্রতিপাদন করেছেন সেগুলি হল- *মালবিকাগ্নিমিত্রম্, কুমারসম্ভবম্, রঘুবংশম্,* বিক্রমোর্বশীয়ে, ভবভূতিঃ শ্রীকণ্ঠঃ, শ্রীরামচন্দ্রঃ, সীতা, কুশলবচন্দ্রকেতূনাম্, জনকঃ, বনদেবতা বাসন্তী, *মালতীমাধবম্,* শ্রীকণ্ঠনবরত্নসভাস্তারঃ, ভাষান্তরীণসমালোচনানুকৃতিঃ, হাস্যরসে কালিদাসঃ এবং অন্তিমে উপসংহারঃ।

কালিদাস অংশে আলোচনা শুরু হয়েছে – 'সকলকলালাপললিতপ্রকাশো দিব্যকাব্যকুশলকবিচক্রচূড়াবিলাসঃ কালিদাসঃ সর্বোত্কৃষ্টকবিগর্ভো মূর্ত্তেব কবিকীর্ত্তিরার্ত্তো নিরর্থকদর্থে বচনমার্থে বিধৃতাশ্চ সমর্থিতং পদার্থে জজাগার নিজাগারেষ্বিব রসসারেষ্বিতি প্রজানন্তি রসসারসম্ভোগমাচলক্ষ্যা বিলক্ষিতাভিখ্যাঃ কবিমুখ্যাঃ'।[৩০]

আবার *রঘুবংশম্* মহাকাব্য নিয়ে সমালোচনার প্রারম্ভেই বলেছেন- 'রঘুবংশে মহাকবেরস্য রচনাশৈলী বিশেষেণ পরিণতা দৃশ্যতে সাধারণবচোভিঃ যদা যদা হৃদয়প্ররুঢ়ভাববিনিবেদনং মধুরমাভঙ্গ্যা কবয়ঃ কর্ত্তুং ক্ষমাঃ, তদা তদা এব তে পরিণত কাব্যশক্তয়ঃ ইতি বিজ্ঞেয়ম্'।[৩১]

এখানে মূলত মহাকবি কালিদাসের কাব্যনির্মাণে পরিণত অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, রঘুবংশের ‘প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাত্’, ‘উদ্বাহুরিব বামন’ প্রভৃতি পংক্তি উদ্ধৃত করে। এইভাবে উল্লেখিত কাব্য ও চরিত্র (রামচন্দ্র, সীতা, লবকুশ, জনক) নিয়ে এক গঠনমূলক সমালোচনা এই *কাব্যচিন্তা* গ্রন্থে দেখা যায়। এ ছাড়াও এই গ্রন্থের অন্তিমে *কুমারসম্ভব, মালতীমাধব* ও রঘুবংশের সমগ্র সর্গগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা প্রতিপাদিত হয়েছে গ্রন্থসংক্ষেপ অতিসহজে বোধার্থে।

পরিশেষে তর্কাচার্য মহাশয় গ্রন্থ উপসংহারে সমগ্র কাব্যতত্ত্বজিজ্ঞাসুদের কাছে নিবেদন করে বলেছেন-

‘ভোঃ ভোঃ কাব্যতত্ত্বমধিজিগমিষবঃ পুরুষাঃ! এতাবত্ পর্যন্তমালোচিতমস্মাভিঃ কালিদাসস্য ভবভূতেঃ শ্রীকণ্ঠস্য চ জন্মস্থানকালাদিকম্ তদীয়কাব্যনৈপুণ্যঞ্চ। এতন্মাত্রেণৈব মন্যে সমাসেন সম্প্রতিভায়াদ্ ভবতাং চেতসি তদীয়কাব্যসমুৎকর্ষাদিস্তারতম্যঞ্চ তদুভয়োরিতি’।[৩২]

গ. গ্রন্থভূমিকা :- তর্কাচার্য মহাশয় অনেক গ্রন্থের ভূমিকা ও গ্রন্থপ্রশংসা রচনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল অধ্যাপক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মুক্তধারা* নাটকটি সংস্কৃত অনুবাদ করেন এবং গ্রন্থটি ১৯৬৪ সালে নিজেই প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের প্রশস্তি করতে গিয়ে তর্কাচার্য মহাশয় ১২ শ্লোকে এর ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন-

রবীন্দ্রনাথেন কবীশ্বরেণ কৃতা প্রসিদ্ধা ভুবি মুক্তধারা।
যস্যা বিচিত্রেণ রসেন ধীরা বিমুগ্ধচিত্তা নিয়তং ভবন্তি।।
তাং বঙ্গভাষাময়মুক্তধারাং ধ্যানেশনারায়ণ-চক্রবর্ত্তী।

অনূদ্য বৃন্দারকবাক্-প্রপঞ্চৈর্মহোপকারং জগতো ব্যধত্ত।।[৩৩]

ঘ. নগেন্দ্র-ধ্যান ও নগেন্দ্র-স্তোত্রমন্ত্র রচনা :- ১৯৮১ সালে মহর্ষি নগেন্দ্র স্মারক গ্রন্থ রচিত হলে উক্ত গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য নগেন্দ্র-ধ্যান ও নগেন্দ্র- -স্তোত্রমন্ত্র রচনা করেন। এই রচনাগুলির কাব্যমাধুর্য ও ভক্তিরসের ধারায় সিক্ত শব্দচয়ন পরিলক্ষিত হয়। ধ্যানমন্ত্রটি এরূপ-

অব্যাজং যোগিসম্রাজং ভক্তিভাজং জনার্দনে।
শ্রৌতধর্মস্য রক্ষার্থমবতীর্ণং মহীতলে।
ধর্মান্তর-পরিত্রাসনাশনং শর্মসাধনম্।
শ্রীনগেন্দ্রং সদাচার্যং শিবং শান্তং সদা ভজে।[৩৪]

অনুবাদ সাহিত্যে অনবদ্য কৃতিত্ব

ক. *গীতাঞ্জলিচ্ছায়া* খ. *শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া* গ. মৌলিক কাব্যানুবাদ

ক.*গীতাঞ্জলিচ্ছায়া* :- ১৯১০ সালে প্রকাশিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিমনের ভক্তিভাবনা দিয়ে যে অনবদ্য সৃষ্টি উপহার দিলেন তা হল *গীতাঞ্জলি*। ১৯১৩ সালে এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এরপর মূল গ্রন্থ পাঠ করার সাথে সাথে এই গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু মূল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত তাই নানান ভারতীয় ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়।

১৯৬১ সালের পরবর্তিকালে রবীন্দ্র শতবর্ষকে লক্ষ্য করে *গীতাঞ্জলির* সংস্কৃত অনুবাদের গতি লাভ করে। তবে উল্লেখ্য যে *গীতাঞ্জলির* অনুবাদের দুটি ধারা প্রচলিত হয়, একটি মূল বাংলা থেকে অনুবাদ, অন্যটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ। বাংলা *গীতাঞ্জলিতে* কবিতার সংখ্যা ১৫৭, কিন্তু ইংরেজি গীতাঞ্জলি কবিতার সংখ্যা ১০৩। ১৯৬৯ সালে

বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ থেকে কালীপদ তর্কাচার্যের ১৫৭ টি কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় মনীষার মধ্যে অনুবাদকর্মে সর্বাধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কাশ্যপকবি কালীপদ তর্কাচার্য কারণ তিনিই একমাত্র বাঙালি যিনি *গীতাঞ্জলির* সম্পূর্ণ সংস্কৃত অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অনুবাদকর্মের স্বকীয়তা হল শব্দচয়ন, প্রতিটি কবিতা সুললিত মুক্তক ছন্দে রচিত অর্থাত্ তিনি মূল কাব্যের ভাবকে বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কখনও আক্ষরিক অনুবাদ আবার কখনও ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছেন, মূল কবিতা ও অনুবাদগুলি তুলনা করলে দেখা যায় কালীপদ তর্কাচার্যকৃত অনুবাদগুলি নৈপুণ্যতা অনবদ্য। প্রকাশিত কবিতাতে তর্কাচার্য মহাশয় প্রায় সমস্ত শব্দই পরিবর্তন করেছেন। *গীতাঞ্জলির* ১৪৮ সংখ্যক কবিতাটি হল-

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।
ঘন শ্রাবণ মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।[৩৫]

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকাতে তর্কাচার্য মহাশয় অনুবাদ করলেন-

নমস্কারমেকং নমস্কারমেকং

প্রভো! কুর্বতো মে সমগ্রং শরীরম্।

লুঠত্বত্র তে সংস্কৃতাবপ্রমাদম্

ঘনশ্রাবণাম্ভোধরস্যানুরূপং

রসৈর্ভূরিভিঃ সম্ভৃতং নম্রভূতং

নমস্কারমেকং নমস্কারমেকং

প্রভো! কুর্বতো মে সমগ্রং মনো বৈ।

গৃহদ্বারি তে লগ্নমাস্তামবাধম্।।

পরবর্তিকালে বিশ্বভারতী প্রকাশনায় একেবারে অন্য অনুবাদ করলেন-

নমস্যয়ৈকয়া প্রভো! নমস্যয়ৈকয়া,

ভবে'ত্র তে লুণ্ঠতু মে বপুরখিলং ত্বয়া।

ঘনশ্রাবণমেঘবদ্-রসভরনম্রয়া,

নমস্যয়ৈকয়া প্রভো! নমস্যয়ৈকয়া,

ত্বদীয়মন্দিরদ্বারি ময়া সাধিতয়া,

পতিতমস্তু মনো মমানন্যগামিতয়া।

উপরের এই অনুবাদে দেখা যায় মূল ভাব কবি বহাল রেখেছেন সর্বদা। মনে হয় তর্কাচার্য মহাশয় রবীন্দ্র ভাবধারার অনুগামী ছিলেন।

আবার *গীতাঞ্জলির* ১০৬ সংখ্যক কবিতায় পদের ব্যবহার লক্ষণীয়, সেখানেও ভাবধারা সমপর্যায়

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে

জাগো রে ধীরে-

এই ভারতের মহামানবের

সাগরতীরে।

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে

নমি নরদেবতারে,

উদার ছন্দে পরমানন্দে

বন্দন করি তাঁরে।[৩৬]

কালীপদের মুক্তক ছন্দে অনবদ্য অনুবাদ-

হে মম মানস! পাবনতীর্থে

মন্দং জাগৃহি রে,

এতদ্ভারতমহিমসমন্বিত

মানবসাগরতীরে।

অত্র স্থিত্বা প্রসার্য বাহূ,

নরদৈবতমভিবন্দে,

স মহাচ্ছন্দঃ পরমানন্দং,

তদ্বন্দনমনুবিন্দে।

কালীপদের অনুবাদ সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, অনুবাদের ভাষা সহজ, সরল ও সুখবোধ্য। রবীন্দ্রনাথের মূল সৃষ্টির সাথে কালীপদের অনুবাদের প্রবাহ সমতুল্য বলা যায়। তর্কাচার্যের এই অনুবাদ যেন *গীতাঞ্জলির* ছায়াবিশেষ। তাই তো এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে *গীতাঞ্জলিচ্ছায়া,* নামকরণ যথাযথ ও সার্থক। অনুবাদকর্মে যেন বিশ্বকবি ও কাশ্যপকবির মেলবন্ধন হয়েছে অনায়াসেই অবলীলাক্রমে তা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের মানসিক ভাব যেন কালীপদের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত হয়েছে।

খ. *শ্রীশ্রীচণ্ডী*:- 'চণ্ড্ ধাতুর সাথে ঈপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে) প্রত্যয় করে এই চণ্ডী শব্দটির ব্যুৎপত্তি। যার অর্থ পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। অর্থাত্ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্না পরব্রহ্ম'।[৩৭]

১৯৯৯ সালে আদ্যাপীঠ থেকে বেলাদেবীর ভূমিকা সহ ভগ্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দে *শ্রীশ্রীচণ্ডী* নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মহাভারতের অন্তর্গত গ্রন্থ যেমন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ঠিক তেমনি মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত হল *চণ্ডী* গ্রন্থটি। এই পুরাণের ৮১-৯৩ অধ্যায় নিয়ে এই গ্রন্থটির নির্মাণ। এই গ্রন্থটির অনেক অনুবাদ দেখা যায়, এই অনুবাদগুলি প্রধানত গদ্যানুবাদ ও পদ্যানুবাদ। গদ্যানুবাদগুলি মধ্যে অন্যতম হল- পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কারত্ন, কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত অনুবাদ, পদ্যানুবাদের মধ্যে শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র অনুবাদটি অন্যতম। এছাড়াও আপামর বাঙালির কাছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর চণ্ডীর ভাষ্যপাঠ বিশেষ জনপ্রিয়।

অনুবাদ নিপুণ পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য এই গ্রন্থের ভগ্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ্যানুবাদ করেছেন। উক্ত অনুবাদের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সেগুলি নিম্নে আলোকপাত করা হল-

প্রথমত এই পদ্যানুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক ব্যবহার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাঁর *তিলোত্তমাসম্ভব* গ্রন্থে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। এরপর *মেঘনাদবধ* কাব্যে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। অমিত্রাক্ষর শব্দের অর্থ হল মিতাক্ষর অর্থাৎ যে ছন্দের অন্ত্যমিল নেই। একটি ভাব একচরণ থেকে অন্য চরণে প্রবাহিত। এই ছন্দে একটি মূলভাবকে অনেক চরণে বিন্যস্ত করা যায়। প্রধানত একটি ভাব

গম্ভীর বিষয়কে ব্যক্ত করবার জন্য এই ছন্দের ব্যবহার করা হয়। এই ছন্দে কবির স্বাধীনতা থাকে।

পণ্ডিত কালীপদ তাঁর চণ্ডীর অনুবাদে এই ছন্দের সার্থক ব্যবহার করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে এই ছন্দের ব্যবহার তর্কাচার্য মহাশয়ের এক অনবদ্য কৃতিত্ব। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মত একটি ভাব গম্ভীর বিষয়কে তিনি এই ছন্দে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। মূল চণ্ডীর একটি ভাবকে তিনি অনেক চরণে বিন্যস্ত করেছেন। মূল সংস্কৃত শ্লোক এর সাথে কালীপদের পদ্যানুবাদ মিলিয়ে দেখলে বিষয়টি আরও বোধগম্য হবে।

নারায়ণীস্তুতি নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদে স্পষ্ট অর্থের দ্যোতনা দেখা যায়

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি'।

দেবি! তুমি সন্তুষ্টা হইলে
করে থাক সর্বরোগনাশ,
রুষ্ট হলে নষ্ট কর যত ইষ্টকাম।
তোমারে আশ্রয় যারা করে ভক্তিভরে
নাহি হয় বিপত্তি তাদের
অন্যের আশ্রয়স্থান হয় তারা সবে।[৩৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম চরণের সাথে দ্বিতীয় চরণের কোন অন্ত্যমিল নেই, শ্লোকের মূলভাবটি একটি চরণে শেষ হয়নি, একটি চরণ থেকে আর একটি চরণে প্রবাহিত।

শ্লোকের একটি ভাবগম্ভীর বিষয়কে সরল ছন্দে প্রতিপাদন করা হয়েছে, তাই এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগ।

এই পদ্যানুবাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মূল চণ্ডীর শ্লোকের ভাবকে যথাযথভাবে রক্ষা করা। মূল গ্রন্থের ছায়া যেন কালীপদের পদ্যানুবাদের স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান। তাই প্রথমে এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছিল *শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া*।

অন্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করলেও এই অনুবাদের স্বকীয়তা সহজেই পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হল-

কালীপদ তর্কাচার্যের অনুবাদ-

সবর্ণা সূর্যের পত্নী।
তাঁর গর্ভে সূর্যের ঔরসে
সাবর্ণির হইল জনম।
চতুর্দশ মনুর মাঝারে
কথিত অষ্টম মনু সেই মহাজন।
শুন তাঁর উৎপত্তির কথা
যাহা আমি সবিস্তারে বলিতেছি তোমা[৩৯]

শ্রী মহেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুবাদ হল-

অষ্টম যে মনু সূর্য্যের তনয়,
সাবর্ণি যাঁহারে কয়,
কহিব বিস্তারি- শুনহ তাঁহারি
কিরূপে উৎপত্তি।

এই দুটি অনুবাদের মধ্যে তর্কাচার্যের অনুবাদে মূল আলোকপাত করা হয়েছে যেমন সবর্ণা সূর্যের পত্নী এই অংশে, কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদে তা অনুপস্থিত।

এই অনুবাদ অনুবাদক কালীপদের একইসঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় গভীর প্রবেশ প্রমাণ করে এবং দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তর্ক শাস্ত্রের পণ্ডিত হলেও ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় তার মধ্যে দেখা গেছে এই অনুবাদের মাধ্যমে।

গ. মৌলিক কাব্য অনুবাদ :- কাশ্যপ কবি কালীপদের মৌলিক কাব্যানুবাদের রচনা শৈলীতে বেশ কিছু স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয়। কালীপদ স্বীয় সৃজনশক্তি বলে অনেক নতুন ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। তার রচনায় কাব্যশৈলীর নিপুণ ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঋতুর বর্ণনায় নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। আচার্য মহাশয় সারা জীবনে অসংখ্য নানান অনুবাদে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য এবং ছন্দের বৈচিত্র্য তিনি যেন উজাড় করে দিয়েছেন তার মৌলিক কাব্য গুলিতে।

রচনা শৈলীর যথার্থ প্রয়োগে মহাকবি ভারবির পথ তর্কাচার্য মহাশয় যেন অনুসরণ করেছেন। ভারবির *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্যে যেমন শুধুমাত্র ‘নকার’ দিয়ে একটি অর্থবহ শ্লোক রচনা করেছেন, কবি কালীপদ ঠিক তেমনি রকার বর্জিত ও নকার শূন্য শ্লোক রচনা করেছেন। উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কাব্যগুচ্ছের প্রথম হল *ঈশাভিবন্দনম্*। দশটি শ্লোকে নির্মিত র-কার বর্জিত এই শিবস্তুতিতে বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রাসের সুন্দর ব্যবহার করা হয়েছে-

ঈশং বিপুলবিশেষং চিক্কণকেশং সদা হৃষীকেশম্।
নাশিততামসলেশং সুললিতবেশং শিবং বন্দে।।

বামে জলনিধিকন্যা ভুবনে ধন্যা সদা সদাসন্না।

যস্য হৃতাখিলদৈন্যা তং ভুবি মান্যং শিবং বন্দে।।[৪০]

এবার কাশ্যপকবির দশটি 'ন' কার শূন্য কাব্য হল বসন্তপ্রকৃতি, এই কবিতাটির শেষ চারটি শ্লোক 'ন' ও 'ণ' কার শূন্য। কবিতাটি এরূপ-

অকস্বরসরোরুহৈঃ কুচবিলাসমুদ্বিভ্রতী

মরালবিমলাম্বরা মধুপকৃষ্ণকেশচ্ছবিঃ।

ভ্রুবোঃ পরমচারুতাং লহরিকাভিরেষা গতা

স্ফুটাম্বুজমুখী সখী চ্যুতপরাগরাগোত্তমা।।[৪১]

কাশ্যপ কবি কালীপদের কাব্যের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকৃতি প্রেম। তিনি তাঁর কাব্যে বসন্তকাল গ্রীষ্মকাল শরৎকাল এমনকি হেমন্তকাল বিষয়ে তার রচনা লক্ষ্য করা যায়। কবিতায় গ্রীষ্মকাল এবং মানব মনের ওপর তার প্রভাব বর্ণিত হয়েছে। কবিতাটির নাম *নিদাঘপ্রকৃতিচ্ছায়া*। কবিতাটির শেষাংশ হল-

পাটলপরিমলসঙ্গসুকোমলবিমলানিলরযরম্যাঃ

মধ্যমযামপ্রকৃটিতধামপ্রখরকরক্ষয়গম্যাঃ।

দিনপরিণামা রজনীযামা মৃদুলা দিবসারম্ভাঃ

প্রকৃতিং বিদধতি ললিতাং সম্মতি চিরমিব সুহৃদুপলম্ভাঃ।।[৪২]

এই শ্লোকে যেন *অভিজ্ঞানশকুন্তম্* নাটকের প্রথম অঙ্কের সূত্রধরের অনুরোধে নটীর যে গান তার ছায়া স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। বসন্ততিলক ছন্দে রচিত কালীপদের আরেকটি কাব্য হল *বর্ষাপ্রথমবিভ্রমম্* এই কাব্যে কিভাবে মেঘ সৃষ্টি হয়ে গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রকৃতি জগতকে বৃষ্টি দানে পুনর্জীবিত করে তার সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা রয়েছে। দশটি শ্লোকে রচিত হেমন্তসুষমাগাঁথা কবিতায় হেমন্তকালীন সন্ধ্যার সুন্দর চিত্র দেখা যায়। কাশ্যপ কবি রচিত

সারদী কাব্যগ্রন্থে শরৎ প্রাকৃতিক বর্ণনায় একটি নিপুণ চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ঋতু বৈচিত্র্যের এই কাব্যগুলিতে মহাকবি কালিদাসের *ঋতুসংহারম্* খণ্ডকাব্যের একটি প্রতিচ্ছবি কালীপদের কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে। কালিদাসের প্রকৃতি প্রেম থেকেই যেন শিক্ষা নিয়ে কালীপদ এই ঋতু বর্ণনাময় কবিতা গুলি রচনা করেছেন বলে মনে হয়।

আচার্য মহাশয়ের বেশ কিছু সংস্কৃত কাব্য সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষা মাধ্যমে পাঠের উপযোগী যার শব্দচয়ন পাঠককে মুগ্ধ করে। এমন একটি কাব্য হল *বিরহিণীবিলাপম্*। এখানে কবি কালীপদ নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছেন-

‘বঙ্গভাষাময়কবিতাছন্দসা তদনুকারেণ বিশেষতো হ্রস্বদীর্ঘস্বরবিচারমনাদৃত্য নিবদ্ধোঽয়ং নিবদ্ধো যেনাত্র পাঠাবসারে বঙ্গভাষাময়কবিতেতি ভ্রমো ভবতি’।কবিতাটি হল-

বসন্তে কৌমুদীধৌতবিজনপ্রান্তরে

কোকিলমধুরস্বর-মুগ্ধদিগন্তরে

চিন্তাপরা বিরহিনী

প্রিয়তমে প্রণয়িনী

প্রবলদহনদাহধারিণী অন্তরে

সুমধুরহাস্যরেখা বিলুপ্তা অধরে।[৪৩]

টীকাসহিত গ্রন্থ সম্পাদনায় কাশ্যপকবির নৈপুণ্যতা

তর্কাচার্য মহাশয়কৃত বহুবিধ সম্পাদনাকৃত গ্রন্থের মধ্যে উক্ত অংশে কেবলমাত্র *মেঘদূতম্* খণ্ডকাব্যটির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচিত হল-

মেঘদূতম্ :-এই *মেঘপ্রভা* টীকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ঘটনার মূল বিষয়কে প্রসঙ্গক্রমে ধরিয়ে দেওয়া যা অন্যান্য টীকাগ্রন্থে সাধারণত দেখা যায় না, যেমন মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের যক্ষের অভিশাপের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-

'অস্তি পুরা যক্ষরাজেন কুবেরেণ কৈলাসশৈলেশ্বরস্য শূলপাণেঃ সমর্চ্চনায় মানসসরসি শতকুম্ভসরসিজপরিরক্ষণায় নিযুক্তঃ কশ্চিত্ যক্ষঃ। স চ কদাচিত্ সংসর্পত্-কন্দর্পদর্পপরিত্রস্তো নিজমধিকারম্ অবজ্ঞায় প্রিয়াপ্রণয়মুপবুভুজে'।[৪৪]

এই গ্রন্থের শ্লোকের অনুবাদ সংস্কৃতগন্ধিভাবে করা হলেও যেন মূল বৃত্তান্তের অবতারণা করা হয়েছে, যেমন প্রথম শ্লোকের অনুবাদ হল-

'কোনও যক্ষ স্বকীয় কর্ত্তব্যকর্মে অনবধানতাবশত প্রিয়াবিরহে দুঃসহ একবর্ষভোগ্য প্রভু যক্ষরাজের শাপে শ্রীবর্জিত ও দীনাবস্থাগ্রস্থ হইয়া চিত্রকূটাদির প্রচ্ছায়াপাদসমাকীর্ণ আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেস্থানে নদীহ্রদাদি সীতাদেবীর অবগাহনে পরিপূরিত হইয়াছিল'।[৪৫]

এই *মেঘপ্রভা* টীকাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মল্লিনাথের ব্যাখ্যা যে যে স্থলে শৈথিল্য দেখিয়েছেন এবং যে স্থানে অর্থবোধের কাঠিন্য দেখা গেছে তর্কাচার্য ও বিদ্যানিধি মহাশয় সেই স্থানের আলোচনা স্পষ্ট করেছেন। তাই সাধারণ পাঠকদের হিতার্থে এবং কাব্যটির রসমাধুর্য্য পাঠকসমাজে সঞ্চারিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য টীকার

অবতারণা, অলঙ্কারবিচার ও পাঠান্তরবিচার করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে তাই তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন-

‘কিন্তু বর্ত্তন্তে মেঘদূতেঽস্মিন্ তথাবিধানি বহূনি স্থলানি, যানি অতিসরলানীতি বুদ্ধ্যা মল্লিনাথেনোপেক্ষিতানি, তান্যেব চাস্মাভিঃ সন্নিবেশমনুশীলয়দ্ভিঃ কস্যাশ্চিদতিসরলায়া গূঢ়ার্থায়াশ্চ টীকায়া মুখেন প্রতিপাদিতানি, পদানাং গভীরাস্তাত্পর্যার্থাঃ অলঙ্কারবিচারাঃ, পাঠান্তরবিচারাশ্চ সবিশেষমাচরিতাঃ। যত্রার্থবিধৌ কাঠিন্যং, যত্র চ মল্লিনাথস্য টীকাতঃ কৃচ্ছ্রেণার্থাবগতিঃ, তত্র তত্র তথা সরলাঃ পন্থানঃ সমবতারিতাঃ, যথা অনধীতকাব্যা-ন্তরাণামপি এতট্টীকাসম্বলেন মেঘদূত-বস্তুষু সুখেন বিজ্ঞানং ভবেদিতি।[৪৬]

আবার *মেঘপ্রভা* টীকাতে মল্লিনাথের টীকার বক্তব্য গৌরবের সাথে মান্য করা হয়েছে যেমন দ্বিতীয় শ্লোকের ‘প্রথম দিবসে’ নাকি ‘প্রশম দিবসে’ এই বিতর্কে ‘প্রথম দিবসে’ এই মল্লিনাথের পাঠকেই সাগ্রহে গ্রহণ করা হয়েছে, *মেঘপ্রভা* টীকার বলা হয়েছে-

‘প্রশমদিবসে ইতি পাঠাপেক্ষয়া ‘প্রথমদিবসে’ ইত্যেব পাঠঃ সাধুঃ, মন্যতে, প্রথমদিবসে মেঘদর্শনপ্রতিষেধককারণবিশেষাভাবাত্ মেঘানাং প্রথমদর্শন এব চ বিরস্য সমুদ্দীপ্তত্বাত্। বিস্তরস্তু মল্লিনাথাজ্-জ্ঞেয়ঃ’।[৪৭]

উল্লেখপঞ্জি

১. *কাব্যমীমাংসা,* চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ৮১

২. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খণ্ড. ৫৬, ১৯৭৩ *বিলাপগাঁথা,* পৃ. ৪

৩. তর্কাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মরণে রচিত পুস্তিকা, *মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য* প্রবন্ধ, পৃ. ৪১

৪. *প্রশস্তপাদভাষ্য, সূক্তিদীপিকা,* পৃ. ৪

৫. *বৈশেষিক সূত্র* ১.১.১

৬. *প্রশস্তপাদভাষ্য,* ভূমিকা পৃ. ১

৭. *তদেব,* পৃ. ৯

৮. *তদেব,* পৃ. ৭

৯. *ভাষারত্নম্, রত্নলক্ষ্মী,* টীকা, পৃ. ব

১০. *কাব্যমীমাংসা,* দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩৫

১১. *ভাষারত্নম্, রত্নলক্ষ্মী* টীকা, পৃ. ২

১২. তত্রৈব

১৩. *সাংখ্যকারিকা,* ভূমিকাংশ

১৪. *সাংখ্যসার, সারপ্রভা*টীকা, মঙ্গলাচরণশ্লোক

১৫. *সাংখ্যসার,* কারিকা ২

১৬. *তদেব, সারপ্রভাটী*কা, পৃ. ৩

১৭. *যোগিভক্তচরিতম্,* চতুর্থাঙ্ক, শ্লোক নং ১১

১৮. *যোগসূত্র* ১.১

১৯. *যোগিভক্তচরিতম্,* দ্বিতীয় সর্গ, শ্লোক নং ৩৫

২০. *তদেব,* শ্লোক নং ৪৬-৪৭

২১. *মাণবকগৌরবম্,* সপ্তমাঙ্ক, পৃ. ৯৫

২২. *তদেব, মাণবকগৌরব-ভূমিকা,* পৃ. ১

২৩. *বিষ্ণুপুরাণ,* ভূমিকা অংশ

২৪. *তদেব,* শ্লোক নং ১

২৫. *তদেব, বিষ্ণুপ্রভা*পাদটীকা, পৃ. ২

২৬. *তদেব,* পৃ. ৪

২৭. *তদেব,* পৃ. ১১

২৮. *অনুবাদ-নবোদয়,* উৎসর্গপত্র অংশ

২৯. *তদেব,* পৃ. ২২৫

৩০. *কাব্যচিন্তা,* পৃ. ১

৩১. *তদেব,* পৃ. ১৪৮

৩২. *তদেব,* উপসংহার, পৃ. ২৪১

৩৩. *মুক্তধারা,* তর্কাচার্য প্রশস্তি, শ্লোক ১-২

৩৪. মহর্ষি নগেন্দ্রস্মারক গ্রন্থ, সম্পা. নির্মলকান্তি বসু, পৃ. ৯

৩৫. *গীতাঞ্জলি,* ১৪৮ সংখ্যক কবিতা

৩৬. *তদেব,* ১০৬ সংখ্যক কবিতা

৩৭. *শ্রীশ্রীচণ্ডী,* স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, পৃ. ৩৪

৩৮. *শ্রীশ্রীচণ্ডী* ১১.২৯

৩৯. *তদেব,* প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১

৪০. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা. খণ্ড. ৯২, ২০০৯, ঈশাভিবন্দনম্,* পৃ. ১০৪

৪১. *তদেব, বসন্তপ্রকৃতি,* পৃ. ১২৫

৪২. *তদেব, নিদাঘপ্রকৃতিচ্ছায়া,* পৃ. ১১০

৪৩. *তদেব, বিরহিনীবিলাপ,* পৃ. ১০৭

৪৪. *মেঘদূতম্, মেঘপ্রভা*টীকা, পৃ. ৩

৪৫. *তদেব,* পৃ. ৪

৪৬. *তদেব, মেঘদূতম্,* সমালোচনা অংশ, পৃ. ১৭

৪৭. *তদেব,মেঘপ্রভা*টীকা, পৃ. ৭

উপসংহার

প্রখ্যাত বৈদান্তিক পরিব্রাজকাচার্য মধুসূদন সরস্বতীর যোগ্য উত্তরাধিকারী মহামহোপাধ্যায় কাশ্যপকবি পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য যে মহান প্রতিভার অধিকারী আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের পর্যালোচনা থেকে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাঁর প্রজ্ঞার দীপ্তি, সৃজনশীলতার প্রভায়, নিরহঙ্কার স্বভাব ও ছাত্রদরদী চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই সকলের কাছে বিস্ময়ের। তিনি ছিলেন সংস্কৃত জগতের এক মহাকবি, নৈয়ায়িকচূড়ামণি ও সকল শাস্ত্রে পারঙ্গম পণ্ডিত।

সকল নদীসমূহ যেমন সাগরে পতিত হয়, অনুরূপভাবে সকল সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটেছে তর্কাচার্য মহাশয়ের বিদ্যাবত্তায়। তাঁর সৃষ্টির বিচ্ছুরণ এত প্রসারিত যে তাঁকে কেবলমাত্র নৈয়ায়িক, আবার কেবলমাত্র কাব্যিক কিংবা অন্য কোন একক বিশেষণে আখ্যা দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য, তাঁকে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বিদ্বান বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত-এই শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জন্ম, ব্যক্তিগত পরিচয়, শিক্ষাজীবন, অধ্যাপনা, অধ্যাত্মজীবন ও অন্যান্য সারস্বত সাধনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। যে সকল মূল আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে সেগুলি হল-

১. জন্ম ও বংশপরিচয় ২. কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বংশলতিকা ৩. বাল্যকাল ও প্রারম্ভিক শিক্ষা ৪. উচ্চতরশিক্ষা ও উপাধি প্রাপ্তি ৫. তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যাপকগণের নাম ৬. আচার্য মহাশয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যার্থিগণ ৭. অধ্যাপনা ও কর্মজীবন ৮. সম্মানপ্রাপ্তি

৯. দাম্পত্যজীবন ১০. নাট্যচর্চা ও অভিনয়দক্ষতা ১১. কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় স্মরণে পণ্ডিতগণের মন্তব্য ১২. মহাপ্রয়াণ।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনালোকে আচার্য প্রতিভা এই শীর্ষক নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তর্কাচার্য মহাশয়ের দর্শনবিষয়ক যে গ্রন্থসমূহের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল- ১. মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের স্বকৃত *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা। ২. প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর জগদীশ তর্কালংকার রচিত *সূক্তি* টীকা অবলম্বনে *সূক্তিদীপিকা* টীকা। ৩. কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *ভাষারত্ন* গ্রন্থের স্বকৃত *রত্নলক্ষ্মী* টীকা। ৪. গদাধর ভট্টাচার্য রচিত *মুক্তিবাদ* গ্রন্থের স্বকৃত *মুক্তিদীপিকা* টীকা। ৫. ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ* গ্রন্থ। ৬. হরিরাম তর্কবাগীশ প্রণীত *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থোপরি স্বকৃত *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা। ৭. *ন্যায়দর্শনবিন্দু* (প্রবচনত্রয়ী) – বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে তর্কাচার্য মহাশয় কর্তৃক ন্যায়দর্শন বিষয়ক তিনটি প্রবচন। ৮. জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য বিরচিত *শব্দার্থসারমঞ্জরী* গ্রন্থ ও স্বকৃত *সারদীপিকা* টীকা। ৯. *জাতিবাধকবিচার*। ১০. *অক্ষপাদদর্শন*। ১১. *ন্যায়পরিভাষা*।

এছাড়াও সাংখ্যদর্শনের উপর আচার্য মহাশয় টীকাসহ দুটি গ্রন্থ অনুবাদ করে সম্পাদনা করেন, গ্রন্থগুলি হল- ১২. বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত *সাংখ্যসার* গ্রন্থোপরি *সারপ্রভা* টীকাসহিত সম্পাদনা। ১৩. *গৌড়পাদভাষ্য* ও *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* টীকাদ্বয়সহ স্বকীয় *ভাষ্যপ্রভা* পাদটীকাসহ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থ সম্পাদনা- ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ ও স্বকীয়টীকাগ্রন্থাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর আলোচ্য অধ্যায়ে প্রথমে ন্যায়দর্শনের প্রশংসা দিয়ে আরম্ভ করে টীকাসহ গ্রন্থগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচিত হয়েছে। ক. গ্রন্থকারের পরিচয় ও রচনাকাল খ. টীকাগ্রন্থের

নামকরণ ও প্রয়োজন গ. টীকাগ্রন্থের মৌলিক বিষয়, ঘ. টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণ প্রভৃতি উপ-শিরোনামে অধ্যায়ের আলোচনাটি বর্ধিত হয়েছে।

কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যের অবদান নামক তৃতীয় অধ্যায়ে 'কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্য মহাশয়ের কৃতি' আলোচিত হয়েছে। কাব্য সংসারে তাঁর অবাধ বিচরণ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। এই পরিসরে তর্কাচার্য মহাশয়ের বিরচিত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, দৃশ্যকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কাব্যের ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ, প্রয়োগ কৌশল ও তার শব্দচয়ন বিশ্লেষিত হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিটি কাব্যের গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল, কাব্যের আকরগ্রন্থ বা উৎস, বিষয়সংক্ষেপ, মহাকাব্যত্ব ও খণ্ডকাব্যত্ব বিচার, এবং কাব্যটির বিশেষ দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে উক্ত অধ্যায়ে।

কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে তর্কাচার্য মহাশয়ের বিশেষ অধিকার বিদ্যমান তা এই তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কাব্যের জগতে তিনি যেন অনায়াসগম্য ও স্বাধীনচেতা। এই অধ্যায়ে আলোচনাটি নিম্নোক্তক্রমে পর্যালোচনা করা হয়েছে-

মৌলিক কাব্যগ্রন্থ রচনাকৃতি- ক.মহাকাব্য *(সত্যানুভাবম্, যোগিভক্তচরিতম্, আশুতোষাবদানম্)*, খ. খণ্ডকাব্য (*মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্, আলোকতিমিরবৈরম্*) গ. দৃশ্যকাব্য (*প্রশান্তরত্নাকরম্, মাণবকগৌরবম্, নল-দময়ন্তীয়ম্, স্যমন্তকোদ্ধারম্*)।

অনুবাদগ্রন্থসমূহ - ক. *গীতাঞ্জলিচ্ছায়া* খ.*গীতাপ্রতিচ্ছায়া* গ. *শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া* ঘ. *যুগলাঙ্গুরীয়ম্* ঙ. *দত্তা* উপন্যাস চ. রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য ছ. মৌলিক কাব্যানুবাদ।

স্বকীয় টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ ক. *মেঘদূতম্* খ. *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* গ. *দশকুমারচরিতম্* ঘ. *মহানাটকম্* ঙ.*বিষ্ণুপুরাণম্* চ. *বেণীসংহারম্*।

বিবিধ পত্রিকায় প্রাপ্ত রচনাকৃতি- *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা,* খ. *মঞ্জূষা,* গ. *সংস্কৃত-পদ্যবাণী,* ঘ. *সংস্কৃত-প্রতিভা,* ঙ. *ভারতবর্ষ* চ. *প্রণবপারিজাত,* ছ.*দেবযান,* জ.*সুদর্শন,* ঝ. *সারস্বতী-সুষমা*।

সাহিত্য ও দর্শন : একে অন্যের পরিপূরক নামক চতুর্থ অধ্যায়ে একটি মনোজ্ঞ ব্যাখ্যান প্রতিপাদিত হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয়ের কাব্যের মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিপাদন ও অন্যদিকে পরিপূরকভাবে দার্শনিক বিশ্লেষণে সরস কাব্যতত্ত্ব পরিবেশন পর্যালোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

আলোচনাটি প্রারম্ভ হয়েছে সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ দিয়ে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পর সাহিত্য শব্দের লক্ষণ, সেই প্রসঙ্গে নানান আলংকারিক ও পণ্ডিতগণের মতামত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষত রাজানক কুন্তক সাহিত্য শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। এরপর রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্য শব্দদুটিকে একার্থে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী আলোচনাতে সাহিত্য শব্দের ইতিহাস বা সাহিত্যের কাল বিষয়টি স্থান পেয়েছে।

এরপর দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করে মূল বিষয়ে প্রবেশ করা হয়েছে। সাহিত্যে দর্শন ও দর্শনে সাহিত্য এই আলোচনাটি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সারস্বত কৃতিগুলি থেকে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিষয়টির যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য আচার্যদেবের নির্বাচিত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও দৃশ্যকাব্য থেকে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত নেওয়া হয়েছে।

তর্কাচার্য মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি ও তার অনন্যতা নামক পঞ্চম অধ্যায়ে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের নির্বাচিত সারস্বত অবদানগুলি উল্লেখ করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয়েছে। অন্য কবি ও দার্শনিকদের সাথে তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বকীয়তা কোথায় তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেহেতু পণ্ডিত কাশ্যপকবি ছিলেন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। সুতরাং কবির সৃষ্টিতে স্বকীয়তা থাকাটাই স্বাভাবিক। সহৃদয়ের কাছে তাঁর সাহিত্যকৃতি উত্তীর্ণ হয়েছে, তা তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

অধ্যায়ের আলোচনার প্রারম্ভে প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে প্রতিভা সম্বন্ধে *কাব্যমীমাংসা*কারের মত উত্থাপন করে আচার্যদেবের প্রতিভার অন্বেষণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারয়িত্রী প্রতিভার প্রথমভাগ হল সহজা ও দ্বিতীয় ভাগ হল আহার্যা। সহজা প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, এটি দৈবলব্ধ, অন্যদিকে আহার্যা প্রতিভা এই জন্মেই লব্ধ সম্পদ- চেষ্টা বিশেষের ফল। পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফলে এই প্রতিভার জন্ম হয়। তর্কাচার্য মহাশয়ের সমগ্র সাহিত্যকৃতি এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা জীবন পর্যালোচনা করলে এই কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার পাওয়া যায়।

এরপর উক্ত অধ্যায়ে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তর্কাচার্য মহাশয়ের অনন্যতা, সাংখ্যদর্শনে আচার্যদেবের অবদান, কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যকৃতির স্বকীয়তা: এই প্রসঙ্গে নির্বাচিত মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর উত্থাপন করা হয়েছে, পুরাণশাস্ত্রে আচার্য প্রতিভা, প্রকীর্ণ বিষয় অবলম্বনে কাশ্যপকবির অবদান, অনুবাদ-সাহিত্যে কৃতিত্ব এবং টীকাসহিত গ্রন্থ সম্পাদনায় কাশ্যপকবির নৈপুণ্যতা প্রভৃতি বিষয় ক্রমানুসারে আলোচিত হয়েছে। পণ্ডিতসমাজের কাছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতির অনন্যতা কীভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেওয়া এই অধ্যায়ের প্রয়াস।

পণ্ডিতপ্রবর কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সারস্বত সাধনা অর্থাত্ কৃতিগুলি পর্যালোচনা করে যে নবীন তথ্যের উদ্ভাবন হয়েছে, সেগুলি হল-

তর্কাচার্য বিরচিত অ-প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান- গ্রন্থগুলি হল ১. *আশুতোষাবদানম্* (মহাকাব্য), ২. *ঋতুচিত্রম্* (শ্রব্যকাব্য), ৩. *মনোময়ী* (গদ্যকাব্য), ৪. অপ্রকাশিত পত্রাবলী, ৫. আচার্য মহাশয়কে নিয়ে ছাত্র পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের *তর্কাচার্যপ্রবন্দনম্* মহাকাব্য।

তর্কাচার্য মহাশয়ের বেশ কিছু সাহিত্যকৃতি ও সম্পাদিত পত্রিকা পূর্বে বিদ্যমান থাকলেও বর্তমানে তা লুপ্ত হয়েছে, যেমন *সংস্কৃত-পদ্যবাণী* পত্রিকা যেটি একসময় সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ, *শৈশবসাধনম্* নামক মহাকাব্য, *সাংখ্যকারিকার ভাষ্যপ্রভা* টীকা, *নৈষধচরিতম্* মহাকাব্যের স্বকীয় টীকা, *মনোদূতম্* নামক দূতকাব্য এবং মূল্যবান কিছু প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

কাশ্যপকবির যে বিপুল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি বর্তমানে কোন কোন গ্রন্থাগারে আছে তার উল্লেখ উক্ত গবেষণা নিবন্ধে করা হয়েছে, যার ফলে ভাবী গবেষকের নিকট তর্কাচার্য মহাশয় বিষয়ে অধিক শোধকার্যের পথ প্রশস্ত হবে বলে মনে করা যেতে পারে। এ ছাড়াও আচার্যদেবের প্রবন্ধগুলি পত্রিকার কোথায় আছে এবং সেই পত্রিকার সাল, খণ্ড, সম্পাদক এমনকি পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে।

সৃষ্টিকর্মের অনন্যতা ও মৌলিকতা প্রতিপাদন বিশেষকরে পণ্ডিতসমাজে তাঁর কৃতির উৎকর্ষতা বিচার সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যা তর্কাচার্য মহাশয়ের

সারস্বতকৃতির নতুনত্বের দাবী রাখে। তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনপঞ্জি থেকে বংশলতিকা প্রণয়ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যার্থিগণের নাম প্রভৃতি বিষয় এই নিবন্ধের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়।

উক্ত গবেষণাকার্যের সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত বিদ্বত্-সমাজে তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁর টীকাসহিত সম্পাদিত গ্রন্থগুলি বিদ্যার্থিগণের কাছে অত্যন্ত উপযোগী মূল পাঠের অর্থ স্পষ্টার্থের জন্য। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় এমনকি শোধকার্যে তাঁর সারস্বতকৃতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সর্বপ্রথম পুঁথি থেকে তিনি কিছু গ্রন্থের সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন স্বকীয় টীকা সহিত, উদাহরণস্বরূপ কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *ভাষারত্নম্*। যার ফলে দার্শনিকসমাজ তাঁর কাছে চিরঋণী।

এছাড়াও আচার্যদেবের সহজসরল জীবনযাপন, শিক্ষার্থীদের সাথে মধুর ব্যবহার, সর্বজনহিতৈষী মনোভাব, দেবব্রাহ্মণ এবং পিতামাতা ও গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা আদর্শস্থানীয় ছিল। সমাজজীবনে প্রধানত তাঁর ছাত্ররা সেই ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিল।

তিনি যে কেবলমাত্র বিদ্যার্থী বা বিদ্বানগণের সেবা করেছেন তা নয়, দরিদ্র, আর্ত ও বিপন্নকে কতভাবেই যে উপকার করেছেন তা আচার্যদেবের অন্তেবাসী ছাত্রদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়। তিনি কোটালিপাড়ায় গরিব ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতনিক চতুষ্পাঠী ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রবেশাধিকার সকলের জন্য মুক্ত করেন। সেখানে তার বহুবিধ সমাজসেবার কথা জানতে পারা যায়।

নিজের গ্রামে মধুসূদন সরস্বতীর নামে একটি মধুসূদনসরস্বতী মন্দিরের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে সেখানে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় সুরসরস্বতী সংস্কৃতপরিষদ্ নামে সংস্কৃত পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু দেশভাগের ফলে সবকয়টি

প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বদেশে যাওয়া আচার্য মহাশয়ের বন্ধ হয়, এই সমস্তের স্মৃতি শেষজীবন পর্যন্ত তাঁকে বেদনাহত করে।

ভাবী গবেষকের নিকট গবেষণার পথ :- 'সারস্বত সাধনায় কালীপদ তর্কাচার্যের অবদান' উক্ত সন্দর্ভটি ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে পরবর্তিকালের শোধকার্যের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে। সম্ভাব্য যে শোধকার্যগুলি তর্কাচার্য মহাশয়ের সারস্বতকৃতির আশ্রয়ে হতে পারে সেগুলি হল-

প্রথমত- প্রারম্ভেই একথা বলা যেতে পারে কাশ্যপকবির অপ্রকাশিত গ্রন্থের প্রকাশ, তাঁর মহাকাব্য, নাটক, দূতকাব্য ও অনুবাদ গ্রন্থ যেগুলি প্রকাশিত হয় নি। বিশেষত পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের *তর্কাচার্যপ্রবন্দনম্* মহাকাব্যটি যেটি পুঁথি অবস্থায় হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের গ্রন্থাগারে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই মহাকাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে আচার্যদেব সম্পর্কে আরও অধিক তথ্য জানা যাবে।

দ্বিতীয়ত- তর্কাচার্য মহাশয় অসংখ্য গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত থেকে বাংলা আবার বাংলা থেকে সংস্কৃত এই অনুবাদগুলি প্রতিপাদিত হয়েছে। এই অনুবাদগুলি হল- রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদ (যেমন *গীতাঞ্জলি, গান্ধারীর আবেদন*), আধ্যাত্মিকগ্রন্থের অনুবাদ (যেমন *চণ্ডী, গীতা*), মৌলিকগ্রন্থের অনুবাদ (কিছু স্বকীয় সংস্কৃত কবিতা), অন্যান্য কবির অনুবাদ (যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা), স্তোত্রকাব্যের অনুবাদ প্রভৃতি। এই অনুবাদগ্রন্থগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে শোধকার্য হতে পারে।

তৃতীয়ত- কাশ্যপকবির বিরচিত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য বা দৃশ্যকাব্যগুলি নিয়ে একটি গবেষণাকার্য হতে পারে, সেখানে সাহিত্যসৃষ্টির পৌর্বাপর্য, শিক্ষা, ধর্মমত, কাব্যের চরিত্র বিশ্লেষণ, অঙ্ক বা সর্গবিশেষের শ্রেষ্ঠতা বিচার, কাব্যে বর্ণিত সমাজচিত্র, লৌকিক উপাদান,

নামকরণ বিচার, ছন্দ-বিশ্লেষণ, অলংকারবিচার, কাব্যগুলিতে সুভাষিত-শ্লোক, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করা যায়।

চতুর্থত- ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনচর্চায় আচার্যদেব যে টীকাগ্রন্থগুলি রচনা করেন তার স্বকীয়তা বিষয়কে অবলম্বন করে একটি অনবদ্য শোধ-কার্য হতে পারে, ন্যায়-বৈশেষিক যে টীকাগ্রন্থগুলির গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভটি বিশেষ সহায়ক হবে।

পঞ্চমত- বলা বাহুল্য কাশ্যপকবির পত্রিকাকৃত রচনাগুলির উপর একটি গবেষণা হতে পারে, উক্ত শোধকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে দেখা গেছে এ বিষয়ে প্রায় শতাধিক রচনা পাওয়া যাবে। সেখানে শোকবার্তামূলক রচনা, কবিসমালোচনা, জীবনবৃত্তান্ত, গ্রন্থসমালোচনা, বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য, ভ্রমণমূলক রচনা, মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ, স্বকীয় কাব্য, স্তোত্ররচনা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

উপসংহারের পরিশেষে বলা যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় একজন অসামান্য পণ্ডিত ও কৃতি বিদ্যার্থী থেকে অধ্যাপক, তা তাঁর উক্ত সারস্বত সাধনাগুলি পর্যালোচনা করলেই সহজেই বোঝা যায়। প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ স্তরে তিনি আসীন হয়েও সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বঙ্গগৌরব এই পণ্ডিত ব্যক্তির খ্যাতি সারা ভারতবর্ষ অতিক্রম করে বিদেশেও বিস্তৃত হয়েছিল, হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্যানিয়েন ইঙ্গল সাহেব তর্কাচার্য মহাশয় সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কাশ্যপকবিকে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য সম্মান জ্ঞাপন করেছেন বঙ্গের প্রখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিতগণ। সরকার তর্কাচার্য মহাশয়ের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সম্মান ও পারিতোষিক প্রদান করেছেন। কাশির ধর্ম্মমহামণ্ডল থেকে অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথোচিত

সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করে গৌরবান্বিত করেছেন। সুতরাং তিনি অদ্যপি সকল পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীদের মননে স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন তাঁর সারস্বত অবদানের জন্য একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের দর্শন বিষয়ক প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ					
ক্রমিক সংখ্যা	**গ্রন্থনাম ও গ্রন্থলেখক**	**তর্কাচার্যকৃত ব্যাখ্যা ও টীকা**	**প্রকাশস্থান**	**প্রথম প্রকাশকাল**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপঃ,* (মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন)	বঙ্গভাষায় *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা	সংস্কৃত কলেজ	১৯৫৬	এশিয়াটিক সোসাইটি,সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
২	*ভাষারত্নম্,* (কণাদ-তর্কবাগীশ)	*রত্নলক্ষ্মী* টীকা	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্	১৯৩৫	এশিয়াটিক সোসাইটি,সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
৩	*মুক্তিবাদঃ,* (গদাধরভট্টাচার্য)	*মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্	১৯২৪	এশিয়াটিক সোসাইটি,সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
৪	*প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* (প্রশস্তপাদাচার্য্য) জগদীশতর্কালংকার-কৃত *সূক্তিভাষ্য*	*সূক্তিদীপিকা*	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্	১৯৬৪	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্, সংস্কৃত কলেজ
৫	*মুক্তিবাদবিচারঃ* (হরিরামতর্কবাগীশ)	*মুক্তিলক্ষ্মী*	সংস্কৃত কলেজ	১৯৫৯	সংস্কৃত কলেজ
৬	*শব্দার্থসারমঞ্জরী* (জয়কৃষ্ণ-তর্কাচার্য)	*সারদীপিকা*	ছাত্র পুস্তকালয়	১৯৩৫	সংস্কৃত কলেজ
৭	*ন্যায়দর্শনবিন্দুঃ* (তর্কাচার্য মহাশয়)		বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬৭	এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার
৮	*অক্ষপাদ-দর্শনম্,* (সায়ণ-মাধবাচার্য)	বঙ্গভাষায় *পাদপ্রদীপ* ব্যাখ্যা	সংস্কৃত কলেজ	১৯৭৫	সংস্কৃত কলেজ
৯	*সাংখ্যসারঃ,* (বিজ্ঞানভিক্ষু)	*সারপ্রভা*	ছাত্র পুস্তকালয়	১৯৩৫	সংস্কৃত কলেজ
১০	*সাংখ্যকারিকা* (ঈশ্বরকৃষ্ণ)	*ভাষ্যপ্রভা*	ছাত্র পুস্তকালয়		সংস্কৃত কলেজ

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের কাব্য-সাহিত্য বিষয়ক প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ

মহাকাব্য				
ক্রমিক সংখ্যা	**মহাকাব্যের নাম**	**প্রকাশস্থান**	**প্রকাশকাল**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*সত্যানুভাবম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯৬৭	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্
২	*যোগিভক্তচরিতম্*	নগেন্দ্র মঠ।		সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্

দৃশ্যকাব্য				
ক্রমিক সংখ্যা	**দৃশ্যকাব্যের নাম**	**প্রকাশস্থান**	**প্রকাশকাল**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*নল-দময়ন্তীয়ম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯২৫	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্
২	*প্রশান্তরত্নাকরম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯৩৯	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্
৩	*মাণবক-গৌরবম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯৫৮	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
৪	*স্যমন্তকোদ্ধারম্*(ব্যায়োগ)	প্রণবপারিজাত পত্রিকা		সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্

খণ্ডকাব্য				
ক্রমিক সংখ্যা	**খণ্ডকাব্যের নাম**	**প্রকাশস্থান**	**প্রকাশকাল**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯৭১	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
২	*আলোকতিমিরবৈরম্*	নিউদিল্লী	১৯৬০	সাহিত্য একাডেমী

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের অনূদিত প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ				
ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থনাম	প্রকাশস্থান	প্রথম প্রকাশকাল	বর্তমান প্রাপ্তিস্থান
১	*গীতাঞ্জলিঃ,* সমগ্র গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ	বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ	১৯৬৪	বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
২	*শ্রীশ্রীচণ্ডী,* অমিত্রাক্ষরছন্দে বঙ্গভাষায় অনুবাদ	কলকাতা (দক্ষিণেশ্বর) বালিকাশ্রম, আদ্যাপীঠ,	১৯৯১	জাতীয় গ্রন্থাগার
৩	*গীতাপ্রতিচ্ছায়া,* সম্পূর্ণ গীতার বঙ্গভাষায় অনুবাদ	*দেবযান* পত্রিকা ও সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার	১৯৯৮	অনুপলব্ধ
৪	*যুগলাঙ্গুরীয়ম্,* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংস্কৃত অনুবাদ	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্	১৯৬৬	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্

তর্কাচার্য মহাশয়কৃত রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ				
১ পরিশোধঃ	২ প্রস্থান-অভিশাপঃ	৩ গান্ধারীর আবেদন(গান্ধার্যাবেদনম্)	৪ *মেঘদূতম্*	৫ কুমারসম্ভবং শাকুন্তলঞ্চ
৬ দেবতাগ্রাসঃ	৭ নির্ঝর-স্বপ্নভঙ্গঃ	৮ যথার্থ-আত্মীয়ঃ	৯ বিহগ-যুগলম্	১০ *রামায়ণম্*
১১ বৃষ্টির্নিপততি টাপ্-টুপ্-কারম্	১২ পুরস্কারঃ	১৩ প্রস্থানাভিশাপম্		

অন্যান্য অনুবাদ ও সংস্কৃত রচনা				
১ দত্তা	২ সারস্বতঃ কাব্যপুরুষঃ	৩ঈশাভিবন্দনম্	৪ শুভাশংসনম্	৫ মাধবী প্রকৃতিঃ
৬বিরহিণীবিলাপঃ	৭ মধুরপ্রয়াণম্	৮ শুভাশংসনম্	৯নিদাঘপ্রকৃতিচ্ছায়া	১০বর্ষাপ্রথমবিভ্রমম্
১১ ভগবদন্বীক্ষা	১২কৌতুককথা	১৩ মুরলীরবঃ	১৪ শারদী	১৫ ঘনাগমঃ
১৬ বসন্তপ্রকৃতিঃ	১৭হেমন্তসুষমা-গাঁথা	১৮শারদযমকম্	১৯ বসন্তযমকম্	২০শারদমাতৃপুজা

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থ				
ক্রমিক সংখ্যা	**গ্রন্থনাম ও রচনাকার**	**তর্কাচার্যকৃত টীকা**	**রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশস্থান**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*মেঘদূতম্*(কালিদাস)	*মেঘপ্রভা*	১৯৩৪, ছাত্র পুস্তকালয়	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার
২	*মালবিকাগ্নিমিত্রম্*(কালিদাস)	*বিজয়া*	১৯৩৭, ছাত্র পুস্তকালয়	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার
৩	*দশকুমারচরিতম্*(দণ্ডী)	*জয়া*	১৯৩৭, ছাত্র পুস্তকালয়	গোলপার্ক, রামকৃষ্ণমিশন ইন্সিটিউট অফ কালচার
৪	*মহানাটকঃ* (হনুমান)	*তত্ত্বদীপিকা*	১৯৫৫, সংস্কৃত	গোলপার্ক,

			বুক ডিপো	রামকৃষ্ণমিশন
৫	*বিষ্ণুপুরাণম্*	*বিষ্ণুপ্রভা* পাদটীকা	১৯৬৬	গোলপার্ক, রামকৃষ্ণমিশন ইন্সিটিউট অফ কালচার
৬	*বেণীসংহারম্* (ভট্টনারায়ণ)	*কঙ্কতিকা*	১৯৫৫,সংস্কৃত বুক ডিপো	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রকীর্ণ রচনাসমূহ				
ক্রমিক সংখ্যা	**গ্রন্থনাম/রচনা**	**গ্রন্থ-প্রকৃতি**	**রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশস্থান**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*অনুবাদনবোদয়ঃ*	সংস্কৃতের নবীন বিদ্যার্থীদের অনুবাদ শিক্ষার নিমিত্ত বিরচিত	ছাত্র পুস্তকালয়	গোলপার্ক, রামকৃষ্ণমিশন ইন্সিটিউট অফ কালচার
২	*কাব্যচিন্তা*	কাব্যসমালোচনাত্মক গ্রন্থ	১৯৩০, ছাত্র পুস্তকালয়	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার
৩	মহর্ষি নগেন্দ্র স্মারক গ্রন্থ	নগেন্দ্র-ধ্যান ও নগেন্দ্র-স্তোত্রমন্ত্র রচনা	১৯৮১,নগেন্দ্র মঠ	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার
৪	আদ্যামায়ের ধ্যানমন্ত্র রচনা	স্তোত্ররচনা	১৯৯১	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার

৫	ভূমিকা ও গ্রন্থপ্রশংসা রচনা	ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সংস্কৃত অনুবাদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মুক্তধারা*	১৯৮৮	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার
৬	প্রশস্তিবাক্য	অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়		*প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটক

Bibliography:

Ānandavardhanācārya. *Dhvanyāloka*. Ed. Bishnupada Bhattacharyya. Kolkata: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1957 (1st ed.).

…... Ed. Subodh Sengupta and Kalipada Bhattacharyya. Kolkata: A Mukharjee and Kong limited, 1950 (1st ed.).

Annaṃbhaṭṭa. *Tarkasaṃgraha*. (with *Dīpikā* Commentary). Ed. Narayan Chandra Goswami. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1423 B.S (Re.ed., 1410 1st ed.).

….. Ed. Rajendranath Ghosh. Kolkata: Gajet Press, 1932 (1st ed.).

Bandopadhyaya, Haricharan. *Baṅgīya śabdakoṣa:*Bengali-Bengali lexicon. Vol.2. New Delhi: Sahitya Academy, 2016 (9th ed., 1933 1st Pub.).

Banerjee, Manabendu, Karunasindhu Das. *Contribution of the Traditional Pandits of Bengal, Towards growth, Nourishment and Development of Sanskrit Studies*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 2012 (1st ed.).

Banerjee, Satya Ranjan & Manabendu Banerjee. *Essai Sur la Indologica*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 2009 (1st pub.).

Banerjee, Suresh Chandra. *A Companion to Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarsidass, 2016 (Rpt., 1971 1st ed.).

….. *Saṃskṛta Sāhitye Bāṅgālīra Dāna*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1369 B.S.

Bhattacharya, Sibjiban and Karl. H. Potter. *Encyclopedia of Indian Philosophies: Indian Philosophical Analysis Nyāya Vaiśeṣika from Gangesa to Raghunath Siromani.*Vol.6. Delhi: Motilal Banarsidass, 1993.

….. *Encyclopedia of Indian Philosophies: Nyāya-vaiśeṣika Philosophy From 1515 to 1660*, Vol.8. Delhi: Motilal Banarsidass, 1977.

Bhattacharyya, Bimalkrishna and Sajal Chowdhury. *Racanā-Saṃgraha*. Kolkata: Sarasvata Samaj, 1966 (1st ed.).

Bhattacharyya, Dinesh Chandra and Srimohan Bhattacharyya. *Bhāratīya Darśana koṣa.*Vol.1. Kolkata: Sanskrit College, 1958 (1st ed.).

Bhattacharyya, Dinesh Chandra. *Vaṇge Navyanyāyacarcā*. Vol.1. Kolkata: Bangiya Sahitya Parishat, 2019 (3rd ed., 1965 1st ed.).

Bhavānanda-siddhāntavāgīśa. *Tattvacintāmaṇi-Dīdhiti-Prakāśa.*Vol.2. Ed. Kālīpada Tarkācārya. Kolkata: The Asiatic Society, 1963 (1sted.).

Bhaṭṭanārāyaṇa. *Veṇīsaṃhāram*. Ed. Kālīpada Tarkācārya. Kolkata: Sanskrit Book Depo, 2016.

Bhattacharyya, Bishnupada. *Sāhitya-mīmāṃsā*. Kolkata: Visva-Bharati Granthana Vibhaga, 1960 (1st ed.).

Bhattacharyya, Hemchandra. *Vaṅgīya Mahāmahopādhyāya jībanī*. Kolkata: Sidhanta Vidyalaya, 1972 (1st ed.).

Chowdhury, Sajal. *Mahāmahopādhyāyas Of India*. Kolkata: Devalaya, 2016.

Catalogue Of The Printed Books In The Sanskrit College Library. Kolkata: The Bengal Secretariat Book Depot, Sanskrit College, 1919.

Chattopadhyay, Rita. *20th Century Sanskrit Literature*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 2008 (1st ed.).

…... Ś*atavarṣe Kabi Nityānanda.* Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2021 (1st ed.).

Daṇḍī. *Daśakumāracarita*. Ed. Kālīpada Tarkācārya and Gurupada Bhattacharya with Sans. Comm. *Jayā*. Kolkata: Chatra Pustakalaya, 1935 (1st ed.).

….. *Kāvyādarśa*. Ed. Chinmoyee Chattopadhyay. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2018 (2nd ed., 1985 1st ed.).

Das, Karunasindhu. *Sanskrit-sahitya-parishat-patrika*. Vol.92. Kolkata: Sanskrit-sahitya-parishat, 2009-2010.

Dasgupta, Surendranath. *Kāvya-vicāra*. Kolkata: Mitra and Ghosh, 1939 (1st pub.).

Dutta, Satyendranath. *Kāvya sañcayana*. Kolkata: M. C. Sarkar and Sons.

Dutta, Kali Kumar. *Bengal's Contribution to Sanskrit Literature*. Kolkata: Sanskrit College, 1974.

Gadadhara-Bhattacharyya. *Nava-Muktivāda*. Ed. Kālīpada Tarkācārya with Sans. Own Comm. *Mukti-dīpikā*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1924 (1st ed.).

Gaṅgeśopādhyāya. *Tattvacintāmaṇi: Vyāptipañcakam*. Ed. Rajendranath Ghosh. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2011 (2nd ed., 1982 1st ed.).

Gautama. *Nyāyadarśana*. Ed. Phanibhusana Tarkavagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2018 (3rd ed., 1961 1st Pub.).

Gupta, Sanjukta. *Studies in the Philosophy Of Madhusudana Saraswati*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1966 (1st ed.).

Īśvarakṛṣṇa. *Sāṃkhyakārikā*. Ed. Rakesh Sastri. Delhi: Sanskrit Granthagara, 1998 (1st ed.).

Jagadīśa-Tarkālaṃkāra. *Tarkāmṛta*. Ed. Rajendranath Ghosh. Kolkata: Kalika press, 1918 (1st ed.).

Jayakṛṣṇa-tarkālaṃkāra. *Sāramañjarī*. Ed. Kālīpada Tarkācārya with Sans. Own Comm. *Sāradīpikā*. Kolkata: Chatra Pustakalaya, 1935 (1st ed.).

Jha, V. N. *Sanskrit Writings in Independent India*. New Delhi: Sahitya Academy, 2003.

Kaṇāda-tarkavāgīśa. *Bhāṣāratnam*. Ed. Kālīpada Tarkācārya with own Sans. comm. *Ratnalakṣmī*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1935 (1st ed.).

Kālidāsa. *Meghadūtam*. Ed. Kālīpada Tarkācārya and Gurupada Bhattacharyya with Sans. Comm. *Meghaprabhā*. Kolkata: Chatra Pustakalaya, 1934 (1st ed.).

Kauṭilya. *Arthaśāstra*. Ed. Radhagobinda Basak. Kolkata: Sanskrit Book Depo, 2015 (Rpt., 1964 1st ed.).

Krishnamoorthy, K. *Essays in Sanskrit Criticism*. Karnatak: Karnatak University, 1964.

Krishnamacharian, M. *History of Classical Sanskrit Literature*. Madras: Tirumalai Tirupati Devasthanams Press, 1937.

Kuntakācārya. *Vakroktijīvita*. Ed. Radhesyama Misra. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 1980 (1st ed.).

Maheśa-chandra-nyāyaratna. *Navyanyāya-bhāṣāpradīpa*. Ed. Kālīpada Tarkācārya with the Comm. *Suprabhā.* Kolkata: Sanskrit College, 1956 (1st Pub.).

Mukhopadhyaya, Gobindagopal. *A New Tri-lingual Dictionary*. Kolkata: Sanskrit Book Depo. 2022 (Rpt., 1966 1st ed.).

Praśastapādācārya. *Praśastapādabhāṣya* with *Sūkti* on the Bhāṣya by Jagadīśa Tarkālaṃkāra Ed. Kālīpada Tarkācārya with Sans. Own Comm. *Sūktidīpikā*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1925 (1st ed.).

Raghunathacharya, S. B. *Modern Sanskrit Literature: Tradition and Innovations*. New Delhi: Sahitya Academi, 2009 (Rpt., 2002 1st pub.).

Rājaśekhara. *Kāvyamīmāṃsā*. Ed. Bishnupada Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depo.

Rāḍhī, Kānticandra. *Navadvīpa-Mahimā*. Ed. Jitendranath Dutta and Phanibhusan Dutta. Navadwip: Kanti Press, 1937 (1st ed.).

Sastri, Satya Vrat. *Discover of Sanskrit Literature: Modern Sanskrit Literature*. New Delhi: Yash Publication, 2006.

Sāyaṇa-mādhavācārya. *Akṣapāda-darśanam*. Ed. Kālīpada Tarkācārya with the Comm. *Pādapradīpa*. Kolkata: Sanskrit College, 1975 (1st Pub.).

..... Ed. Vasudeva Sastri. Mumbai: Nirnaya Sagar Press, 1924 (1st ed.).

Sastri, Ramdhan. *Sanskrit-sahitya-parishat-patrika*.Vol.56. Kolkata: Sanskrit-sahitya-parishat, 1973.

Srīsrīcaṇḍī. Ed. Bela Devi with Beng. Trans. by Kālīpada Tarkācārya. Kolkata: Dakshineswar Balikasrama, Adyapeath, 1991 (1st Pub.).

Tarkācārya, Kālīpada. *Praśānta-Ratnākaram*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1939 (1st ed.).

…..*Ālokatimiravairam*. Ed. V. Raghavan. *Sanskrit-Pratibha* Journal.Vol.2. New Delhi: Sahitya Academy, 1960.

….. *Anuvādanavadaya*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2020 (Rpt.).

….. *Jatibādhakvicāra*. *Sanskrit Sahitya Parishat Patrika*.Vol.5. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat.

….. *Kāvya-cintā*. Kolkata: Chatra Pustakalaya, 1934 (1st ed.).

….. *Mandākrāntāvṛttam*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1971 (1st ed.).

….. *Māṇavaka-gauravam*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1958 (1st ed.).

….. *Naladamayantīyam*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1925 (1st ed.).

….. *Nyāyadarśanvindu*. Varanasi: Varanasi Sanskrit University, 1964 (1st ed.)

….. *Nyāyaparibhāṣā*. Ed. Gaurinath Sastri. Kolkata: Sanskrit College, 1966.

….. *Satyānubhāvam*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1967 (1st ed.).

….. *Yogibhakta-caritam*. Kolkata: Nagendra Math.

Tripathi, Radhavallabh. *Sixty Years of Sanskrit Studies (1950-2010*). New Delhi: Rashtriya Sanskrit Sansthan, 2012 (1st pub.).

Tagore, Rabindranath. *Sāhityera Svarūp*. Kolkata: Visva-Bharati Granthana Vibhaga, 2013 (Rpt., 1st ed.1964).

….. *Gītāñjali* Sans. Trans. by Kālīpada Tarkācārya. Kolkata: Visva-Bharati Granthana Vibhaga, 2017 (2nd ed., 1st ed.1964).

….. Sans. Trans. by Amarendramohan Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2001 (Rpt.).

Upaniṣad-granthāvalī. Ed. Swami Gambhirānanda. Vol.1. Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 2018 (Rpt. 1964 5th ed.).

Vidyābhūṣaṇa. Viśveśvara. *Kāvya-Kusumāñjali*. Rishi Dham: Shastra Bhagavan Press,1980 (1st Pub.).

Viñjāna-Bhikṣu. *Sāmkhyasāra*. Ed. Kālīpada Tarkācārya and Gurupada Bhattacharyya. Kolkata: Chatra Pustakalaya, 1935 (1st ed.).

Vyāsadeva. *Viṣṇu-purāṇam*. Sanatansastra Patrika. Vol.1. Ed. Kālīpada Tarkācārya and Gaurinath Sastri with own Sans. Comm. *Viṣṇuprabhā.* Kolkata: Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya, 1966.

….. *Mahābhārata*. Ed. Haridāsa-Sidhāntavāgīśa. Vol.1. Kolkata: Visvavani Prakasani, 1935 (1st ed.).

Viśvanāthanyāyapañcānana. *Bhāṣā-Pariccheda.* Ed. Panchanana Bhattacharyya. Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 2016 (Rpt., 1970 1st Pub.).

Viśvanātha-kavirāj. *Sāhityadarpaṇa*. Ed. P.V. Kane. Mumbai: Nirnaya Sagar Press, 1956 (4th ed., 1951 1st ed.).

SANAD

To

Pandit Kalipada Tarkacharyya,
Lecturer in Nyaya, Tol Department, Sanskrit College,
Calcutta, Bengal.

I hereby confer upon you the title of Mahamahopadhyaya as a personal distinction.

New Delhi,
The 1st January 1941.

Viceroy of India

১৯৪১ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় শংসাপত্র

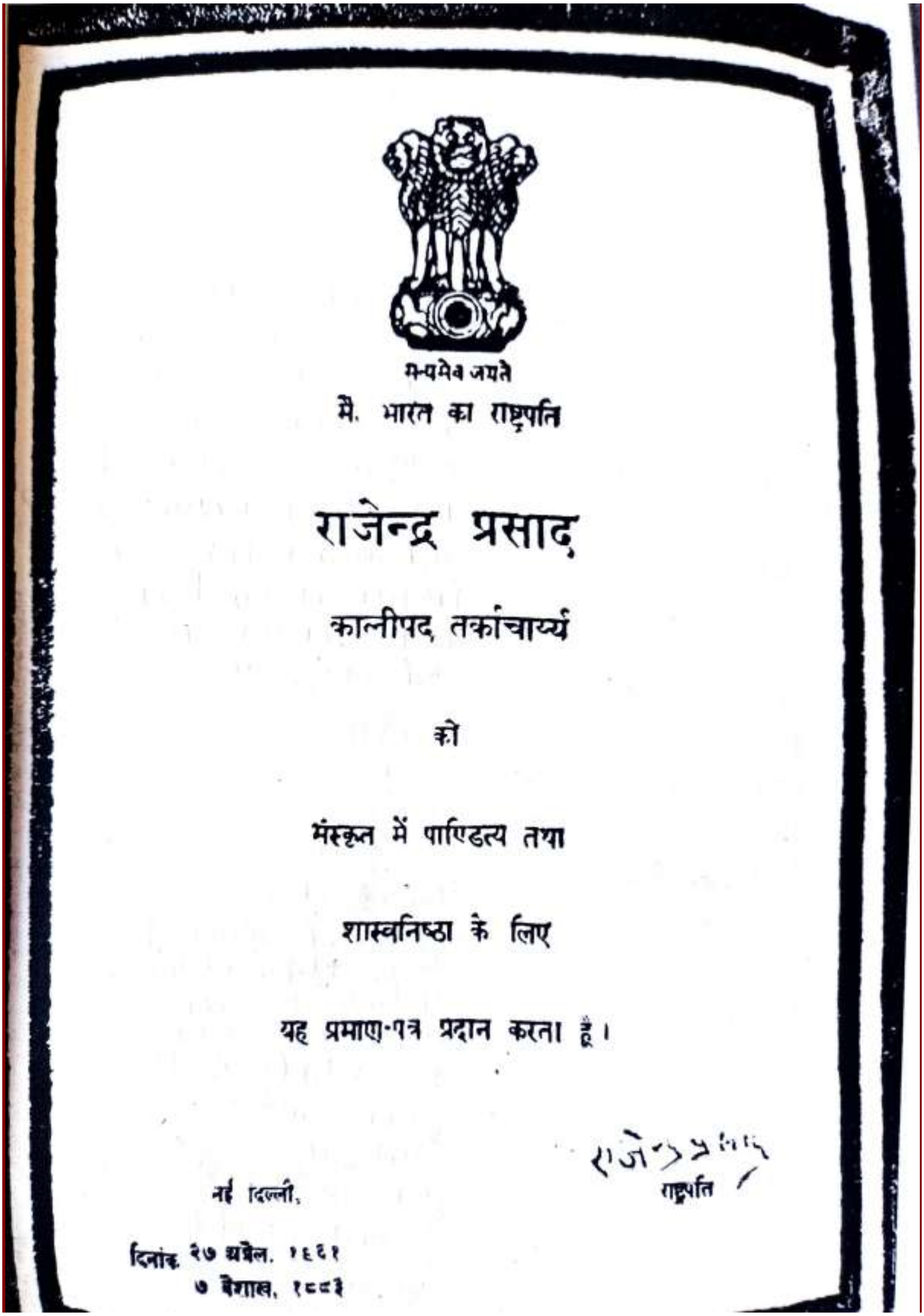

सत्यमेव जयते

मैं, भारत का राष्ट्रपति

राजेन्द्र प्रसाद

कालीपद तर्कांचार्य्य

को

संस्कृत में पाण्डित्य तथा

शास्त्रनिष्ठा के लिए

यह प्रमाण-पत्र प्रदान करता हूं।

राजेन्द्र प्रसाद

राष्ट्रपति

नई दिल्ली,

दिनांक २७ अप्रैल, १९६१

७ वैशाख, १८८३

১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রদত্ত শংসাপত্র

Certificate of Honour in Sanskrit

Sri Kalipada Tarkacharya

Shri Kalipada Tarkacharya, Senior Professor in the Research Department, Sanskrit College, Calcutta, is a renowned Sanskrit Scholar. In his scholastic career, he distinguished himself in the studies of KAVYA, VYAKARAN, NYAYA and SANKHYA. He has been the President of the Howrah Sanskrit Samaj and Professor of the Sanskrit Sahitya Parishad. He is also now the Editor of "Sanskrit Sahitya Parishad Patrika" and "Sanskrit Padya Bani Patrika." Shri Tarkacharya has published a number of Mahakavyas, Khandakavyas, Dramas, Essays and Tikas. He was awarded the title of MAHAMAHOPADHYAYA in 1941.

কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত শংসাপত্র

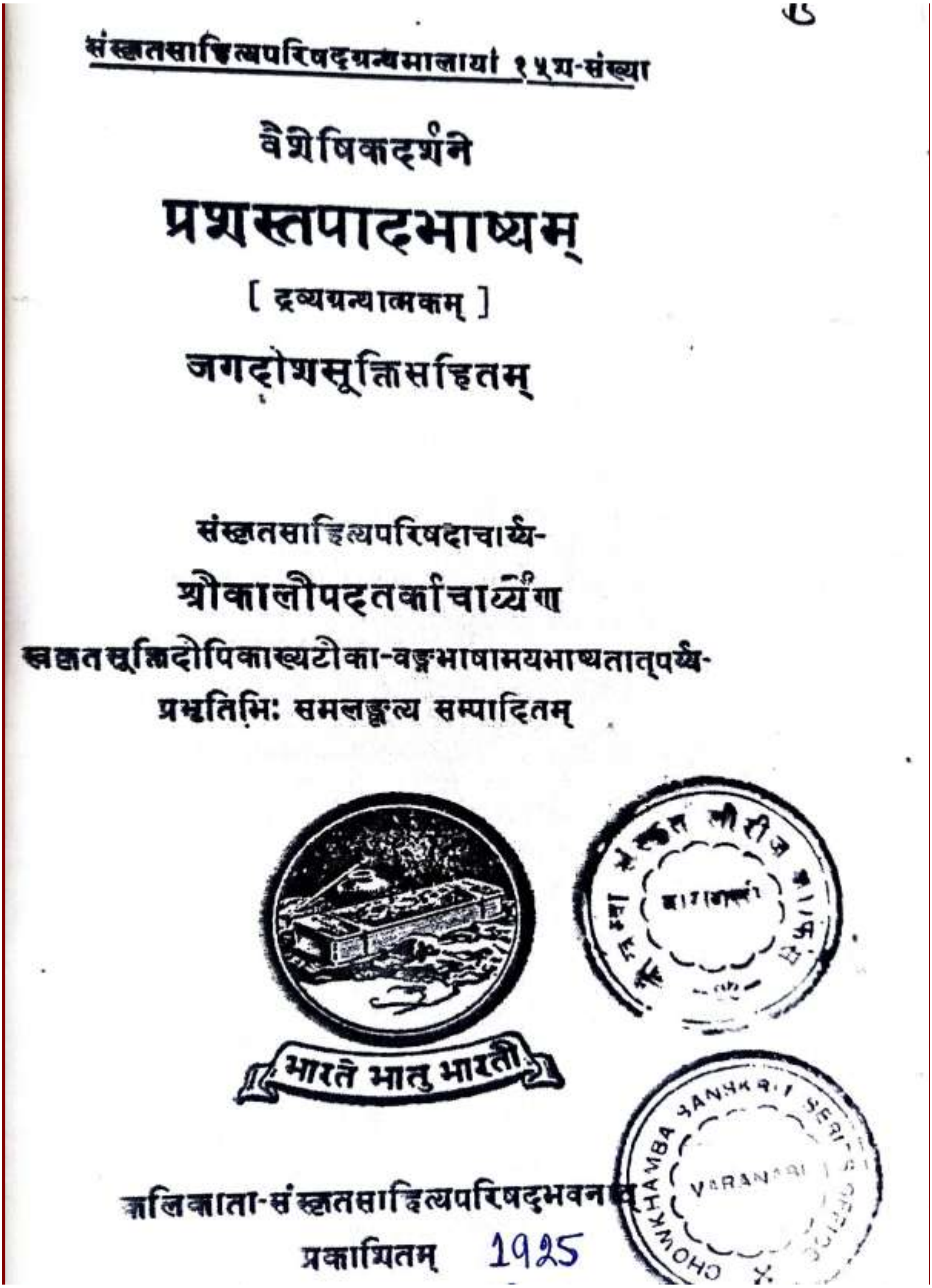
संस्कृतसाहित्यपरिषद्ग्रन्थमालायां १५श-संख्या

वैशेषिकदर्शने

प्रशस्तपादभाष्यम्

[द्रव्यग्रन्थात्मकम्]

जगदीशसूक्तिसहितम्

संस्कृतसाहित्यपरिषदाचार्य्य-

श्रीकालीपदतर्काचार्य्येण

स्वकृतसूक्तिदीपिकाख्यटीका-वङ्गभाषामयभाष्यतात्पर्य्य-

प्रभृतिभिः समलङ्कृत्य सम्पादितम्

कलिकाता-संस्कृतसाहित्यपरिषद्भवनात्

प্রকাশিতম् 1925

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE
VARANASI

১৯২৫ সালে প্রকাশিত *প্রশস্তপাদভাষ্য (সূক্তি* ও *সূক্তিদীপিকা* টীকাসহিত)

SANSKRIT SAHITYA PARISHAD SERIES No. 4

NAVA

MUKTIVADA

BY

Gadadhara Bhattacharyya

WITH THE COMMENNTARY OF

SIVARAMA

Edited with a gloss in Sanskrit and a Purport in Bengali

BY

Kalipada Tarkacharyya

Published by the

SANSKRIT SAHITYA PARISHAD

Shambazar Calcutta.

For Members Re. 1/8 as. **Price 2 Rs.**

গদাধর-ভট্টাচার্য্যের *মুক্তিবাদ*গ্রন্থ (তর্কাচার্যকৃত *মুক্তিদীপিকা* টীকা সহিত)

Calcutta Sanskrit College Research Series No. LXXIX

NAVYANYĀYA-BHĀṢĀPRADĪPAḤ

[BRIEF NOTES ON THE MODERN *NYĀYA* SYSTEM OF PHILOSOPHY AND ITS TECHNICAL TERMS]

By

MAHĀMAHOPĀDHYĀYĀ
MAHEŚA CHANDRA NYĀYARATNA

Edited

With the Commentary 'Suprabhā' and Bengali Translation

By

MAHĀMAHOPĀDHYĀYĀ
KALIPADA TARKĀCHĀRYA

Formerly Assistant Professor of Nyāya,
Government Sanskrit College, Calcutta.

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1956

নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ (তর্কাচার্যকৃত বঙ্গভাষায় *সুপ্রভা* ব্যাখ্যাসহিত)

संस्कृत-साहित्य-परिषद्-ग्रन्थमालायां २०शं-संख्या ।

नव्यन्याये

भाषारत्नम्

(नव्यन्याय-पदार्थप्रतिपादकम्)

श्रीकणाद-तर्कवागीश-प्रणीतम्

—:०:—

कलिकाता-राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालय-न्यायशास्त्रान्यतराध्यापक-

श्रीकालीपदतर्काचार्य्येण

स्वकृतटीकाभूमिकादिभिः समलङ्कृत्य सम्पादितम्

कलिकातास्थ-संस्कृत-साहित्य-परिषद्भवनात्

प्रकाशितम् ।

ভাষারত্ন গ্রন্থ (তর্কাচার্য প্রণীত *রত্নলক্ষ্মী* টীকাসহিত)

विब्लिओथिका इण्डिका ग्रन्थमालायां
१६४ संख्यकोग्रन्थः

तत्त्वचिन्तामणि दीधितिप्रकाशः

श्रीभवानन्दसिद्धान्तवागीश विरचितः
(तत्त्वचिन्तामणिना तत्त्वचिन्तामणिदीधित्या च समेतः)

अनुमान खण्डे

द्वितीयो भागः

(तर्कप्रकरणात् पक्षताप्रकरणं यावत्)

महामहोपाध्याय श्रीकालीपद तर्काचार्य
सम्पादित

एसियाटिक् सोसाइटि समित्या प्रकाशितः
कलिकाता
१ पार्क ष्ट्रीट् भवनतः

তর্কাচার্য কর্তৃক ১৯৬৩ সালে সম্পাদিত *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ* গ্রন্থ

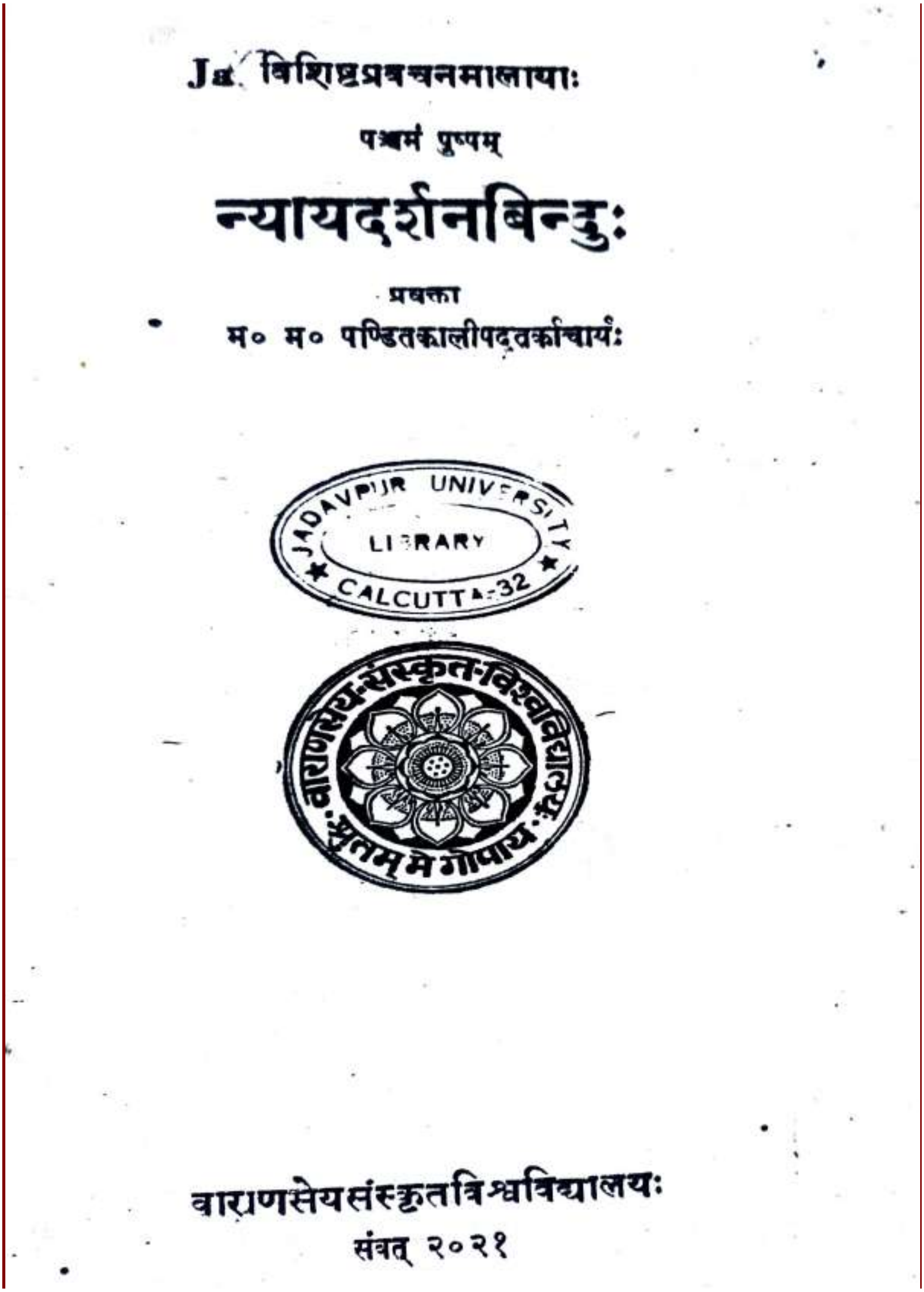

J4. विशिष्टप्रवचनमालायाः

पञ्चमं पुष्पम्

न्यायदर्शनबिन्दुः

प्रवक्ता
म० म० पण्डितकालीपदतर्काचार्यः

JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY
CALCUTTA-32

वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
संवत् २०२१

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত প্রবচনমালা গ্রন্থ

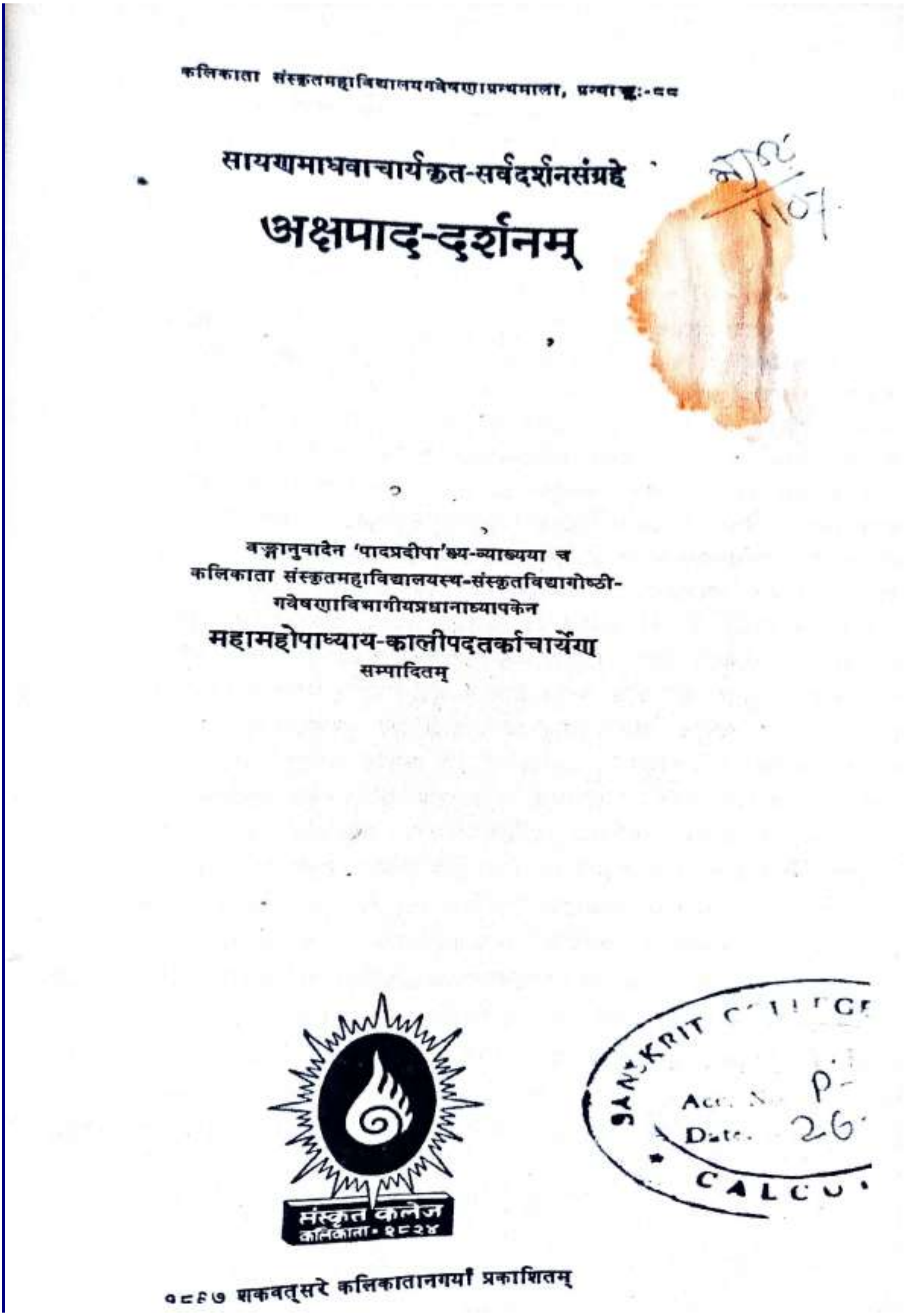

कलिकाता संस्कृतमहाविद्यालयगवेषणाग्रन्थमाला, ग्रन्थाङ्कः-८८

सायणमाधवाचार्यकृत-सर्वदर्शनसंग्रहे

अक्षपाद-दर्शनम्

वङ्गानुवादेन 'पादप्रदीपा'ख्य-व्याख्यया च
कलिकाता संस्कृतमहाविद्यालयस्थ-संस्कृतविद्यागोष्ठी-
गवेषणाविभागीयप्रधानाध्यापकेन
महामहोपाध्याय-कालीपदतर्काचार्येण
सम्पादितम्

SANSKRIT COLLEGE
Acc. No. P-
Date. 26.
CALCU

१८८७ शकवत्सरे कलिकातानगर्यां प्रकाशितम्

অক্ষপাদদর্শন (তর্কাচার্য কর্তৃক বঙ্গভাষায় *পাদপ্রদীপ* ব্যাখ্যা সহিত)

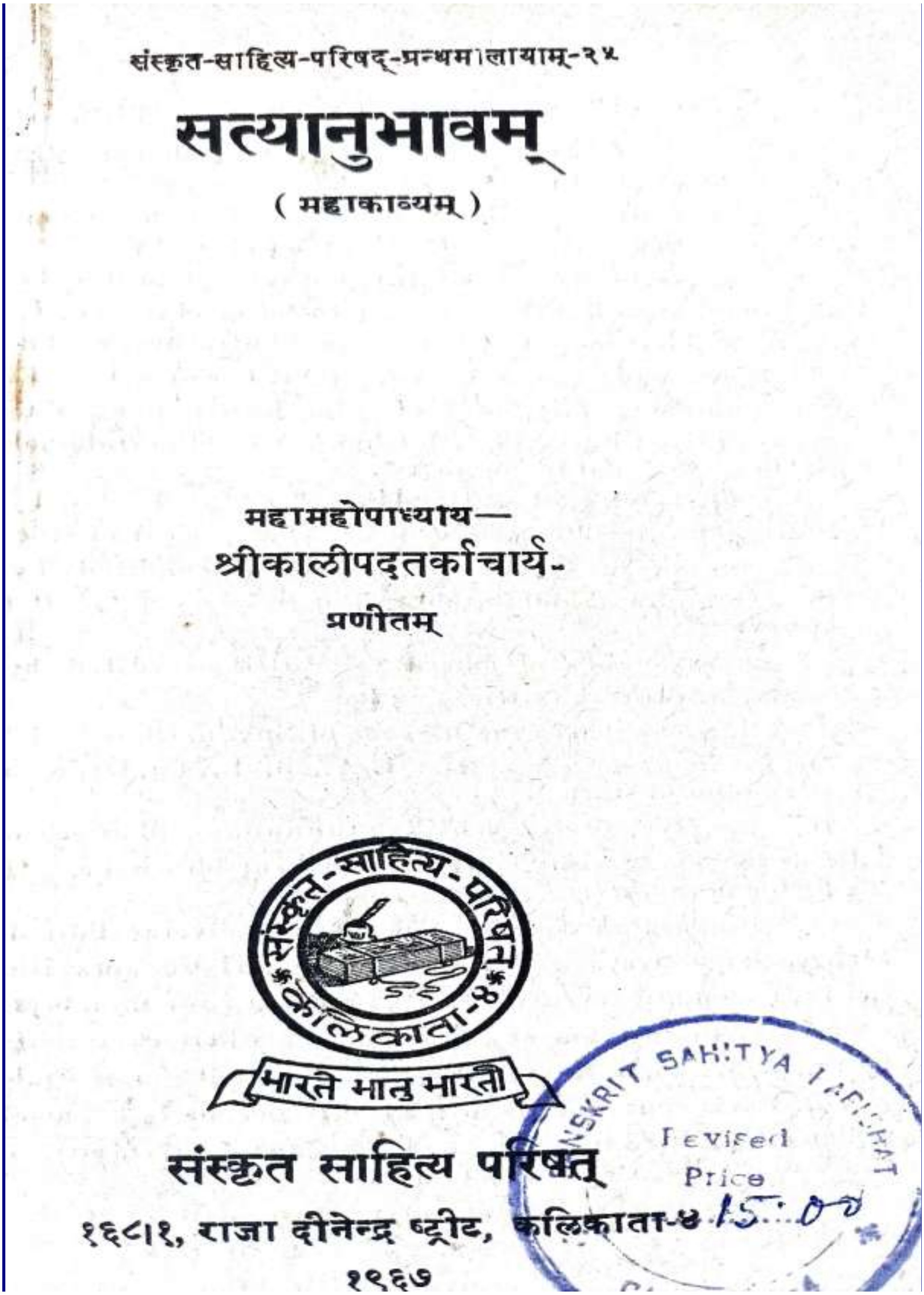
संस्कृत-साहित्य-परिषद्-ग्रन्थमालायाम्-२५

सत्यानुभावम्

(महाकाव्यम्)

महामहोपाध्याय—
श्रीकालीपदतर्काचार्य-
प्रणीतम्

संस्कृत साहित्य परिषत्
१६८।१, राजा दीनेन्द्र ष्ट्रीट, कलिकाता-४

SANSKRIT SAHITYA PARISHAT
Revised
Price 15.00

१९६७

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত *সত্যানুভাবম্* মহাকাব্য

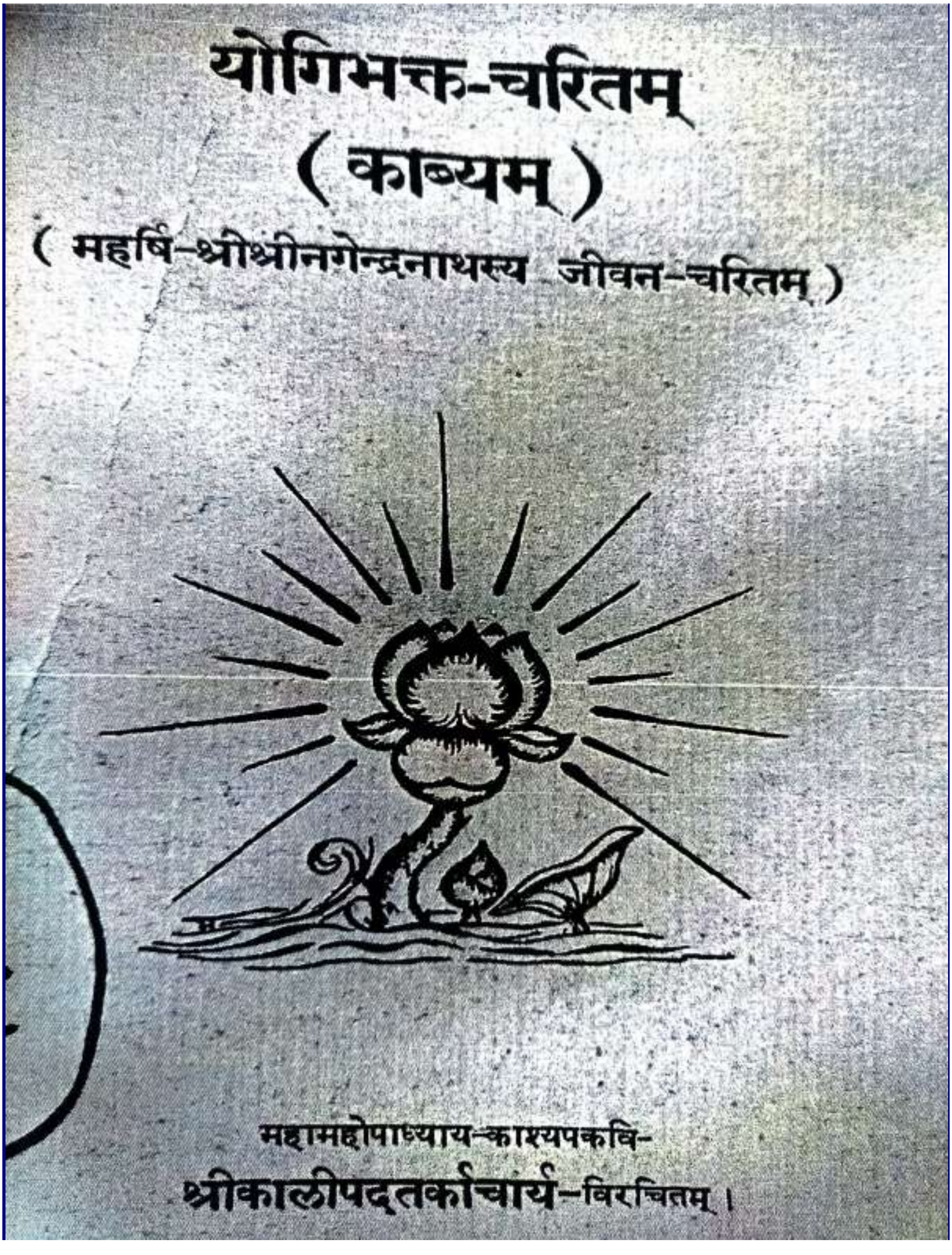

योगिभक्त-चरितम्

(काव्यम्)

(महर्षि-श्रीश्रीनगेन्द्रनाथस्य जीवन-चरितम्)

महामहोपाध्याय-काश्यपकवि-

श्रीकालीपदतर्काचार्य-विरचितम् ।

দ্বিতীয় মহাকাব্য *যোগিভক্তচরিতম্*

Sanskrit Sahitya Parishat Series No. 27

MĀṆAVAKA-GAURAVAM

(A MODERN SANSKRIT DRAMA)

By

Mahāmahopādhyāya

KĀLĪPADA TARKĀCHĀRYA

(Kāśyapakavi)

Published by

SANSKRIT SAHITYA PARISHAT

SHYAMBAZAR : CALCUTTA-4

1958

প্রথম নাটক *মাণবকগৌরবম্*

संस्कृतसाहित्यपरिषद्ग्रन्थमालायां १४श-संख्या

नलदमयन्तीयम्

नाटकम्

संस्कृतसाहित्यपरिषदाचार्य्य-

श्रीकालीपदतर्काचार्य्यविरचितम्

कलिकाता

संस्कृतसाहित्यपरिषद्भवनात् प्रकाशितम्

(১৯২৫)

मूल्यं सपादरूप्यकम् सभ्यानां रूप्यकमात्रम्

দ্বিতীয় নাটক *নলদময়ন্তীয়ম্*

संस्कृत-साहित्य-परिषद्-ग्रन्थमालायाम् २२तम-संख्या

प्रशान्तरत्नाकरम्

(नवीन नाटकम्)

कलिकातास्थ राजकीय-संस्कृत महाविद्यालयान्यतर-
न्यायशास्त्राध्यापकेन

श्रीकालीपद-तर्काचार्येण

प्रणीतम्

भारतं भातु भारती

১৮৭১तमे शकाब्दे
कलिकातान्तर्गत-श्यामबाजारस्थ-
संस्कृत-साहित्य-परिषदा प्रकाशितम्

তৃতীয় নাটক *প্রশান্তরত্নাকরম্*

संस्कृत-साहित्य-परिषद्ग्रन्थमालायां १६ संख्यकग्रन्थः

मन्दाक्रान्तावृत्तम्

खण्डकाव्यम्

काश्यपमहाकवि-महामहोपाध्याय-डि-लिट्-

श्रीकालीपदतर्काचार्य्य—

प्रणीतम्

प्रकाशकालः

१३७८ बङ्गाब्दे (१९७१ खृष्टाब्दे)

महालयादिवसः

প্রথম খণ্ডকাব্য *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*

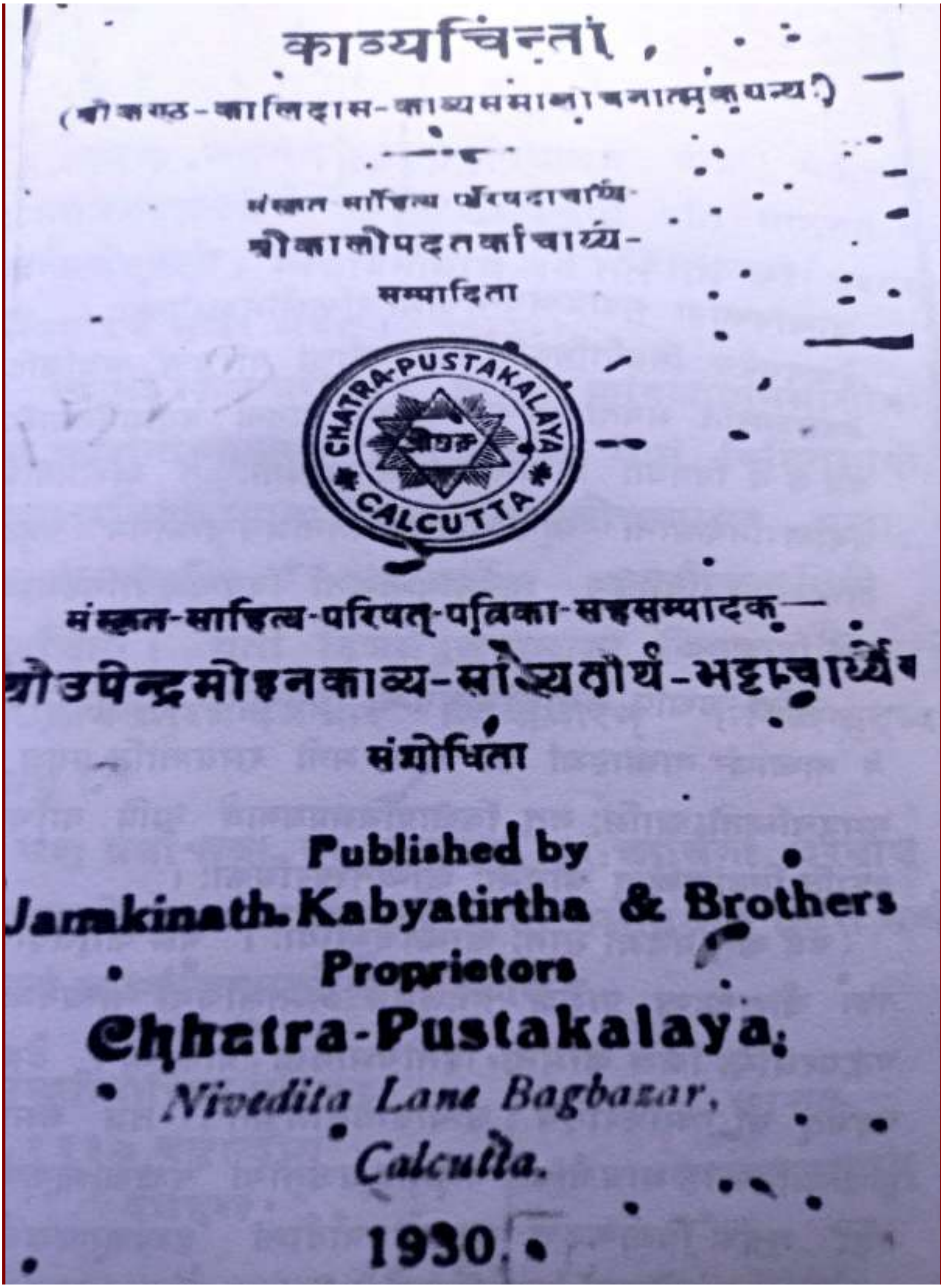

काव्यचिन्ता

(श्रीकण्ठ-कालिदास-काव्यसमालोचनात्मकग्रन्थः)

संस्कृत साहित्य परिषदाचार्य-

श्रीकालीपदतर्काचार्य्य-

सम्पादिता

CHATRA-PUSTAKALAYA CALCUTTA

संस्कृत-साहित्य-परिषत्-पत्रिका-सहसम्पादक—

श्रीउपेन्द्रमोहनकाव्य-सांख्यतीर्थ-भट्टाचार्य्येण

संशोधिता

Published by

Janakinath Kabyatirtha & Brothers

Proprietors

Chhatra-Pustakalaya,

Nivedita Lane Bagbazar,

Calcutta.

1930.

১৯৩০ সালে প্রকাশিত কাব্যসমালোচনাত্মক গ্রন্থ *কাব্যচিন্তা*

संस्कृत-साहित्य-परिषद

इतिवृत्तम्

महामहोपाध्याय—श्रीकालीपदतर्काचार्य-
प्रणीतम्

१९६७

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্-ইতিবৃত্তম্*

गीताञ्जलिः

रवीन्द्रनाथकृत-गीताञ्जलि-काव्यस्य संस्कृतानुवादः

महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्काचार्य-कृतः

विश्वभारती

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত সমগ্র *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ

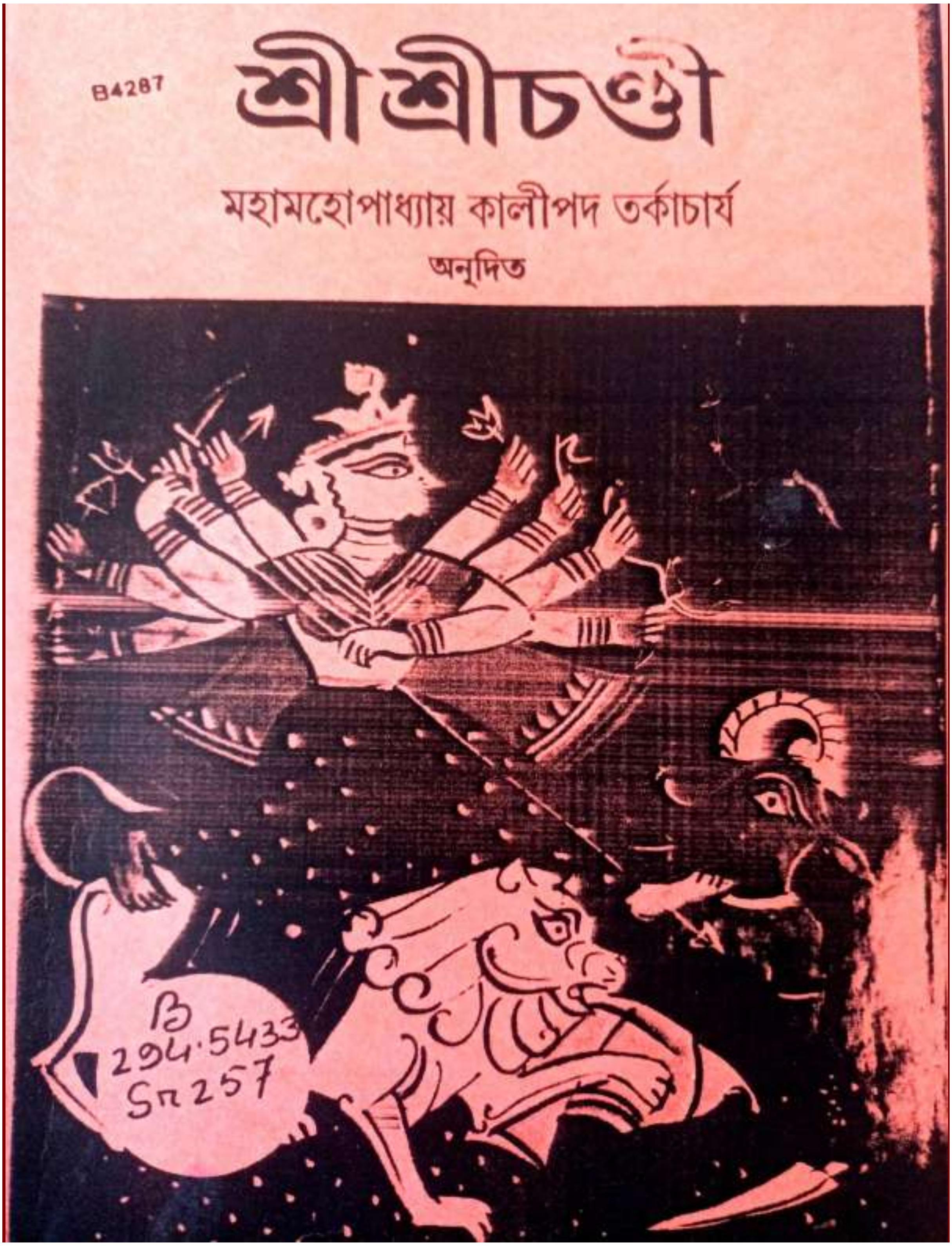

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত *শ্রীশ্রীচণ্ডী* গ্রন্থের বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ

[illegible]

मेघदूतम्

[महाकवि—कालिदास प्रणीतं खण्डकाव्यम्]

[मल्लिनाथ कृत सञ्जीवनी टीका, मेघप्रभा टीका, बङ्गभाषानुवाद, हिन्दी-भाषानुवाद
डा: मि. एच्‌ एच्‌ उइलसन कृतं आङ्गलीय (अंग्रेजी) भाषानुवाद
विस्तृत भूमिकादिना च परिशिष्टैः समलङ्कृतम्]

अध्यापक—

श्रीमद्गुरुनाथविद्यानिधि-भट्टाचार्य्येण

कलिकाता राजकीय संस्कृतमहाविद्यालयाध्यापक

काव्य-व्याकरण-तर्कतीर्थ विद्यानिधि

श्रीकालीपद तर्काचार्य्येण च

सम्पादितम्

Published by

442. KALIPADA TURKACHARYYA

6. CHHATRA PUSTAKALAYA

Nivedita Lane, Baghazar, Calcutta

1934

মেঘপ্রভা টীকাসহিত *মেঘদূতম্* গ্রন্থ সম্পাদনা

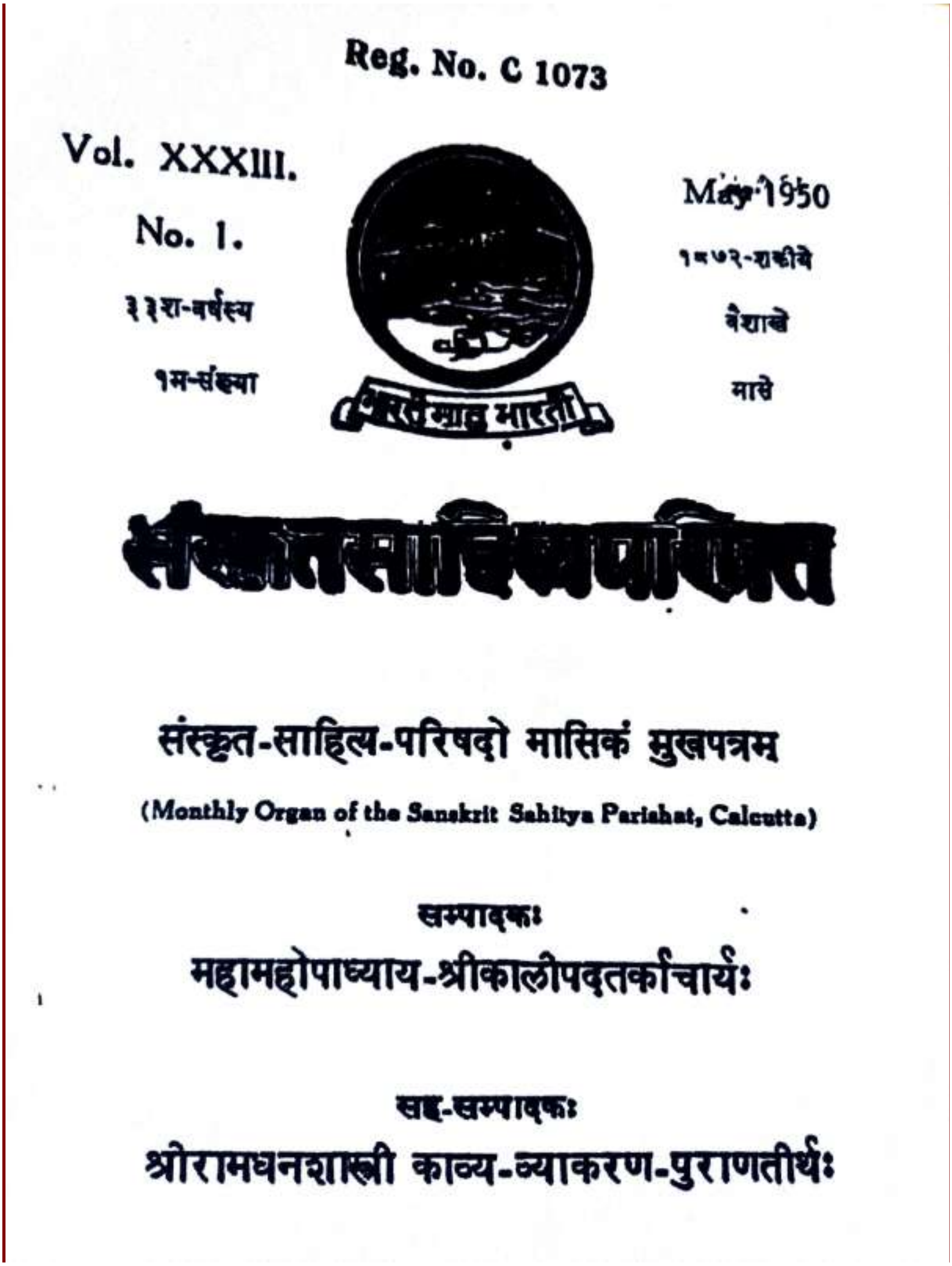

Reg. No. C 1073

Vol. XXXIII.

No. 1.

३३श-वर्षस्य

१म-संख्या

May 1950

१८७२-शकीये

वैशाखे

मासे

संस्कृतसाहित्यपरिषत्

संस्कृत-साहित्य-परिषदो मासिकं मुखपत्रम्

(Monthly Organ of the Sanskrit Sahitya Parishat, Calcutta)

सम्पादकः

महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्काचार्यः

सह-सम्पादकः

श्रीरामधनशास्त्री काव्य-व्याकरण-पुराणतीर्थः

তর্কাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৫০ সালের একটি *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা*

[१३७३ वङ्गाब्दीये प्रथमवर्षे] प्रथमपुष्पम् [श्रीरामनवमीसंख्या, वैशाखमा

सनातनशास्त्रम्

श्रीश्रीमत्सीतारामदासोङ्कारनाथ-प्रवर्त्तितम्

श्रीमन्महर्षिवेदव्यासप्रणीतम्

विष्णुपुराणम्

श्रीश्रीधरस्वामिकृतात्मप्रकाशाभिधटीकोपेतम्

महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्काचार्य्यकृतपादटीकासमलङ्कृतम्

सम्पादकाः

महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्काचार्य्यः

डाः श्रीगौरीनाथशास्त्री एम्-ए, डि-लिट्

श्रीनारायणचन्द्रगोस्वामी न्यायाचार्य्यः एम्-ए च

सम्पादकौ

श्रीश्रीजीवन्यायतीर्थः

श्रीयादवेन्द्रनाथन्यायतर्कतीर्थश्च

(1966)

১৯৬৬ সালের *সনাতনশাস্ত্রম্* পত্রিকা

संस्कृतपद्यवाणी

[सचित्रा विचित्रगद्यपद्यमयी त्रैमासिकी संस्कृतपत्रिका]

सम्पादकः—श्रीकालीपदतर्काचार्यः

अस्याः प्राप्तिस्थानम्—संस्कृतपद्यवाणीकार्यालयः

२।१ रामकृष्ण लेन, बाग्‌बाजार, कलिकाता ।

—:०:—

एषा पत्रिका प्रतिवर्षं नियमेन चतुरो वारानात्मानं प्रकाशयति । अत्र विशिष्टशिष्टगोष्ठीसम्मता दर्शनकाव्यालङ्कारादिसम्बन्धिनो निबन्धाः, सुललिताः कविताः, पद्मबन्धादिचित्रकाव्यानि, यमकादिविचित्रपद्यानि, सुप्रसिद्धभाषान्तरीणगद्यपद्यमयकाव्यानुवादाः, बङ्गभाषासंस्कृतभाषयोस्तुल्यरूपा गाथा, बङ्गभाषादिप्रथितच्छन्दसा सुरचिताः संस्कृतकविताः, प्रहेलिका-समस्या-तत्पूरणादयः सामयिकवृत्त-ग्रन्थसमालोचनादयश्च विषया अनुरूपया सरलया मधुरया च संस्कृतभाषया प्रकटीक्रियन्ते । अन्तरान्तरा च प्रथितयशसां महाजनानां चित्राणि विचित्राणि चरित्राणि च प्रकाश्यन्ते ।

इत्थमेषा पत्रिकान्तरविलक्षणैः संख्यातीतगुणगणैः समन्विता 'संस्कृतपद्यवाणी' स्वल्पमात्रकेणैव कालक्रमेण सहृदयानां सुप्रसिद्धपत्रिकासम्पादकानां परेषामशेषाणां विद्वज्जनानां संस्कृतप्रणयिनां विद्यार्थिनाञ्च हार्द्दिकीं प्रशस्तिपरम्परामासाद्य सुतरां यशस्विनी संवृत्ता ।

तदलं विलम्बेन । सर्वे संस्कृतवाणीप्रियाः सत्वरमस्या ग्राहकपदमङ्गीकृत्य समास्वादयन्तु संस्कृतभारत्याः सुदुर्लभप्रचारां विचित्ररसधाराम्, पत्रिकायामस्यामौदासीन्यवन्तो मा भूवन वञ्चिताः पुनर्महता भोग्येन सौभाग्येनेति प्राप्तकालमावेदनम् ।—

अस्या वार्षिकं मूल्यम – साधारणग्राहकाणाम्—१॥० सार्द्धरूप्यकम्

सहायकानाम्—३) रूप्यकत्रयम्

परिपोषकाणाम्—५) रूप्यकपञ्चकम्

सहायकानां परिपोषकाणाञ्च नामानि यथाकालं नियमेन पत्रिकायां प्रकाश्येरन् । एतदधिकसाहाय्यदातारः 'समाश्रय'पदं लभेरन् ।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

विनीतनिवेदकः—श्री[illegible]तीर्थस्य

(संस्कृतपद्यवाणी-प्रयोजकस्य काशीस्थस्य)

তর্কাচার্য মহাশয়ের স্বকীয় সম্পাদিত পত্রিকা *সংস্কৃত-পদ্যবাণী*